এবং বাঙালির কথা

এক বাণ্ডিল কথা

প্রবোধকুমার সান্যাল

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
পহেলা বৈশাখ, ১৩৫৪

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস. সি.
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ পট :
শ্রীধীরেন বল

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
মোহন প্রেস

ব্লক প্রস্তুতকারক :
ষ্ট্যাণ্ডার্ড এনগ্রেভিং কোং

মুদ্রাকর : শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য চার টাকা

এক বাণ্ডিল কথা

ছোটপিসির কথাবার্তা একটু যেন বাঁকা ধরনের। অল্প বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন, সেজন্য মেয়েদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে তিনি একটু সজাগ। মেয়েমহলের আসরে বসলে তাঁর গলাটাই সকলের বড় হয়ে উঠে।

এলার সঙ্গে রণেন্দ্রের বিয়েটা পাকাপাকি হবার পর সেদিন ওদের প্রণয়-কাহিনীর কথাটাই উঠেছিল। ছোটপিসি বললেন, "কেই বা জানে, কতটুকুই বা জানে! কিন্তু একথা তোমরা ঠিক জেন, পুরুষমানুষের সঙ্গে ভাব হলে মেয়েমানুষ শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত হয়। এলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছ তোমরা? কিচ্ছু ধরবার জো নেই, একেবারে লোহার সিন্দুক!"

মেজমাসি বললেন, "তা কেন বলছ। এই সেদিন দেখে এলুম কেমন হাসি-খুশী ভাব!"

"পেট থেকে কথা বার কর দিকি!"

মামী ছিলেন পাশেই। হাসিমুখে তিনি একটু ঘোমটা টেনে বললেন, "ওমা, মেয়েটা যে এম-এ পড়ছে গো, একটু চালাক চতুর হবে না?"

ছোটপিসি বললেন, "কিন্তু জেনে রেখ ধীরুর মা, একবার যে-মেয়ে আলগা দিয়েছে, তার আঁচল আর কাঁধে ওঠে না! পেটের কথা যদি কারো পেটে থাকে আমার আপত্তি নেই,—কিন্তু বিয়ের আগে পুরুষছেলেকে নিয়ে পথে-ঘাটে বেহায়াপনা,—এই বা তোমরা কেমন করে সইলে? আমার পেটের মেয়ে হলে জিব টেনে বার করতুম।"

দিদিমা এতক্ষণ শুয়ে ছিলেন। এবার হাসিমুখে উঠে বসলেন। বললেন, "ভাগ্যি তোমার পেটে ছেলেমেয়ে হয়নি, মানু।"

সবাই একচোট হেসে উঠল। দিদিমা বললেন, "দুটো বেড়াল-ছানা না হয় নিরিবিলি গিয়ে খেলাধুলো করে বেড়িয়েছে, তাই নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন?"

ছোটপিসি বললেন, "কিন্তু বিপদ আপদ ঘটে গেলে কি হত, মাসিমা ?"

"তোমার কেবল ওই নিয়েই ভয়, মানু !" দিদিমা বললেন, "শুনছ না, আজকাল লেখাপড়া জানা ঘরে ছেলেপুলে হয় কম ? তুমি লেখাপড়া শিখলে তুমিও এ নিয়ে মাথা ঘামাতে না !"

ছোটপিসি একেবারে গুম হয়ে গেলেন।

নন্দর মা বসে ছিল এক পাশে। সে ওখান থেকে বললে, "চেনা-জানা ঘর, দুই পক্ষের বন্ধুত্ব তিন পুরুষের। তার ওপর রূপেগুণে ছেলেমেয়ে দুটোর জুড়ি নেই। ওরা মন্দ কাজ করতে যাবেই বা কেন বল ? এমন বিয়ে ক'জনের হয় ?"

মেজমাসি বললেন, "তা সত্যি। রণেন বেরুল ইন্‌জিনিয়ারী পাস করে, আজ বাদে কাল বড় চাকরি পাবে ! রূপে আর স্বাস্থ্যে একেবারে ময়ূর ছাড়া কার্তিক।"

মামী বললেন, "মেয়েও তাই, ঠাকুরঝি।"

দিদিমা বললেন, "বটেই ত, এমন বিয়ে হয় না কোথাও। দুইপক্ষে যেমন ভালবাসা তেমনি গলাগলি। এই ত আজই সকালে অবিনাশ নাচতে নাচতে এসে হাজির। এদিক থেকে উপেন গিয়েছিল সন্দেশের ঝুড়ি নিয়ে। দেশে-দশে সবাই হাত তুলে নাচছে। তুমি আর মন খারাপ করে থেকো না মানু, কোমর বেঁধে শুভ কাজে লেগে যাও।"

ছোটপিসি বললেন, "তোমরা সবাই দল বেঁধে আমাকে তর্কে হারিয়ে দিলে। আমি কিন্তু ভালর জন্যেই বলেছিলুম। কোমর বেঁধে লাগব বৈকি খুড়িমা,—তবে কিনা ঘোলা জল দেখলেই গঙ্গাজল বলে চেঁচিয়ে উঠিনে।"

ছোটপিসি উঠে সেখান থেকে হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

এত আলোচনা যে-বস্তু নিয়ে, তার চেয়ে পুরনো কাহিনী বোধ করি সংসারে আর কিছু নেই। দুটি সুপরিচিত পরিবারের দুটি তরুণ-তরুণীর দেখা-শো[illegible] হয় আড়ালে আবডালে। মাথা ধরার ছুতোয় ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এলা যা[illegible] সিনেমায় কিংবা মাঠে, কিংবা যাদবপুর আর দক্ষিণেশ্বরের দিকে, এবং রণে[illegible] তার কাছে গিয়ে পৌছয় যথানির্দিষ্ট সময়ে। বাস-স্ট্যাণ্ডের ধারে একজন এসে

দাঁড়ায় হাতঘড়ি দেখে, ভিন্ন ব্যক্তিও হাতঘড়ির উপর চোখ রেখে যথাস্থা উপস্থিত হয়। প্রণয়াসক্ত হলে মেয়েরা হয় চতুর, ছেলেরা অন্ধ। মিলনের কালে ছেলেরা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ হয় এবং মেয়েরা তং অনেকটা আত্মবিস্মৃত। সেই আদি কাহিনী, সেই রণেন্দ্র আর এলা, নর এ নারী। প্রেমের দায়ে ছোটে ছেলে, প্রাণের দায়ে ছোটে মেয়ে। অবে নিবিড় রস ঘনিয়ে উঠলে আসে নীড় রচনার কথা। মেয়ে-পাখি ডিম পাড়ব জন্য বাসায় ঢুকতে চায় এবং মেয়ে-মানুষ বাসায় ঢোকবার জন্য কপালে সি মাখতে চায়। গল্পটা অতি প্রাচীন।

কিন্তু প্রাচীন কাহিনী হলেও এখানে যেন একটু বিপরীত। বিয়ে পাকাপাকি হবার আর দেরি নেই,—এলার মুখে চোখে তার খুশীর আভা দেখ যায়; কিন্তু রণেন্দ্রের মুখের চেহারায় এই সুসংবাদের সুদূর আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বন্ধু এবং আত্মীয় মহলে এ নিয়ে একটু বিস্ময়ের সঞ্চার আছে বৈকি। প্রণয় ঘটনার ব্যাপারে রণেনের মত এমন গাম্ভীর্য রক্ষা করলে আমোদ-প্রমোদের মাত্রাটা যেন কমে যায়।

বিলেতী কোন্ ফটোগ্রাফারের দোকানে রণেনকে নিয়ে এলা একখানা ছবি তুলিয়েছিল,—কৌমার্যের সর্বশেষ প্রতীক্,—সেই ছবিখানা বুঝি ধরা পড়ে এলার একখানা পাঠ্যগ্রন্থের মলাটের মোড়কে। তাই নিয়ে কী উল্লাস এ-বাড়িতে আর ও-বাড়িতে। একেই ত এলা বাড়ির মধ্যে গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু ফটোখানা ধরা পড়ার পর এম-এ পড়া ছাত্রীকে নিয়ে বৌদিদি আর ছোড়দি যেন বাঁদরনাচ নাচাল। পছন্দসই একটি নতুন ভ্যানিটি ব্যাগ কেনার জো নেই,—সবাই অমনি বলবে এটি উপহার পাওয়া! অ-পাঠ্য উপন্যাস হাতে নিয়েছ কি সর্বনাশ,—বলবে, এ বুঝি রিহার্সেল চলছে? যদি একবার হারমোনিয়মে হাত পড়েছে, অমনি ফরমাস,—একখানা রবিঠাকুর! ছাদে গিয়ে নিরিবিলি একটু দাঁড়ালেই,—ব্যস, পিছন থেকে বৌদিদি বলবে, ছাদে না এলে বুঝি পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল হয় না, ঠাকুরঝি? পোস্ট-গ্রাজুয়েটে যাবার তাড়াতাড়িতে যদি চুল ফিরিয়ে নেবার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াতে হয়,—আর রক্ষা নেই, ও-ঘর থেকে পাষণ্ড ছোড়দার গলায় গান উঠবে, 'অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী',—না কি ছাই-পাঁশ মনেও থাকে না।

দিকে গোয়েন্দার প্রখর শাণিত দৃষ্টি।

এমনি একটা সময়ে রণেন্দ্র এসে দেখা দিল কোনো এক নির্দিষ্ট পথের বাঁকে। দূরের থেকে এলা এগিয়ে এল হাসিমুখে। কাছে এসে বললে, তোমার কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন মিনিট দেরি হয়েছে আজ, আমি ওই মনিহারির দোকানে দাঁড়িয়ে চিরুনির দর করছিলুম, সময় কাটাতে হবে ত ?"

রণেন বললে, "প্রসেশন্ যাচ্ছিল, তাই আমার বাসটা দেরি করল।"

এলা বললে, "এগিয়ে চল, দোকানদারটা হাঁ করে দেখছে। কী যে ছাই দেখে!"

রণেন মুখ টিপে বললে, "যা দেখলে মাথা ঘোরে তাই দেখছে!"

"থাম, অসভ্যতা কর না,—এস।"

ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলল সেইদিকে, যে-দিকটায় সচরাচর লোকজন আসে না। ওদের যেদিন দেখাশোনা হয়, তার পরের সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় ও স্থান নির্বাচন করে তবে ওরা বিদায় নেয়। কিন্তু মুশকিল এই, আজকাল হেন অগম্য অঞ্চল নেই যে, এখনকার ছেলে এবং মেয়ে সেটি চেনে না। নিরি-বিলি সাক্ষাৎকারের স্থান আজকাল বড়ই কম। যেখানে যাও, অগণ্য মানুষ। কোনো কোনো রেস্টুরেন্টে অবশ্য যাওয়া যায়, সেখানে পর্দা ফেলে দিয়ে পায়ে পা ঠেকিয়ে গল্প চলে বটে, কিন্তু কফি হাউসগুলো একেবারে অসম্ভব। বড় জোর থার্ড ইয়ার পর্যন্ত কফি হাউসে যাওয়া চলে, কিন্তু বি-এ পাস করার পর বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে ওখানে আর একত্রে ঢোকে না; কেন না যে-বিজ্ঞাপনটা মুখে মুখে চলে, ভবিষ্যতের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক।

এলা বললে, "তা হলে যাবে কোথায়? লেকে যাওয়া অসম্ভব, ওখানে বিয়ের আগে যদি দুজনে ঢোকা যায়, তা হলে বিয়ে না করে আর বেরুনো যায় না!"

রণেন খুব হেসে উঠল। পরে বললে, "তোমার সঙ্গে নাকি আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে? কথাটা কি সত্যি?"

এলা হাসিমুখে বললে, "কই, জানিনে ত? অনেক নির্বোধ আছে, যারা ভাব-আলাপ হবামাত্র বিয়ে করে বসে। বিয়ে মানে ত বিছানা, তার জন্ত অত তাড়া কেন? শোনো, ওসব বাজে কথা যাক্। ছোটপিসির কাণ্ড শুনেছ?

ওই যে গো মেয়েদের চরিত্র রক্ষার ইন্‌সপেক্টর! ওর মতলব কি জানো? শোনো বলি। সেদিন এসেছিল আমাদের ওখানে। ছোটপিসির এক ভাসুরপো বিয়ে করে নদীয়া জেলায়, তারা নাকি জমিদার। সেই বৌটার মাসতুতো ভাই তার বৌকে রেখে কোথায় যেন চলে গেছে, তার আর পাত্তা নেই!"

রণেন্দ্র বললে, "তুমি বুঝি আবার যত রাজ্যের বাজে গল্প ফেঁদে বসতে চাও?"

এলা রাগ করে বললে, "অমনি তোমার রাগ, কেমন? আমাদের ক্লাসের মালিনী চৌধুরী ঠিক তোমার মতন। একটু গল্প করতে জানে না। এমন গোমড়া মুখে থাকবে সারাদিন, কী বলব। কুলতলার জমিদারের ঘর থেকে মালিনীর সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সবাই যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। অমন সুন্দর মুখখানা, কিন্তু মুখের লাইনগুলো দেখে পাত্রপক্ষ বললে, 'এ মেয়ে খুব হাসিখুশী হবে না,—বুঝলেন ত', আমাদের পরিবার বড়, সেখানে পাত্রীর পক্ষে অসুবিধে হবে!' হ্যাঁ, সত্যি বলছি, মালিনীর গোমড়া মুখ দেখেই তারা চলে গেল। দাঁড়াও, সেই নদীয়া জেলার মাসতুতো ভাইয়ের বৌটার গল্পটা শোন এবার—"

রণেন মুখ টিপে বললে, "একটু সংক্ষেপে বল!"

থমকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এলা বললে, "ব্যস, অমনি তুমি অস্থির হয়ে উঠলে! ইনজিনিয়ারিং পাস করেছ। প্ল্যান কষে আর লোহালক্কড় ঘেঁটে তোমার রসকষ একেবারে শুকিয়ে গেছে। গেল বেস্পতিবার থেকে আজ পর্যন্ত কত গল্প জমিয়ে রেখেছি তোমার জন্যে, আর তুমি কিচ্ছু শুনতে চাও না!"

রণেন বলে, "তোমাকে না বাড়িতে বলে, তুমি খুব গম্ভীর?"

এলা খিলখিলিয়ে উঠল, "বাড়ির লোক কোনোকালে জানে ছেলেমেয়েদের পরিচয়? কতটুকু জানে, কেমন করেই বা জানবে? এটা জেনে রেখ, সেদিন আর নেই! তাদের এক চেহারা ভিতরে, অন্য চেহারা বাইরে। বাড়ির লোক টের পায় কিছু? ইস্কুল পালিয়ে ছেলেরা যায় সিনেমায়, [illegible] পালিয়ে মেয়েরা যায় অ্যাডভেঞ্চারে। আমার ঠাকুরমাকে তুমি ত দেখেছ

আজ কতদিন থেকে। ঠাকুমা বলেন, তাঁদের ছোট বেলায় সমস্ত দিন কলকাতায় ঘুরলে ভদ্রঘরের একটি মেয়েকেও পথেঘাটে কোথাও দেখা যেত না!"

এক পার্কের গেট-এর কাছে ওরা এসে হাজির হল। রণেন বললে, "ঢুকবে ভেতরে?"

এলা বললে, "অনেক লোক যে। খালি বেঞ্চি পাব?"

রণেন হাসল। বললে, "তুমি যে-ধরনের আলাপ চালাচ্ছ, তাতে আশে পাশে পাঁচজন শুনলেও ক্ষতি নেই।"

"ইস—", এলা বললে, "কী ন্যুরটিক্ তুমি! যদি একটু তোমার মন-মেজাজ খারাপ হয়, তুমি আর চাপতে পার না। এমন কুইক টেম্পার্ড মানুষ হয়? একটু সংযম শেখনি? বিয়ের পর এ-দোষ যদি তোমার না শোধরায়, তুমিই দুঃখ পাবে!"

রণেন বললে, "ঠিক বলেছ, এজন্যে বিয়ের কথা উঠলেই ভয় পাই!"

"মানে?" এলা তার দিকে তাকাল একবার।

রণেন পুনরায় বললে, "এস—ওই যে, একখানা বেঞ্চ খালি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বসবার আগে বলে রাখি, আমাকে আজ তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তুমি যে রোজকার মতন আজে বাজে গল্প ফেঁদে বসবে, তা হবে না!"

ওরা ভিতরে ঢুকে এগিয়ে চলল। এলা বললে, "কী ভালগার তুমি, তাই ভাবছি! বাজে গল্প শুনতে চাও না—বেশ, কিন্তু আসল কাজটি কি তোমার শুনি?"

"তাই বলে এমন সন্ধ্যাটা তুমি মাটি করবে?"

"মাটি করব! তার মানে? ইউ রট্! তোমার চোখ কেবল ভাগাড়ের দিকে! আই এ পড়া মেয়ের মতন তোমার কানে-কানে বুঝি রবিঠাকুর, কি শেলী আওড়াব? নাঃ তোমাকে নিয়ে অসম্ভব!"

এলা যেন ক্লান্তি বোধ করল।

রণেন ছাড়ল না। সহাস্যে বললে, "কিন্তু চুপ করে থাকলে অনেক ছেলে আর মেয়েকে বেশী মানায়, তা জান?"

"হ্যাঁ—ঠিক ওই তোমরা চাও।" এলা যেন পুনরায় দপ করে উঠল,—

"কাঁচকড়ার পুতুল হলে তোমাদের ভারী সুবিধে। কথা কইবে না সে, অথচ তোমরা যেমন খুশি নাড়াচাড়া করতে পার।"

রণেন্দ্র চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, "আজ প্রায় তিন বছর হতে চলল আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু একদিনও তোমার কাছে,—মানে, ওই [illegible]কে বলে—"

"কী ?" এলা চোখ পাকাল, "ভালবাসার কথা বুঝি শুনতে চেয়েছিলে ? ইশ—তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই জানতুম, কিন্তু রুচিজ্ঞানও কি নেই ? তুমি ত জান, প্রফেসর গুপ্ত আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না ! আমি নাকি কথা বলতে গিয়ে থামতে জানিনে। উনি ইনিয়ে-বিনিয়ে কাব্য করবেন, আর সহ্য করতে হবে সবাইকে। তুমি সেই রকম কিছু কাব্য করতে চাও ? সন্ধ্যেবেলা বেঞ্চিতে বসে কাব্য ! তুমি মনে করেছ কী ?"

"না—কিছু না।" রণেন্দ্র চুপ করে গেল। মুখখানায় তার একটা উত্তেজনার আভা খেলে আবার শান্ত হয়ে এল।

এলা কিন্তু চটেই গিয়েছিল। বললে, "সন্ধ্যেটাই মাটি তোমার জন্যে। আমি একালের মেয়ে তা জান ? তোমার এ সব মনোবৃত্তি পঁচিশ বছর আগে চলত। তখনকার দিনে যাদের মনে রং ধরত, তাদের কথাও হত রঙিন। তুমি একালের ছেলে হলে হবে কি, মন পড়ে রয়েছে আদ্যিকালের দিকে। একালের ভালবাসাকে প্রেম বলে না, এ কি কোথাও শোননি ?"

"তবে কী বলে ?"

"সোজা কথায় যাকে বলে, বোঝাপড়া। মন-জানাজানির অঙ্ক যদি মিলে যায়,—সেই ত আসল কথা !"

রণেন্দ্র এদিক ওদিক তাকাল। এখানে ওখানে কেউ কেউ যে তাদের লক্ষ্য করছে না, তা নয়। এলার সাজসজ্জাটা শাদামাটা, কিন্তু দেহলাবণ্যের আভায় কিছু মাদকতা আছে বৈ কি। এক হাতে তার সস্তা দামের ঘোষ। চুড়ি, অন্য হাতে দামী হাতঘড়ি। অলক্ষ্যে ওর দিকে তাকালে অভ্যতা নয় ? কেমন একটা বিপ্লব বাধে, কিন্তু এলার চেতনায় কোনো নাড়া খায়হাসছি, একথা।

হঠাৎ হেসে উঠল এলা ! উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, "এতক্ষণ সেই জাম্বুরপোর জান ? আমাদের বাড়িতে কাজ করত, সেই গোপালকে ?

এলা অনর্গলভাবে তার সেই কাহিনী আরম্ভ করে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আজ রাত্রে রণেনকে যেতে হবে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। কতকগুলো কাগজপত্র আজকেই নাড়াচাড়া করা দরকার। স্কলার-শিপের সেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না করলে চলবে না। অবশ্য সম্প্রতি এ চাকরি সে পেয়ে যাচ্ছে; প্রথম আরম্ভে বেতনাদির পরিমাণটা নেহাৎ মন্দ নয়।

পাশে বসে এলা তার গল্প বলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রণেনের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সে এক-একবার রণেনকে নাড়া দিচ্ছে। মাসতুতো জমিদারদের পুকুর-ঘাটের কাহিনী তখন বেশ জমে উঠেছে। এলার বক্তৃতার আদি অন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক হতে চলল, এলা থামছে না।

রণেনের বন্ধুর বাড়িতে খানচারেক বই এখনও পড়ে রয়েছে। কাল তাকে যেতে হবে বনগাছির ওদিকে, ছোটবোন ডেকেছে। দিদিমা জানিয়ে রেখেছেন, তাঁর কোম্পানির কাগজগুলো কালই ট্রেজারি আপিসে নিয়ে যাওয়া চাই, ছয় মাসের সুদ পাওনা হয়েছে। সেজমামা আসছেন লক্ষ্ণৌ থেকে, তাঁকে টেলিগ্রাম করতে হবে, বাবার জন্য তামাক আনবেন।

এলা থামছে না, তার গল্প চলছে তেমনি অনর্গল। রণেন শুনছে কিনা, সে-খোঁজ অনেকক্ষণ অবধি সে নেয়নি। কিন্তু নদীয়া জেলা থেকে কখন যেন সে চলে গিয়েছে বর্ধমান হয়ে পাটনার ওদিকে। তারপর তার কাহিনী আবার এক সময় ফিরে এল কলকাতায় এবং দেখতে দেখতে পুনরায় গিয়ে ঢুকল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে।

তিন বছর ধরে এলা গল্প বলছে। দেখা হলেই গল্প, আর কিছু নেই। সেই গল্পের দুরন্ত স্রোতে রণেন হাবুডুবু খায়। হোটেলে ঢুকলে গল্প, মাঠে গিয়ে বেড়ালে গল্প, সিনেমায় ছবি দেখতে গেলে কানের পাশে গল্পের ফিসফিসানি, পথের মোড়ে এসে দাঁড়ালেও গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে গল্প। এলাদের ছোটবেলা এক চাকর ছিল, তার নাম নানকু; সেজমাসির ফিটের ব্যামো; ঠাকুরমার এক জাঁহাবাজ সতীন ছিল; দাদামশাইয়ের ছিল পাখি পোষার

সখ; পাড়ার ইন্দুমিস্তির ডাকসাইটে মাতাল; তাদের ক্লাসের মৈত্রেয়ী রায় নাকি সিনেমার ছবিতে নামবার চেষ্টা করছে; ছোড়দা নাকি ইণ্ডিয়ান নেভিতে চাকরি নিচ্ছে; বড়দাদার পিসতুতো শালীর নাকি যমজ সন্তান হয়েছে।

সন্ধ্যাটা মাটি হচ্ছে, কে বললে? গল্পের স্রোতে ভাসছে সন্ধ্যা। আকাশের দিকে এক সময় চোখ তুলে রণেন দেখল, এক-একটা তারকা এক-একটি গল্প। কিন্তু তারকা যে অগণ্য, ওদের শেষ নেই। তিন বছর ধরে গুণলেও তারকা শেষ হবে না। এবার এলার গল্পে এসে পৌঁছলেন রাঙাদিদি। তাঁর শ্বশুর-বাড়ি ছিল বাঁকুড়োয়। সেকালে জঙ্গল ছিল বাঁকড়োর পশ্চিম সীমানায়—এলার বাবা বুঝি ছোটবেলায় সেই জঙ্গলে নেকড়ে বাঘ দেখে এসেছেন। রাঙাদিদির পরে এল এলাদের ক্লাসের বাণী সেনের মেজদা। মেজদার পকেটে একদিন এক মেয়ের চিঠি ধরা পড়ে। সেই মেয়েটি নাকি তোতলা। তোতলা হোক, মেয়ে ত! সে-মেয়ের নাকি কোথাও বিয়ে হয় না—কেননা একটি পাও তার খোঁড়া। বীণা সেনের মেজদার গল্পে ক্লাস সুদ্ধ মেয়ে হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ে।

চলল আবার এলার গল্প।

বছরের পর বছর, মাসের পর মাস—এবং এই গত সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছে এলার এইসব গল্প। এই মেয়ের সঙ্গে রণেনের বিবাহ স্থির হয়ে এসেছে। পাকা দেখার নাকি আর বিলম্ব নেই।

মেয়েদের বহু গুণপনার মধ্যে স্বল্পভাষণ একটি বিশেষ কাম্য গুণ। কেন এটি কাম্য, এলা নাকি তার প্রমাণ। কিন্তু আগামী তিন বছরেও এলার এই এলোমেলো গল্প বলা এবং বাক্যস্রোত থামবে কিনা কে জানে। এর সঙ্গে বিয়ে, কিন্তু এর গল্প থামবে ত? এই অনর্গল বাক্যস্রোতে রণেনের বিবাহিত জীবন কোন্ অকূলে ভেসে যাবে, কিছু জানা যাচ্ছে না।

এলার গল্প চলছে। এবার সেই গল্পে এসেছে কোথাকার এক নতুনদিদি। একবারটি লুকিয়ে লুকিয়ে রণেন হাতঘড়িটা ঠাহর করে দেখবার চেষ্টা করতেই এলা বিরক্ত হয়ে উঠল, "ও কি হচ্ছে, আমার কাছে বসে থাকতে বুঝি তোমার ভাল লাগে না?"

রণেন চমকে উঠল, "ওকি কথা, তোমার পাশে একটু বসব, এই আনন্দেই ত আসি! কিন্তু—"

"কিন্তু কী? তুমি ত হিপোক্রিট নও,—তা হলে সত্যি কথা বলতে গিয়ে থতিয়ে যাও কেন?"

রণেন বললে, "তোমার গল্প না থামলে কোন দরকারী কথা হয় না!"

"দরকারী কথা? কী শুনি?"

"এখন আর কিছু মনে নেই।" রণেন জবাব দেয়।

"বুঝেছি।" এলা বললে, "তুমি আমাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিতে চাও, তাই না?"

রণেন চুপ করে যায়। কিন্তু তার মনের চেহারাটা জানবার অবসর এলার নেই। এই কাছে আসা, এই পাশাপাশি বসা, পরিচিত লোকযাত্রার বাইরে এই একান্ত করে দুজনে মুখোমুখি দেখাশোনা—এর পিছনে পুরুষের যে আকুলতা, এলার চোখে সেটি পড়ে না। হঠাৎ এক সময় এলা হেসে ওঠে! বলে, "তুমি একেবারে আমার বড় পিসেমশায়ের স্বভাবটি তুলে নিয়েছ। তাঁরও ঠিক এই অভ্যেস। আসরের মাঝখানে বসে যদি আর কেউ কথা বলতে থাকে, তাঁর সহ্য হয় না,—তিনি হঠাৎ একটা উড়ো কথা বলে বসবেন। মাথা নেই, মুণ্ডু নেই—যা হোক একটা কথা। তোমারও ঠিক তাই।"

রণেনের মনে কেমন একটা অসন্তোষের সঙ্গে অধীরতা এসেছিল। কিন্তু সংযত কণ্ঠে কেবল বললে, "আমায় ক্ষমা কর তুমি!"

শিক্ষিত মেয়ে, ক্ষমা করতে জানে বৈকি। তারপরেই আবার এলা নতুনদিদির উপাখ্যান এনে ফেলল। নতুনদিদির মস্ত অ্যাড্‌ভেনচার। নতুন দিদি গিয়েছিল প্রয়াগের কুম্ভমেলায়। সেখানে সে এক দুষ্ট ব্যক্তির ছলনায় পড়ে। তারপর সেই কাহিনী ধীরে ধীরে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে থাকে।

রণের আবার হাই তোলে। রণেন ভাবছিল তার পরবর্তী কালের জীবন। এলা তাকে গল্প শুনিয়ে চলেছে। কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা। এলাকে ছেড়ে পালাবার জো নেই। সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল, এলা থামছে না। চলেছে বছরের পর বছর। সবাই জানল তারা সুখী দম্পতি, সবাই জানল এমন বিয়ে নাকি সচরাচর ঘটে না,—পরমাসুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী,

রূপবান স্বাস্থ্যবান সুযোগ্য স্বামী। কেউ জানবে না, রণেনের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সে ভয়ত্রস্ত, ঘরে তার আনন্দ নেই, জীবনে তার সুখ নেই। তাকে চোরের মত কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে হবে ঘরে, পালিয়ে বেড়াতে হবে বাইরে। সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু কুটুম্ব ঈর্ষান্বিত,—এমন সার্থক বিবাহ দেশে-দশে হয়নি, কিন্তু ঘরের ভিতরে রণেন শুধু জানবে, এমন শাস্তিও কেউ কখনও পায়নি।

হঠাৎ কথার মাঝখানেই রণেন বেঞ্চি ছেড়ে একেবারে উঠে দাঁড়াল। তখনও ঝরঝরিয়ে এলার বাক্যস্রোত চলছে। রণেনকে উঠতে দেখে এলা থামল। বললে, "ওকি, সবেমাত্র নতুন বৌদিদির সন্ধান পাওয়া গেল,—বাকিটা শুনবে না?"

রণেন বললে, "এমন চমৎকার গল্পটা আরেকটু আগে আরম্ভ করতে পারলে না তুমি? এবার যেতে হচ্ছে, উপায় নেই। রাত নটা বাজে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা আমরা এখানে বসে আছি।"

"তা হলে আরেকটু শোন!"

"আরেকটু!" মনোভাব দমন করে রণেন বললে, "পা ধরে গেছে! আমি দাঁড়াই, তুমি শেষ কর!"

এলা বললে, "কাল কখন দেখা হচ্ছে? একটুখানি গুছিয়ে বসলেই অমনি তুমি ব্যস্ত হয়ে ওঠ। দাঁড়াও, আগে বিয়ে হোক, তোমাকে একটুও কাছছাড়া হতে দেব না।"

কাষ্ঠ হাসি হেসে রণেন বললে, "খুব গল্প বলবে, কেমন?"

"সে আমার মনেই আছে, এখন কোনো কথা বলব না।" হাসিমুখে এলা বললে, "এখন পালাচ্ছ, তখন না শুনে যাবে কোথা?"

"হুঁ। আচ্ছা, ওঠ এবার।" রণেন নিজেই অগ্রসর হল। আর কিছু নয়, সে অপরিসীম ক্লান্ত, আজকের মত সে পালাতে পারলে বাঁচে।

সমস্ত পথ ধরে কিন্তু এলার কথা চলতে লাগল। বাস-স্ট্যাণ্ডে প্রায় তিন মিনিট,—সেখানে এলা থামছে না। কখনও আসছে নতুন দিদি, কখনও বা আর কেউ। কিছু না হোক, ছোট-পিসিমা। বাসে উঠে কথা কইতে কইতে এক সময় এলা বললে, "কাল কখন আসছ? একটু সকাল সকাল

এস। আমরা মাঠে গিয়ে গাছতলায় বসব। কেউ কোথাও থাকবে না, নিরিবিলি কথা বলব।"

রণেন বললে, "কাল দেখা হবে কেমন করে? আমাকে যে সারাদিন নানা কাজে থাকতে হবে!"

"আবার কথার অবাধ্য!" রেগে উঠল এলা, "আমি ছটফট করব, তাইতে বুঝি তোমার আমোদ? তা হলে কি পরশু?"

"না—একেবারে সেই শুক্রবারে। বুঝতে পারছ না, চারদিকে আমার কত কাজ জমেছে? কী করে আসি বল? শুক্রবার ঠিক চারটে, নেবুতলার মোড়ে!"

এলা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, "কী করে যে আমার কাটবে এই কদিন, তাই ভাবছি! ওদিকে পাকাদেখার দিন এগিয়ে এল। এ-বাড়ি ও-বাড়ি হৈ-চৈ লাগিয়েছে!"

রণেন মনে মনে ডরিয়ে উঠল। চারিদিকে পরিচিত মহল, সকলের মনে উদ্দীপনা। সবাই তাকিয়ে রয়েছে ওদের দুজনের দিকে। আসছে মাসে শাঁখ বাজবে।

বাসের মধ্যেই প্রবল স্রোতে বাক্যালাপ আরম্ভ করে দিয়েছে এলা। তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বেমানান হচ্ছে কিনা তাও বিচার করে দেখছে না। একই সীটে বসেছে দুজনে পাশাপাশি। ক্লাস-মেট্ মালিনী চৌধুরীর গোমড়া মুখ নিয়ে আবার আরম্ভ হয়েছে এলার গল্প। রণেন কাঠ হয়ে বসে রয়েছে।

রাশি রাশি কথা, কথার বন্যা। দেহ, মন, ভালবাসা—এসব কিছু নেই, শুধু কথা। ভেসে যাচ্ছে বর্তমান, তলিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ,—ভ্রূক্ষেপ নেই, পঙ্গপালের মতো মনের আকাশ ছেয়ে শুধু আসছে কথার ঝাঁক। তিন বছর ধরে রণেন শুনছে অফুরন্ত অজস্র কথার পর কথা।

রণেন বার বার ঘড়ি দেখছে, এলা বার বার তাকে খোঁচা দিয়ে নিজের কাহিনী শোনাচ্ছে! এমনি করে প্রায় এক ঘণ্টা কাল। তারপর এক সময় বাস এসে থামল একটি বিশেষ পথের মোড়ে। রণেন নিজেই উঠে তাড়াতাড়ি গিয়ে নামল। এলা নেমে এল তার ভবিষ্যৎ স্বামীর পিছু পিছু।

আবার পিছু নিয়েছে ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মী! নতুন একটা উপাখ্যান বলতে

বলতে আসছে। রণেন আরো জোরে পা চালিয়ে দিল। দেখতে অশোভন, নইলে রণেন একদৌড়ে পালিয়ে যেত।

হন্ হন্ করে এলাও চলেছে পিছনে পিছনে। এলা বললে, "কী হচ্ছে, অত জোরে হাঁটছ কেন ? আমি যা বলে যাচ্ছি শুনতে পাচ্ছ না ?"

"পাচ্ছি।" রণেন ছুটতে ছুটতে জবাব দিল।

"শোন, এসব কিন্তু তোমার শোনা দরকার ! বুঝেছ ?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি,—কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি—"

এলাও প্রায় ছুটছে। ফিরবার পথে ওদের প্রায় প্রত্যহই এই দৃশ্য ঘটে। শেষ পর্যন্ত ওরা দুজনে ছুটতে থাকে। রাত হয়ে গেছে অনেক এই ছুতো, কিন্তু আসলে তা নয়। ছুটে পালানই হল সবশেষের ঘটনা।

বাঁদিকে বেঁকে এলাকে যেতে হবে, রণেন যাবে সোজা। এলা পিছন দিক থেকে চেঁচিয়ে বললে, "শোনো—শোনো—তা হলে শুক্রবার, কেমন ? ঠিক পাঁচটায়···নেবুতলার মোড়···শুনতে পাচ্ছ ? অনেক কথা রইল কিন্তু···"

দূর থেকে রণেন জবাব দিয়ে গেল, "আচ্ছা, গুড বাই !"

হাসিখুশী মনে এলা চলতে লাগল ওদিকে। এদিকে এগিয়ে রণেন একবার থমকে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। দুখানা পা তার অবসাদে যেন ভারাক্রান্ত।

* * * *

মস্ত সুসংবাদ বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিন-চারখানা চিঠি এবং কতকগুলি মূল্যবান কাগজপত্র এসেছে তার নামে। পরদিন সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে সে ছুটল সরকারী দপ্তরে এবং পরবর্তী দুদিন অবধি নিজের সমস্ত গোছগাছ করে নিল। বৃহস্পতিবার রাত্রে বাড়িতে সংবাদটি প্রকাশ করল। শুক্রবার মধ্যাহ্নে তাকে যেতে হচ্ছে বোম্বাই।

প্লেনের টিকিট তার কেনা হয়ে গেছে। কবে ফিরবে, ঠিক বলা যাচ্ছে না।

কাগজপত্রের আসল কথাটি সে আপাতত কারো কাছে ভাঙল না। বোম্বাই পৌঁছে সে জানাবে ! তাকে যেতে হবে লণ্ডনের দিকে।

"তৃতীয় রিপু"

বাড়ীর কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছি, এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি এলো। এই বিঘা দুই ফাঁকা জমিটুকুর ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারলেই বড় রাস্তায় পড়তুম। কিন্তু বৃষ্টি নামলো।

ছোট মেয়েটার জন্ম ওষুধ আনতে গিয়েছিলুম ডাক্তারখানায়; ফিরে গিয়ে আবার আপিস বেরোতে হবে। কিন্তু এ জামা কাপড় ভিজলে আজকে আপিস যাওয়া আর চলবে না। দ্বিতীয় ধোবদস্ত কাপড় পেতে গেলে ধোবার বাড়ী ছুটতে হবে।

শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি,—দিন চারেক রোদের পর আবার আকাশ ভেঙেছে। একি থামবে সহজে? বেলা নটা বাজতে চললো। একটু মুস্কিলে পড়েই মাঠের এই ঝড়বড়ে চালাটার তলায় ঢুকে আশ্রয় নিলুম।

এই মাঠটুকু নিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় কত রকমের কথা ঘুরে বেড়ায়। কেউ বলে নাবালকের সম্পত্তি; কেউ বলে, এর জমিদার থাকে খিদিরপুরের ওদিকে—তাদের বংশে বাতি দেবার নাকি কেউ নেই। কেউ বা বলে, এখানে আজ বিশ বছর ধরে বারোয়ারী পূজো আর যাত্রা থিয়েটার হচ্ছে—এ এখন জনসাধারণের সম্পত্তি, এর ওপর এখন পাড়ার সকলেরই অধিকার। আসল কথা, এই জমিটুকুর ওপর লোভ আছে বহু লোকের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলের সস্তা টাকা আছে অনেকেরই হাতে,—কোনও মতে এই দুই বিঘা দখল ক'রে নিতে পারলেই বাজিমাৎ। সেই কারণে এই জমিটুকু নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চক্রান্তের আর অবধি নেই। যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে গ্রাস করবে তারই পোয়াবারো!

বৃষ্টির ঝাপ্টা আসছে প্রবল বেগে; দু'পা পিছিয়ে চালা ঘরখানার দরজায় উঠে দাঁড়াতেই হোলো। কিন্তু হঠাৎ আশপাশের বিশ্রী দুর্গন্ধে সজাগ হয়ে এদিক ওদিক তাকালুম। এটি ঠিক চালাঘর নয়, কোনও এককালের এক

মাটকোঠারই ভগ্নাবশেষ। পাশেই কাজ করছে একজন ছুতোর মিস্ত্রি। ছুটো গরু এসে কখন যেন আশ্রয় নিয়েছে ওধারে। এপাশে একটি হাঁড়ি-কলসীর দোকানের পিছন দিক। বুঝতে পারা যাচ্ছে এ ঘরখানা ভেঙে চুরে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশে থাকে এক ঝাড়ুদার পরিবার; তারই গায়ে-গায়ে বসবাস করে বাজারের এক ফড়ে,—ছাগলের মাংস বিক্রি করে। অনেককাল ধ'রেই দেখে আসছি এই চালাঘর এমনি ভাবেই কাৎ হয়ে আছে,—মাঝে মাঝে বদলায় শুধু এর বারান্দা।

ছুতোর মিস্ত্রি আমার জড়োসড়ো অবস্থা লক্ষ্য করে ওধার থেকে ব'লে উঠল, ভেতরে উঠে এসে দাঁড়ান না বাবু, বড্ড ছাট্ আসছে!

উঠে এসে হাসিমুখে বললুম, তুমিই না আমাদের বাড়ীতে গিয়ে সেবার তক্তাখানা মেরামত করেছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম সন্তোষ। দেখবেন, বুড়ি শুয়ে আছে আপনার পায়ের কাছে। হোঁচট খাবেন না।

এমনি বেঁহুস আমি, লক্ষ্যই করিনি এতক্ষণ। মনে করেছিলুম, জঞ্জালের স্তূপ! ছেঁড়া কাঁথা, খড়ের আটি, ভাঙা টিনের কানেস্তারা, ইঁট কাঠ আর ঝুরো মাটির রাশীকৃত জটলা, এ ছাড়া এ ঘরে বুঝি আর কিছু নেই। সহসা ঠাহর করে দেখি, সত্যি প্রায় পায়ের কাছে আপাদমস্তক নোংরা কাঁথা আর খড় চাপা দিয়ে পড়ে আছে একজন, তার সাড়াশব্দ নেই। একটু আড়ষ্ট হয়ে দরজা ঘেঁষে দাঁড়ালুম। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি চলছে।

জল নামছে গোলপাতার বড় বড় ছিদ্র দিয়ে। কোথায় যেন বিড়ালের বাচ্চারা ডাকছে। গরু দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। বৃষ্টির অত ছাট সত্ত্বেও সন্তোষ তার র‍্যাঁদা চালাচ্ছে!

এমন সময় আবার এক নেড়িকুকুর উঠে সোজা ভিতরে ঢুকে কান ও গা-ঝাড়া দিল। বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই, এত বৃষ্টি। ভিতরে দুনিয়ার নোংরা, তাদের সঙ্গে বীভৎস দুর্গন্ধ জড়ানো। অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় কেবলমাত্র জামা কাপড় বাঁচাবার জন্তই ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হলুম।

ছাতা নিয়ে বেরোতে হয়, বাবু—বর্ষা বাদলের দিন!—সন্তোষ আবার নিজের মনেই কাজ করতে লাগলো।

কুকুরটা একটু বদ খেয়ালী। কাঁথার উপর শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ একবার নাক ঝাড়া দিল। কিন্তু সেই শব্দে কাঁথার স্তূপ এবার নড়ে উঠলো। ভিতর থেকে কি যেন একটা গালমন্দ দিয়ে বুড়ি এবার মুখের উপর থেকে কাঁথা সরালো। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমারই দিকে তার নজর পড়লো বটে, তবে কুকুরটা সেখান থেকে সরে গিয়ে অদূরে বসল। আমি নিজে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেঝের উপর পুঁটলী পাকিয়ে ওই নোংরা কাঁথার মধ্যে বুড়ি কুণ্ডলী হয়ে রয়েছে। বয়স সত্তর বছরের কম নয়।

সন্তোষ আবার ওধার থেকে বলল, দেখবেন বাবু, ওর কাঁথা যেন ছোঁবেন না, বড্ড নোংরা!

আরেকটু সরেই আমি দাঁড়ালুম। রুমাল চাপা দিলুম নাকে।

বুড়ি এবার একটু ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, দরজাটা বন্ধ করো না বাছা, জল আসছে যে। ইঁটের ঠেকোটা দিয়ে দাও।—

দেখতে পাচ্ছি দরজা বন্ধ করলে দম আটকে আসবে। কিন্তু বুড়ির অনুরোধ আধাআধি পালন করতে হোলো। আকাশ আজ ভেঙ্গে পড়েছে, পা বাড়াবার কোনও উপায় নেই।

সন্তোষ বললে, ওই দেখুন, অমনি ক'রে প'ড়ে আছে এক হপ্তা। কাল আবার আমানি খেলে। বারণ করলুম, শুনলে না,···আজ আবার বাড়াবাড়ি।

বললুম, কি হয়েছে ওর?

সন্তোষ কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল, কাঁথার ভিতর থেকে ফোঁস ক'রে উঠলো বুড়ি,—থাম তুই, হারামজাদা—তোর আর তর সইছে না! ছাই দেবো তোর মুখে। নচ্ছার!

সন্তোষ একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে। তারপর নিজের কাজে মনোযোগ দিয়ে বললে, দেখছেন বাবু,—জাত সাপের ছোবল্, বিষ একবার দেখুন। প্রায় সত্তর বছর হ'তে চললো ওই ছোবল্ মারছে সবাইকে।

ভিতরে একটা বিসদৃশ কাণ্ড না বেধে ওঠে,—আমি যেন সন্তোষের কথায় একটু আড়ষ্টই বোধ করলুম। কিন্তু বুড়ি গ্রাহ্যও করলো না,—চুপ ক'রে ়াইলো নিজের মনে। সম্ভবত বুড়ি এখানে-ওখানে ভিক্ষে করে খায় সেজন্য স কারোকে বেশী রকম চটাতে চায় না। কিন্তু বুড়ির মুখের চেহারা দেখে

মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ জীবনে ধিক্কার সয়েছে সে অনেক। সমস্ত ধিক্কার এবং অসম্মানকে শুধু যে সে গায়ে মাখেনি তাই নয়, সন্তোষের মতো ব্যক্তিকে সে মানুষ বলেও মনে করেনি।

বৃষ্টি যেন আবার নতুন ক'রে ঝাঁপিয়ে এলো। গোল পাতার ভিতর দিয়ে জল নামছে চালার মধ্যে। গরু দাঁড়িয়ে কি যেন অশ্রান্ত চিবোচ্ছে, কুকুরটা গিয়ে এক পাশে গা এলিয়েছে—কিন্তু মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখছে বিড়াল-বাচ্চা গুলোর দিকে। রঁ্যাদা চালাচ্ছে সন্তোষ অবিশ্রান্ত। হাঁড়ি কলসীর দোকানের ভিতরে ব'সে কে যেন বর্ষা উপলক্ষে বোম্বাই সিনেমার বিরহ সঙ্গীত ধরেছে। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম কাঠ হয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে। এমন বিব্রত কোনদিন বোধ করিনি।

এমন সময় বুড়ি ক্ষীণ কণ্ঠে আমাকে ডাকলো। কাছে সরে এলুম। একটুখানি ঝুঁকে তার দিকে চেয়ে বললুম, কি বলছ ?

এই কলায়ের বাটিটায় একটু জল ধ'রে দাও দিকি, বাবা !

বললুম, খাবার জল চাও বুঝি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ খাবার জল, দাওনা একটু।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বললুম, খাবার জল ত' এখানে কোথাও দেখছিনে, বাছা ?

ও মা, কি বুদ্ধি তোমার! চারদিকে এত জল, আর একটু খাবার জল দিতে পারছ না ? আক্কেল নেই ঘটে ? তুলে নে যাওনা বাটিটা, চালার নীচে ধরো,—ওই তো হুড় হুড় ক'রে জল পড়ছে !

বুড়ি যে এই নোংরা চাল ধোওয়া বৃষ্টির জলই খেতে চায়, এটা ঠিক আগে বুঝতে পারিনি। কিন্তু নিজের হাতে ক'রে এ জল কেমন ক'রে দেবো, এ কথাটা তলিয়ে ভাববার আগেই বাটিটা নিয়ে দরজার বাইরে ধরলাম। পাঁচ সেকেণ্ডে বাটি ভ'রে গেল। বাটি নিয়ে বুড়ির সামনে দিলুম। বুড়ি পরিতুষ্ট হয়ে, শুয়ে শুয়েই সেই জল পান করল। অবাক হয়ে গেলুম।

বুড়ি বললে, এ ভগবানের জল বাবা,—পেটের ব্যামোর এমন ওষুধ আর নেই! —হ্যাঁ বাবা, শোনো এক কথা বলি। চারটে পয়সা দাও দেখি,—এই চেয়ে নিচ্ছি বাবা,—না হয় ভিক্ষেই দিলে! সামান্য চারটে পয়সা!

আজকাল দুটো পয়সা পর্যন্ত কায় ক্লেশে ভিখারীকে দেওয়া যায়, চারটে পয়সা এক ধোকে দিতে গেলে গায়ে একটু লাগে। কিন্তু পয়সাটা বার করার আগে বুড়ি খরতর দৃষ্টিতে আমাকে ইঙ্গিত ক'রে বললে, ওই আবাগের ব্যাটা যেন দেখেনা, চোখ টাটাবে। একটু লুকিয়ে দাও।

ঠিক তাই হোলো। রঁ্যাদা থামিয়ে ঘাড় উঁচু ক'রে ওধার থেকে সন্তোষ বললে, ও ভদ্দর লোকটাকে এবার বাগে পেয়েছ, না? পয়সা চাওয়া হচ্ছে চোখ টিপে? দেবেন না বাবু, একটি আদলাও দেবেন না, ওই শকুনির হাতে। মাগি বড় শয়তান!

বুড়ি চুপ।

সন্তোষের এবম্বিধ মন্তব্যে আমি একটু আহতই হলুম। সর্বপরিত্যক্তা বৃদ্ধা ভিখারিণী কাদামাটিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে,—এবং চেহারা দেখে মনে হচ্ছে হতভাগী তার অন্তিম শয্যাই পেতেছে। এর ওপর এই অপমান বর্ব্বরতারই পরিচয়। একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললুম, সন্তোষ, এটা কি তোমার ভালো হচ্ছে, ভাই? যার বাঁচবার কোনো আশা নেই, তা'কে এমন ক'রে মারছো কেন?

কথাটা শুনে সন্তোষ হঠাৎ হেসে উঠলো কিন্তু আমার এই সমবেদনার কথা শুনে জবাব দিল বুড়ি। একটু নড়ে উঠে রুগ্ন কণ্ঠে বললে, তুমি কেমন মানুষ, বাছা? চারটে পয়সা চাইছি ব'লে গায়ে প'ড়ে আমার মরণ টাঁকতে এসেছ? এতক্ষণ ঘরে দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচাচ্ছ, ঘরের ভাড়াও ত' আছে!

আমি একেবারে হতবুদ্ধি।

বুড়ি কিন্তু থামলো না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে লাগলো, দয়া চাইনি কারো। নিজের গায়-গতরের ওপরেই আছি। যাওনা বাছা বেরিয়ে, না হয় বৃষ্টিতেই ভিজলে খানিকটে।

এবার ছুটতে ছুটতে দুটো ছাগল কোথা থেকে যেন চালার মধ্যে উঠে এলো। গরুটা নির্ব্বিকার, তেমনি জাবর কাটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বুড়ি আমাকে বেরিয়ে যেতে বললেও নড়তে পাচ্ছিনে, এমনি সাপটে বৃষ্টি চলছে। নিছক সহানুভূতি জানাতে গিয়ে এমন চপেটাঘাত খাওয়া কৌতুকজনক বৈকি।

কথাটা সন্তোষের কানে গিয়েছিল। হাসি মুখে সে বললে, দেখলেন ত বাবু কুলোপানা চক্কর? আপনি ত' এ পাড়ায় এসেছেন দশ পনেরো বছর।

ও মাগির দাপটে এ তল্লাট চিরকাল থর হরি, ওকি আজকের শয়তান ? এ পাড়ার তিন পুরুষকে ও মাগি জ্বালিয়ে খেয়েছে। ওর বয়সকালে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খেতো !

বুড়ি কাঁথার ভিতর থেকে খিঁচিয়ে উঠলো,—আ মর, হারামজাদা, দুটি চখের মাথা খা। চাল নেই, চুলো নেই। —আমি না থাকলে যেতিস কোথা ? চুকৃলি কাটছিস যে নতুন লোক পেয়ে ?

সন্তোষ আবার চুপ। গজকাঠি দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে সে একখানা তক্তা মাপতে লাগলো, কোনও গালাগালির জবাব দিল না। আমার কিন্তু একটু খট্‌কা লেগে রইলো। তাহ'লে ব্যাপারটা কি ? চারটি পয়সা ভিক্ষে চাইলো, কিন্তু পরে বললে—ঘরভাড়া ! তবে কি ঘরখানা এরই ? কিন্তু সন্তোষের প্রতি যে-মন্তব্যটা বুড়ি ক'রে বসলো—কই সন্তোষ তা'র কোন জবাব দিল না ত ?

গজকাঠি রেখে সন্তোষ এবার বললে, চোখ রাঙাবার চেহারাটা দেখলেন ? অথচ দেখুন, আমার ঘরে পান্তা রাখার জো নেই,—মাগির এমনি হাত-টান। ওই দেখুন, সকাল থেকে দাঁত লেগে পড়েছিল, আপনার কাছে পয়সার গন্ধ পেয়েই চিতিয়ে উঠেছে।

বললাম, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বুঝি ?

অসুস্থ !—সন্তোষ এবার দু'পা এগিয়ে এলো,—আজ দু'দিন হতে চললো ওলাউঠোয় ভুগছে। বছরে তিনবার চারবার ওর ওলাউঠো হয় ! গেল বছর বাঁশ বেঁধে ওকে যেই সবাই মিলে কাঁধে তুলবে, অমনি বেঁচে উঠলো। বজ্জাতের হাড়, ওকি সহজে শ্মশানে যাবে ! আশী বছর পেরিয়ে গেছে ওর।

আমি আর এদের কথার ফাঁদে পা দিচ্ছিনে, উচিত মত শিক্ষা আমার হয়ে গেছে। হাসিমুখে বললুম, না না, এসব কথা বলতে নেই—। প্রাচীন কালের মানুষ, যতদিন বাঁচে ততদিনই ভালো। সুখেরই কথা।

বুড়ি আমার কণ্ঠস্বর শুনে সন্দেহ করলো কিনা বুঝলেম না। কিন্তু এবার বিরক্ত হয়ে সে বললে, খুবত তখন থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চুকৃলি কাটছো,—চারটে পয়সা ফেলতে বুঝি হাত উঠলো না ?

তাড়াতাড়ি চারটে পয়সা বার করে বুড়ির হাতের কাছে হেঁট হয়ে দিয়ে

বললুম, যে যাই বলুক, বুড়ো মানুষের দুঃখ সবাই বোঝে না! এ পয়সায় তুমি খাবার খেয়ো।

বিদ্যুৎ ঝলসিয়ে আকাশ পথে কোথায় যেন একটা সশব্দে বাজ পড়লো। দেখতে দেখতে নতুন ঝাপ্টা নিয়ে আবার প্রবল বর্ষণ নেমে এলো। সামনের জমি পেরিয়ে রাস্তার চারদিকে জল দাঁড়িয়ে গেছে। এতক্ষণে আমার বাড়ী পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই জল প্লাবনের মধ্যে যানবাহনাদির চলাচল যে বন্ধ হ'তে বাধ্য, এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। মুস্কিল এই, ধোবার বাড়ী থেকে আর এক প্রস্ত জামাকাপড় না আসা পর্যন্ত এই পোষাকেই আমাকে চালাতে হবে। সুতরাং এই জামাকাপড় সুদ্ধ পথে নামলে আজ আর কাল দুদিনই আপিস কামাই,—সে অসম্ভব।

পয়সা দিয়েও আমি ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। বুড়ি কিন্তু না দিলে ধন্যবাদ, না জানালো কৃতজ্ঞতা, এটা যেন নিজের প্রাপ্য হিসেবেই সে নিল। এ না দিয়ে যেন আমার নিস্তার ছিল না।

পরম স্ফূর্তিতে পুনরায় র‍্যাঁদা টানতে টানতে সন্তোষ বললে, পয়সা নিয়ে বুড়ি কি করবে জানেন? আর দুঘণ্টা পরেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে, তারপর গড়িয়ে-গড়িয়ে যাবে তেলে ভাজা ফুলুরির দোকানে। এই ওলাউঠো তার ওপর ওই ফুলুরি! বাবু, দুঃখের কথা বলবো কি, যা খেলে সবাই মরে, ও মাগি তাই খেয়ে বেঁচে ওঠে।

শোনো ওয়োটার কথা! বুড়ি খিটখিটিয়ে উঠলো আবার,—যাওনা বাছা নিজের কাজে, খাগোকা দাঁড়িয়ে কেন চুকলি শুনছো? ও ড্যাকরার তিনপুরুষে কি জাতজন্মের ঠিক আছে? ও হোলো বাঁদর বাচ্চা!

ঘাড় তুলে সন্তোষ এবার হাসিমুখে জবাব দিল, বলি জাতজন্ম খেলে কে? তুই খাসনি?

বুড়ি বললে, ওই নাও! বলি বাপকে মানুষ করলে কে? বল্ না তোর ঠাকুমা পালিয়েছিল কার সঙ্গে? বলবো তোর মায়ের কথা লোক সমাজে?

এত বড় কলঙ্কের কাহিনী শুনেও সন্তোষ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলো না। বোধকরি তার ছুতোরের কাজটা ছিল চুক্তিবদ্ধ, অন্যদিকে মনোযোগ দেবার সময় ছিল কম। সুতরাং তেমনি হাসিমুখেই ক্ষিপ্র হস্তে তার কাজ চলতে

লাগলো। কাজ করতে করতেই এক সময় সে বললে, বাবু, ওর কথায় চটবেন না। ভদ্দর লোকের সামনে ও মাগি মান, খাতির রাখতে জানে না।

বুড়ি গজগজিয়ে বললে, মান-খাতির! [illegible] দে না কি দিবি।

সন্তোষ এবার একটা বিড়ি ধরালো। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, বুঝলেন বাবু, আমার ঠাকুরদাদাকে নিয়ে ওর মোট সাতটা মরদ ছিল; সব মিলিয়ে ওর যোলটা ছেলেপুলে। আমার বাপ কিন্তু ওর পেটে হয়নি। সেই জন্যে আমি ওর দুচোখের বিষ।

সে সব ছেলেপুলেরা কোথায় এখন? ওর এই দুঃসময়ে তারা দেখেনা কেন?—আমার কণ্ঠে আবার সহানুভূতি ফুটল।

সন্তোষ বললে, তবেই হয়েছে। তাদের বেশী [illegible] মারাই গেছে বুড়ো হয়ে। নাতি-নাতনিরা ওর ভয়ে যে যার পালিয়েছে। কেউ কা'রো খোঁজ রাখে না।—বড় ঘর কিনা!

বড় ঘর,—সন্দেহ কি? এবার বললুম, কিন্তু নাতি-নাতনিরা যদি যে-যার কাজ হাসিল ক'রে ওকে ফেলে পালায়, তাহলে তাদের কেমন ক'রে ভালো বলব সন্তোষ?

বুড়ি যেন চিতিয়ে উঠল একেবারে। বললে, এতক্ষণে কথার মতন কথা বলেছ, বাছা। একেই বলি মরদের ব্যাটা! ওই মাদির বাচ্চাটা যা বলছে, একটু বিশ্বাস করোনা, বাছা। শূয়োরে কি মানুষের কথা কইতে জানে?

কি ভাগ্য, বৃষ্টির শব্দে সবগুলি গালাগালের ভাষা সন্তোষের কানে পৌঁছুলেও সে যে মারমুখী হয়ে ছুটে আসতো এমন মনে হয় না।

বিড়িতে টান দিয়ে সন্তোষ এবার হি হি করে হাসল। বললে, ওকে সবাই ঠকিয়ে পালাতে চায়, একথা শুনলে বুড়ি ভারি খুশী।

বুড়ি চুপ করে রইল।

সন্তোষ পুনরায় বললে, জিজ্ঞেস করুন দিকি, আমার বাপকে মিথ্যে ফৌজদুরি মামলায় ফেলে দেড় বচ্ছর জেল্ খাটিয়েছিল কেন? বাপের পা ভেঙে দিয়েছিল গুণ্ডো লাগিয়ে ওই মাগি, বুঝলেন বাবু?

বললুম, ছি সন্তোষ, ইনি তোমার গুরুজন, বারবার তুমি এভাবে গাল দিয়ো না।

গুরুজন !—বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে সন্তোষ বললে, তা সেকথা একশোবার। গুরুজন বৈকি। তবে কি জানেন বাবু, মন-মেজাজ ও মাগি ঠিক রাখতে দেয় না সব সময়ে। নৈলে দেখুন না কেন, পাঁচটা মরদকে ধরে ও বুড়ি কারবার করতো বটে, তবে আমার ঠাকুরদাকে নিয়েই শেষ [illegible] ঘরে উঠল। বয়েস কালে ওর মনটা উঁচুদরের ছিল বৈকি। সেই জন্যেই ত ঠাকুমা বলে আজো ডাকি।

বুড়ি আবার তার কাঁথার তলায় চুপ ক'রে রইলো।

প্রবল বর্ষণের ভিতর দিয়ে ছুটে মেয়ে-পুরুষ এবার ওদিকের দরজা দিয়ে ভিতরে উঠে এলো। বৌটাকে দেখেই চিনলুম, এ-পাড়ার মেথরাণি, দুজনেরই হাতে দুটো সেই মার্কামারা বালতি! বালতি ধুয়ে এনেছে নর্দমার জলে।

ভিতরটা আমার পক্ষে এবার যেন অসহ্য হয়ে উঠছে। আন্দাজে বুঝতে পারি বেলা দশটা বাজে। বাড়ী ফিরবার জন্য ছটফট করছিলুম! গরুটা, ছাগল দুটো, কুকুরটা—বাইরে বৃষ্টির জন্য সবাই নির্বিকার। শুধু ভিতরে এক আধটা ইঁদুরের আনাগোনার জন্য কুকুরটা মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে আবার যেন গভীর নৈরাশ্যে ডুব দিচ্ছে!

আমার চাহনিতে বোধ করি নানাবিধ কৌতূহল ছিল; একসময় ওধার থেকে সন্তোষ বললে, গরুছাগল কুকুর যা দেখেছেন সবই ওই বুড়ির পোষা। কুকুরটা পাহারা দেয় রাত্তিরে। গরুটা দুধ দেয় দেড় সের, দুটো ছাগলেও প্রায় তিন পো। মেথর বৌ ভাড়া দেয় মাসে তিন টাকা,—জিজ্ঞেস করুন দিকি এত টাকা যায় কোথায়?

কথাটা শুনে একটু অবাক হলুম বৈকি। সমস্ত ধারণা এবং কল্পনা যেন ওলোট-পালট হতে লাগলো! সন্তোষের মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইলুম। না, এতটা বিশ্বাস করা বোধহয় সম্ভব নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সন্তোষ খুব এক চোট হেসে উঠলো! তারপর বললে, বুড়ি বাঁচবে না দেখছেন, কিন্তু আর পাঁচটাকে নিয়েই ও মরবে!

কেন!

আটটা ন'টা মামলা ঝুলছে ওর খতে। পাঁচ সাতটা উকীল মোক্তার ওর তাঁবেদার।—সন্তোষ মহাখুশী হয়ে বলতে লাগলো, সাধে কি ওর পা ধ'রে পড়ে

থাকি, বাবু ? যদি মাগির একটু মন ফেরে, তাহলে আমাকে আর বাটালি করাত চালিয়ে মজুরি খাটতে হয় না,—পায়ের ওপর পা রেখে ব'সে খাবো চিরকাল!

কি রকম ?

সন্তোষ বললে, কিছু জানেন না দেখছি আপনি। নয় ত কি! পাড়ার লোক হয়েও কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না! ওই হাঁড়ি-কলসীর দোকানখানা দেখছেন ত ?

হ্যাঁ -

ওর পাশে চৌধুরী কোম্পানীর মনোহারীর দোকান ?

রয়েছে ত!

পানের দোকান ওর গায়ে ?—এই তিনখানা দোকানের ভাড়া প্রায় একশো দশ টাকা! জিজ্ঞেস করুন দেখি বুড়ি অত টাকা কি করে ? কোথায় জমিয়ে রাখে ?

বলো কি সন্তোষ ?

সন্তোষ একবার আড়চোখে বুড়ির কাঁথা-কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু একটা পয়সা গলান্ দেখি মাগির হাতের ফাঁক দিয়ে ? পারবেন না। ওর হাতের মধ্যে ভেল্কি! আমি অনেক তালাস করেছি বাবু, কিন্তু টাকা কোথায় রাখে কোন সন্ধান পাই নি।

বললুম, ওর যখন এত ভালো অবস্থা, অসুখের সময় ওকে হাসপাতালে দাওনা কেন ?

হাসপাতাল! তবেই হয়েচে! কা'র ঘাড়ে ক'টা মাথা যে সেকথা তুলবে ?

বুড়ি আবার ন'ড়ে উঠেছে। আমি চুপ ক'রে গেলুম। কিন্তু সন্তোষের যেন কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আবার বলতে লাগলো, খরচা করবে না, শুধু পুঁজি করবে—এই ওর চিরটা কাল! পাঁচটা গরীব দুঃখীকেও ত ডেকে-ডুকে খাওয়াতে পারে, তাও না। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া আর মামলাবাজি।

বুড়ি এবার আর থাকতে পারলো না। বললে, মামলাবাজি ? তোর মায়ের সেই মরদটা আমাকে সেবার ফাঁদে ফেলে নি ?

সন্তোষ এবার যেন একটু রেগে উঠল। বললে, সে ছিল ভদ্দরলোক, তোর মতন নচ্ছার নয়। তুই কি ছেড়েছিলি তাকে? তুইও ত' ঘুঘুর ফাঁদ দেখিয়েছিলি!

বললুম, কে সে লোকটা হে?

সন্তোষ বললে, সে ওই মান্নাপাড়ার সেজবাবু—খাঁটি ভদ্দরলোক। বুকের ছাতি ছিল এই, বাবু। দু'হাতে খরচ করত!

তোমাদের কে হয়?

আমাদের কেউ নয়, তবে আমার মায়ের খুব আলাপী ছিল। এই ত' গেল বছর মারা গেছে। তার টাকাতেই আমরা মানুষ।

চুপ ক'রে গেলুম। সন্তোষ বলতে লাগলো, তোর গুণ কে না জানে, চিরকাল একজনের পেছনে আরেকজনকে লেলিয়ে দিয়েছিস। দুজনে ঝগড়া বেধেছে, আর তুই ভেতরে ভেতরে কাজ গুছিয়েছিস! আমি বলছি বাবু আপনাকে, ওর ওই কাঁথার মধ্যে নোংরাও যত আছে, নোটের তাড়াও তত আছে!

বুড়ি বললে, মুখপোড়া আয় না—নোংরা ঘেঁটে টাকা বার কর্? বুঝবো তুই কত বড় যাদির বাচ্চা!

সন্তোষ বললে, তবে তুই ম'রে গেলে আমি পাবো কি, বল্ত দেখি? চিরকাল যে আমাকে আশায়-আশায় রেখে দিলি,—কোথায় তোর টাকা-পয়সা? বল্না সত্যি করে, কেন এত টাকা পয়সা জমাচ্ছিস্? তোর পুঁজি ত' মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে! মাস-মাস তোর দুশো টাকা রোজগার!

এবার বুঝিবা একটা বিশ্রী কাণ্ড বেধে ওঠে। বুড়ি এবার কাঁথাখানা সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসবার চেষ্টা করল। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে বুড়ির রুগ্ন বীভৎস মুখখানার ওপর দুটো চোখ দপ দপ ক'রে উঠল। বললে, দে না, হাতের কাছে করাতখানা এগিয়ে দে, তোর মাথাটা কেটে নিই!

সন্তোষ অদূরে দাঁড়িয়ে হি হি ক'রে হাসছিল। বললে, ওই দেখুন বাবু, পুঁজির কথা ধরিয়ে দিলেই আগুন হয়ে ওঠে। ওইজন্য দুনিয়ায় ওর বন্ধু নেই, সবাই ওর নামে ভয় পায়। ও না পারে হেন নোংরা কাজ নেই। টাকার গরম কিনা, তাই সবাইকে শাসিয়ে চলে।

বৃষ্টির বেগ এবার যেন একটু কমেছে। এখনও বাইরে পা বাড়াবার মতো আকাশের অবস্থা হয়নি বটে, তবে এবার যেতেই হবে,—জামা কাপড়ের অবস্থা যাই হোক না কেন।

ভয়ে ভয়ে সন্তোষের দিকে আমি কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম,—অন্তত মারাত্মক রোগের ছোঁয়াচটা বাঁচুক। সন্তোষ বললে, কুকুরটাকে সাবধান বাবু, বুড়ি একবার চটলেই মুখের শব্দ ক'রে কুকুরটাকে লেলিয়ে দেয়। ওটা ভারি পাজি।

বুড়ি আবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে আড় হয়ে শুয়ে পড়লো। ভিতরে ঢুকে বিড় বিড় ক'রে কি যেন বকছে। সন্তোষ বললে, অতগুলো মামলা বাধিয়ে রেখেছে, মাগি মরলে সকলের হাড় জুড়োয়, বাবু।

বললুম, কিসের এত মামলা সন্তোষ?

ওই ত' বলে কে? একজনের পেছনে আরেকজনকে উসকিয়ে দেয়, এই ওর চিরকেলে স্বভাব। এই দেখুন না এই যে সামনের জমিটা,—প্রায় পৌনে তিন বিঘে,—এ জমি হোলো খিদিরপুরের চাটুয্যেদের। ও মাগি বেনামীতে চোদ্দ বছর খাজনা জুগিয়ে এই জমি দখল নিয়েছে। অত বড় জমিদার হিমসিম যাচ্ছে হাইকোর্টে গিয়ে। দু হাজার টাকা ক'রে এ জমির কাঠা!

কুকুরটা এবার আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গোঁ গোঁ ক'রে উঠল। সন্তোষ তাড়াতাড়ি করাতখানা হাতের কাছে টেনে নিল। চেয়ে দেখি বৃষ্টি এবার ধ'রে গেছে। এবার এ নরককুণ্ড থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি।

চারিদিকে জল জমেছে। আকাশ কিন্তু এবার শান্ত। আমার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ কয়েক পা বাইরে বেরিয়ে এলো। বললে, বুড়ির মরবার আর দেরি নেই। তবে পুরনো হাড় কিনা বাবু, ক্ষয় হ'তে সময় লাগে। কিন্তু ওর চেহারা যা দাঁড়িয়েছে, এবার যাবে। আর একটা ওলাউঠোর ধাক্কা যদি যায়, ও নিজেই কাৎ হবে! এ সব কি জানেন, মরবার আগে কামড় দিচ্ছে! মরবে নিশ্চয়ই।

সন্তোষকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে হন হন ক'রে এবার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়ে চললুম।

জীবন-মৃত্যু

এক

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য, পঞ্চান্ন টাকা মাসিক বেতনের কেরানি, গোয়াবাগানের এক পুরনো বাড়ীর বারো টাকার ভাড়াটে, দুটি সন্তানের জনক এবং বিপত্নীক, —হঠাৎ মারা গেলেন সন্ন্যাস রোগে তাঁর বেতনের মাপে পঞ্চান্ন বছরে পা ছুঁইয়ে। নগণ্য, অখ্যাত ও অকিঞ্চন কেরানির মৃত্যু, সুতরাং গোয়াবাগানের গোবরের গলি পেরিয়ে সেই সংবাদ আর বেশি দূরে এগোতে পারলো না। কেরানি-সমুদ্রে একটি বুদ্বুদ হারিয়ে গেল, কে খোঁজ রাখে।

শোনা যায় বাঙালী কেরানি মরে দারিদ্র্যে আর অনাহারে, মরে বিনা চিকিৎসা আর যত্নে, কেরানি মরে উপেক্ষার অপমান মাথায় বয়ে। কিন্তু ভাগ্যবান মৃত্যুঞ্জয়! এক ফোটা ওষুধও খাননি।

রেণু বললে, পুণ্যের শরীর, হাসতে হাসতে বাবা চ'লে গেলেন।

হাসতে হাসতে?—অশোক বললে, অমন খেলো বিশ্বাস আমার নেই। বরং কেঁদে গেছেন বললে বুঝতে পারি। আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, চেয়ে দেখেছিস?

রেণু বললে, কিন্তু বাবা যে বলতেন, তাঁর আপিসে তোমার একটা চাকুরি হতে পারতো?

পারতো, কিন্তু হয়নি। দাসত্বের অপমান আমার কপালে লেখা নেই।—মুখের একটা শব্দ ক'রে অশোক চুপ ক'রে রইল।

তবু কেরানি-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের অবস্থা কিছু ভালো ছিল বৈ কি। অর্থাৎ কর্তব্যপরায়ণ এবং অধুনা মৃত ভট্টাচার্য মহাশয় বেঁচে থাকতে আজীবনের মেয়াদে একটি হাজার টাকার বীমা করেছিলেন মাসিক তিন টাকার কিস্তিবন্দীতে। সৃষ্টিকর্তা পিতা ঋণী ছিলেন সন্তান দুটির কাছে, সেই ঋণ সাধ্যমতো পরিশোধ ক'রে গেছেন।

রেণু বললে, চাকরিটা পাওনি, কিন্তু টাকাটা ত পাবে, দাদা?

অশোক বললে, সে-টাকা কাজে আসবে না, যাবে অকাজে, তোর বিয়েতে।

টাকা লাগবে, এমন বিয়ে আমার হয়ে কাজ নেই। টাকা কবে পাওয়া যাবে, এখন বলো দেখি?

চিঠি লেখালেখি ত' করছি।

রেণু চিন্তিত হয়ে বললে, তাড়াতাড়ি ওটা আদায় করো। নৈলে এদিকে বড় মুস্কিল। বাড়ীর মালিক আর মাত্র দিন আষ্টেকের সময় দিয়েছেন।

অশোক বললে, বাবার সম্পত্তি আর কি কি আছে শুনি?

রেণু জবাব দিলে, তোমার কথা শুনলে গা জ্ব'লে যায়। থাকবে আবার ? বাসন কোসন আর একটিও নেই, শ্রাদ্ধের আগে সব বিক্রি করেছি। বিছানাগুলো ফেলে দিলে কেউ ছোয় না। আর জিনিসপত্র? ভাঙা তোরঙ্গ একটা, ছারপোকাধরা তক্তা একখানা, গোটা দুই চার হাঁড়িকুঁড়ি আর রান্নার কড়াখুন্তি,—তুমি ত' জানো সব।

জানি—অশোক বললে, বাৎসল্য ছাড়া বাবার আর কিছু সম্বল ছিল না। কিন্তু মায়ের সেই পুরনো গয়নাগাঁটি?

গয়নাগাঁটি?—পোড়া কপাল। মাকড়ি একজোড়া ছিল, সেবার তোমার টাইফয়েডে বাবা বা'র ক'রে দিলেন গয়লা-বৌয়ের হাতে,—তেরো টাকায় বিক্রি। আর এই যে আমার হাতে মায়ের সেই সোনামোড়া লোহার রুলি।

কিন্তু বাবার শাল-দোশালা?

থামো, দাদা। অশ্রদ্ধা ক'রে কথা ব'লো না। শালের মধ্যে ছিল কানপুরি একখানা ধোসা, সেখানা বাবার সঙ্গেই গেছে। আর দোশালার মধ্যে ছেঁড়া বনাতের কোট,—ওর মধ্যে নেংটি ইঁদুরে বাসা বেঁধেছিল, সেদিন খুলে দেখলুম। পৈতৃক সম্পত্তি কেউ পায়, কেউ পায় না, তা'র জন্যে তোমার জ্বালা কেন, দাদা?

অশোক হাসিমুখে বললে, জ্বালা নয় রে পোড়ারমুখি, খতিয়ে দেখছি কোথায় আমি দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছি পায়ের তলায় মাটি কোথাও

নেই, কেবল অগাধ জল।—যাকগে। মামার ওখান থেকে কোনো খবর এসেছে রে ?

এসেছে।—রেণু নত হয়ে বললে।

লিখেছেন কি ?

রেণু ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তারপর ফিরে এসে একখানা চিঠি অশোকের হাতে দিল। চিঠি প'ড়ে অশোক স্তব্ধ হয়ে ভগ্নীর মুখের দিকে তাকালো।

রেণু বললে, মামীমাও আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন। সে অনেক কথা।

কি শুনি ?

লিখেছেন, মামা চাকুরি করেন ধোপার দোকানে। আঠারো টাকা মাইনে। সকাল ছটা থেকে রাত দশটা খাটুনি। তা ছাড়া তিনি বেতো রুগী।

তারপর ?

মাগ্‌গি-গণ্ডার দিন। খেতে পরতে দেওয়া বড়ই অসুবিধে।—রেণু যোগ ক'রে দিলে।

অশোক বললে, কিন্তু আমি যে বললুম, তুই গিয়ে থাকলে আমি সব খরচ দেবো ?

রেণু বললে, তা'তেও তাঁরা রাজী নন্ ?

কেন ?

রেণু ইতস্তত ক'রে বললে, উনিশ কুড়ি বছরের কুমারী মেয়েকে ওঁরা জায়গা দিতে চান না, দেখাশোনার লোক কম।

অশোক বললে, দেখা শোনা আবার কি ? খাবি, থাকবি, কাজকর্ম করবি,—তুই বরং তাদের সহায় !

মামীমা সে-কথা বোঝেন না।

চুলোয় যাক্—ব'লে অশোক বেরিয়ে গেল।

আট দিনের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এলো। এদিকে ভাতের সঙ্গে তরকারীর সংখ্যাও ক'মে আসতে লাগলো। ভীত কণ্ঠে রেণু সেদিন বললে, দাদা, কই কিছু করলে না ত ?

অশোক বললে, আমার এক বন্ধু সপরিবারে যাচ্ছে বিদেশে, তাদের বাড়ীর একটা ঘর ছেড়ে দিতে রাজি আছে।

কেন?

আমরা থাকবো গিয়ে সেখানে।

রেণু বললে, পাগল নাকি তুমি?

সবিস্ময়ে অশোক বললে, কেন?

হাসিমুখে রেণু বললে, অমন ক'রে তাকিয়ো না দাদা, তোমাকে বোকা ব'লে মনে হয়। অমন ক'রে কখনো থাকা যায়? তা ছাড়া তারা ফিরে এলে ত আর থাকতে দেবে না।

তা ত' দেবেই না।

সুতরাং সেখানে গিয়ে কাজ নেই। শুধু ত থাকা নয়, সম্মানের সঙ্গে থাকা। আমি বলি এক কাজ করো।—রেণু বললে, গিরিমাসির ওখানে আমাকে নিয়ে চলো। আমি থাকবো সেখানে, তুমি থাকবে বন্ধুর বাড়ী।

অশোক বললে, প্রথমত গিরিমাসি অত্যন্ত দাম্ভিক, দ্বিতীয়ত বিমাতার বোন, তেমন আদর নেই।

রেণু বললে, আদরের চেয়ে আশ্রয়ের দাম বেশি। মেয়েদের জায়গা মেয়েমানুষের কাছে নিশ্চয়ই আছে। আমাকে সেখানেই নিয়ে চলো, দাদা।

অগত্যা গিরি মাসি। সঙ্গে নেবার মতো জিনিষপত্র কিছু নেই। ছোটবেলাকার পুতুলের বাক্স, দুখানা পুরানো শাড়ি আর একটা জামা, পরণে যা আছে তাই,—এই নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে একদিন গা ঢাকা দিয়ে রেণু চললো অশোকের পিছু পিছু। শাড়িখানা ময়লা, পথের আলো এড়িয়ে পথ পেরিয়ে গেল।

গোয়াবাগান থেকে কাশীপুর। সোজা, সহজ, অবারিত পথ। নামহারা এক গলির মধ্যে ঢুকে সাবেক কালের এক নোনাধরা বাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল।

গিরিবালা অনেককাল পরে দুই ভাইবোনকে দেখলেন। রেণুর আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে বললেন, তা আসবে বৈ কি মা, মাসি ত বটে। আগেকার বিবাদ-বিসম্বাদ মনে রাখলে চলবে কেন?

উভয়ে তাঁর পদধূলি নিল।

গিরিবালা বললেন, তা বেশ—থাকো। দিনান্তে এক মুঠো বৈ ত নয়। তুমি বাবা এসো মাঝে মাঝে, বোনের খবর নিয়ো। এরপর বে থা দিতে হবে ত? হ্যাঁ লা, খাওয়া দাওয়া তোদের জুটতো না শুনতুম, কিন্তু এমন রূপ আর গড়ন পেলি কোথায়?—আচ্ছা বাবা, এসোগে তুমি, আবার রাত হয়ে এলো ওদিকে।

সদর দরজা থেকেই মাসিমা অশোককে বিদায় দিতে চান্, ওতে তাঁর জলখাবারটা বাঁচবে। অপমানবোধে রেণুর মুখ রাঙা হয়ে এলো।

কিন্তু অশোক খুশী হয়ে বললে, আচ্ছা মাসিমা, আমি চললুম। আসবো বৈ কি মাঝে মাঝে। মা নেই, আপনি আছেন, এই ভরসা রইল।—এই ব'লে সে মুখখানা আড়াল ক'রে গলি পেরিয়ে চ'লে গেল। পথে নেমে হাঁপ ফেলে বাঁচলো। রেণুর আশ্রয় মিলেছে। মিলেছে অনেক কষ্টে। এবার তার নিজের একটা কিছু। একটা ট্যুইশনি তার আছে, আর আছে বুকের মধ্যে অগণ্য স্বপ্ন—কালো বাদুড়ের মতো যে-স্বপ্নগুলো রাত্রির অন্ধকারে তা'র চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়। এবার একটা কোনো পন্থা—উপার্জনের, দুরাশার, দুঃসাহসিকতার, যা হোক একটা কিছু। বন্ধন দশা তার ঘুচলো এবার। অশোক ছুটতে ছুটতে চললো।

এদিকে মাসিমা রেণুকে নিয়ে ভিতরে যাবার আগে একবার থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, সঙ্গে কিছু এনেছিস না? পয়সা-কড়ির কথা বলছি।

না, মাসিমা।

খরচপত্তর অশোক কিছু দেবে না তোর জন্যে?

হ্যাঁ, তা দাদা দেবেন। ছেলে পড়িয়ে দাদা কিছু কিছু পান্।

দিলেই ভালো। ওঁর অবস্থা ত জানিস। চটকলের সামান্য কাজ। কিছু কিছু কাঁচা পয়সা—এই যা। হ্যাঁ, আর এক কথা। আমার ছেলেরা বড় হয়েছে, আগে ত তোমাকে ওরা দেখেনি। বোন ব'লে ওরা জানেই না। একটু সাবধান হয়ে থাকিস, বাছা।

পরিষ্কার কণ্ঠে রেণু বললে, একি আর বলতে হয়, মাসিমা? ওরা সবাই আমার সহোদর ভাই। সবাই আমার দাদার মতন।

দুই

বন্ধুর বাড়ীতে বাহির মহলে অশোক একখানা ঘর পেয়েছিল। দিন পনেরো পরে একদিন রাত্রে সে এসে দরজা খুলতে গিয়ে দেখে ভিতর থেকে বন্ধ। ঠেলাঠেলি করতে দরজা খুললো। অশোক চেয়ে দেখলো, রেণু।

তুই? মানে?

মানে ফিরে এসেছি।

ফিরে এসেছিস আমার সঙ্গে উপোস করতে? জ্বালাতে?

হ্যাঁ।—ব'লে রেণু ভিতরে গিয়ে একপাশে দাঁড়ালো।

অশোক গরম হয়ে উঠেছিল। গায়ের জামাটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে। রেণু তৎক্ষণাৎ জামাটা তুলে নিয়ে গুছিয়ে রাখলো। তারপর আবার চোরের মতন দাঁড়ালো একধারে।

অশোক প্রশ্ন করলো, এলি কখন্?

দুপুরবেলায়।

কার সঙ্গে?

একলা।

একলা! চিন্‌লি কি ক'রে?—অশোক বিস্মিত হোলো।

রেণু বললে, ঠিকানা জানা থাকলে কল্‌কাতা শহরে কানাতেও চিনতে পারে।

অশোক বললে, আলো পেলি কোথায়?

রেণু বললে, পাশের বাড়ীর ঝিয়ের কাছ থেকে জোগাড় করেছি। আমাকে ওটা দান করেছে সে।

কেরোসিন কুপির দুর্গন্ধময় শিখার দিকে চেয়ে অশোক বললে, ফিরে এলি কেন শুনি?

সে-কথা তুমি শুনতে চেয়ো না। বলতে পারবো না।

মানে? আমি তোর গার্জেন, সব কথাই আমার শোনা চাই আচ্ছা, বেশ, যেটুকু আমার নিতান্ত জানা দরকার, তাই শুধু বল্।

তুমি শুধু জেনেই রাখোনা দাদা, যে, আমি ফিরে এসেছি?

শান্তকণ্ঠে অশোক বললে, তা নয় রে। আমি কেবল জানতে চাই, একটা নিরাপদ আশ্রয় কেন তুই ছেড়ে এলি ছেলেমানুষী ক'রে।

রেণু বললে, সে-আশ্রয় নিরাপদও নয়, আমিও ছেলেমানুষ নই দাদা।

গিরিমাসি কি তাড়িয়ে দিলে?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি তাঁর মেজ ছেলেকে অপমান করেছি সেই কারণে।

অশোক বললে, তুই অপমান করতে গেলি কেন?

রেণু বললে, না করলে নিজে অপমানিত হতুম।

অশোক কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললে, যাকগে, বেশ করেছিস। একটু জল খাওয়া দেখি, ওই যে ওখানে কলাইয়ের একটা গেলাস আছে।

জল খেয়ে অশোক সুস্থ হয়ে বসলো। তারপর বললে, এ বাড়ীতে ত' থাকা সম্ভব নয়। সুরেনরা চিঠি দিয়েছে, ওদের অসুখ-বিসুখ চলছে, শিগগিরই ফিরে আসবে। কি করা যায় তাই ভাবছি! কই, তোর কাপড় চোপড়গুলো আনিসনি কিছু?

রেণু বললে, অত ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে কিছু আনা হয়নি। যাকগে, যা হোক ক'রে চালিয়ে নেবো।

দু-দুখানা কাপড় ছেড়ে দিয়ে এলি?

রেণু চুপ করে রইল। একথা অশোককে বোঝানো সম্ভব নয়, কী লাঞ্ছনা আর অসম্মানের ভিতর থেকে সে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে এসেছে। সহোদর ভাইয়ের কানে সে-কথা তুলতে যে কোনো মেয়েরই বাধে।

কিছু খাসনি ত সারাদিন?—দেখ্ দেখি, ওই তোরঙ্গটার পাশে চিঁড়ে ভিজানো আছে, চিনিও রেখে গেছি। ভাগ্ কর দেখি, খাই দুজনে।

বিরক্ত হয়ে রেণু বললে, যেমন তোমার বুদ্ধি। এসেই আমি দেখেছি। নীচের তলাকার ঘর, খাবার জিনিস কি থাকে? সব ইঁদুরে নষ্ট করেছে।

বলিস কি রে? দু' পয়সার চিঁড়ে!—অশোক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।—খাবো কি? রাত দশটা বাজে তা জানিস্?

রেণু বললে, জানি। কলকাতা শহরে সারারাত খাবারের দোকান খোলা থাকে। যাও, খাবার আনো।

অশোক উঠে খাবার আনতে চ'লে গেল।

চার পাঁচ দিন বাদে কিন্তু আর এখানে থাকা সম্ভব হোলো না। আহারের সমস্যাটার এক প্রকার সমাধান করা চলে, কিন্তু আশ্রয়ের সমস্যাটাই বড়। কলকাতায় মেয়েদের বোর্ডিং আছে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত হোস্টেলও আছে, কিন্তু বিনামূল্যে ব্যবস্থা কোথাও নেই। যদি বা সে-প্রকার জায়গা খুঁজে পাওয়া যায়, সেখানে চরিত্রবতী ভদ্রকন্যার পক্ষে সম্মান রক্ষা ক'রে থাকা কঠিন। রেণু এমন লেখাপড়া শেখেনি যাতে উপার্জনক্ষম হ'তে পারে, কিম্বা কোনো স্বাধীন জীবিকার পথ পায়। স্বর্গত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের বংশানুক্রমিক ইতিহাসে নারীশিক্ষা ছিল নিষিদ্ধ। সেই সব সনাতন অভিজাত মহাপুরুষরা—যাঁরা অশোক আর রেণুর পিতৃ-পিতামহদল—তাঁরা মূর্খ নারীকে নিজেদের পারিবারিক ব্যবস্থার সক্রিয় উপাদান মাত্র ব'লেই মনে করতেন। আজ তাঁদের সেই অজ্ঞানের বোঝা বইতে হবে অধঃপতিত জীবনের মূল্য দিয়ে। তাঁরা সুখে বাস করুন স্বর্গে।

দুজনে আলাদা থাকলে ভরণ-পোষণে কুড়ি পঁচিশ টাকার কম কিছুতেই না। পাঁচজনের মাঝখানে থাকলে উপবাস করা সম্ভব নয়। ভিখারী হলে বিপদ ছিল না,—পেট চ'লে যেতো। কিন্তু ভদ্র হবার যন্ত্রণা অনেক বেশি। সুতরাং নিরুপায় হয়ে অশোক একখানা ঘর ভাড়া করার জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

কিন্তু তেমন ঘর পাওয়া সহজ নয়। একা অবিবাহিত যুবক, সামান্য মলিন পরিচ্ছদ,—ঘর পাওয়া অসম্ভব। অজ্ঞাতকুলশীল, হয়ত বিপ্লবী, হয়ত বেকার, হয়ত বা এখনকার কম্রেড,—সাপ পুষবে কে বাড়ীর মধ্যে? কনিষ্ঠ সহোদরাকে সে আগ্‌লে থাকবে একথা শুনে এক ভদ্রলোক মুখ মট্‌কে হেসে বললেন, রাস্তার কলে মাথাটা ধুয়ে আপনি বাড়ী যান।

অবশেষে বেলেঘাটার দিকে মিললো একখানা ঘর। ভাড়া মাসিক চার টাকা। ট্যুইশনির টাকা থেকে বাড়ীভাড়া শোধ ক'রে আর থাকবে ছ'টাকা। রেঁধে খেলে দু'জনের ছ'টাকায় চলবে, অবশ্যই চলবে—ভদ্রলোক ব'লেই

চলবে। পৃথিবীর নিঃস্বের দলে তারাও দুজন, এই ত সকলের বড় সম্মান। তারা ভদ্রসন্তান ব'লেই সহ্য করবে এই দুর্দশা, এই দারিদ্র্য।

ঘরখানা ঠিক ক'রে অশোক নিশ্চিন্ত হয়ে রেণুকে আনতে গেল।

সে এক অদ্ভুত জীবনযাত্রা সন্দেহ নেই। বেলেঘাটার এক বাড়ীর দোতলার দক্ষিণ দিকে একখানা ঘর। বাড়ীর মালিক এক প্রৌঢ়া মহিলা। তিনি নিঃসন্তান। নীচের তলাকার ঘরখানায় এক গানের আড্ডা, সেখানে প্রায়ই নাটকের অভিনয়-মহড়া চলে। তাস, পাশা, বিড়ির ধোঁয়া, অশ্লীল আলাপ আর ইতর রসিকতায়,—সেই ঘরের কোলাহল মাঝে মাঝে মুখর হয়ে ওঠে। পানওয়ালা, কুলপি-বরফওয়ালা, চটকলের বাবু, মুদির দোকানের বিক্রেতা,—এদের সকলের সম্মিলিত বিশ্রম্ভালাপে কোনো কোনো সন্ধ্যারাত প্রতিবেশীদের কাছে প্রাণান্তকর ব'লে মনে হয়। বাড়ীর গিন্নী থাকেন পিছনের ঘরে। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের লোক নেই, সেজন্য গানের আড্ডা তাঁর পক্ষে অরুচিকর নয়। উপর তলাকার ঘরখানা খালি পড়ে ছিল, সেখানা সানন্দে তিনি অশোককে ছেড়ে দিলেন।

অদ্ভুত জীবনযাত্রা বৈ কি। চার টাকা ভাড়া দিলেও এখানে দাবি যেন কিছু নেই, এ যেন করুণার আশ্রয়। যেদিন খুশি, উঠিয়ে দেবার নির্দেশ আসতে পারে। দুজনে ভয়ে ভয়ে রইল। আসবাব পত্র নেই, ঘরের শৃঙ্খলা নেই, বসবাসের কোনো স্থায়িত্ব নেই। অশোক স্থির করেছে, রান্না বান্নার কোনো আয়োজন করা হবে না। কাছাকাছি 'পাইস হোটেল' আছে, সেখান থেকে নগদ ডাল ভাত তরকারী—এসব আনলেই চলবে। দু'আনায় দুজনের খাওয়া যথেষ্ট। ভারতবর্ষের লোকেরা নাকি দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তারাও যদি সেই অর্ধাহারীর দলে ভিড়ে যায় তবে লজ্জা নেই।

বৌবাজারের চোরাহাট থেকে অশোক একটাকায় চার খানা কাপড় নিয়ে এলো। আসছে মাসে এক বন্ধুর কাছে আর দুটো টাকা সে ধার করবে,—তাতে এক বছরের মতো জামা কাপড় হয়ে যাবে। জীবনযাত্রা সরল হ'লে আর দুঃখ নেই, উচ্চাশা ত্যাগ করলে নিষ্ফল ক্ষোভের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে হবে না,—গান্ধীজী বলেছেন। অশোকও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে হবে একজন ছোটখাটো গান্ধী। সে প্রমাণ করবে, ব্যয়বাহুল্যের অনাচারেই যত

দুর্দশা, যত অভাব। একজনের খাই-খরচ এদেশে মাসে পাঁচ টাকা, কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপকরণ মেটাতে পঁচিশ টাকা। উচ্চাশা মন থেকে মুছে দাও, বিলাস-মনোবৃত্তি ত্যাগ করো,—জীবনটা সহজ। যে পুরুষ নিত্য গোটা পৃথিবী সৃষ্টি করছে, সে আজ বেকার—এতবড় লজ্জা পুরুষের ভাগ্যে কবে জুটেছে? বিষ্ণুর বুকে পা রেখেছিল ব্রাহ্মণ,—সে-ব্রাহ্মণ কর্মী পুরুষ, ক্রিয়াশী-লতায় বিশ্বের পালন-কর্তাকে সে পরাভূত করেছিল। পিপীলিকা বেকার নয়; পশু-পক্ষী-পতঙ্গ বেকার নয়; মুচি-ধোপা-নাপিত-মুদি-গোয়ালা, তাদের মধ্যে বেকার কেউ নেই; কুলি-মেথর ঝাড়ুদার-শ্রমিক,—তারাও বেকার নয়। বেকার কেবল ভদ্রলোক! কুশিক্ষা আর অশিক্ষায় যারা সৃষ্টি-শক্তিহীন, কায়িক পরিশ্রমে অপটু, যারা সুলভ আত্ম-সম্ভ্রমবোধের আঁচলধরা পঙ্গুতায় অনড়, যারা মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দিতে জানে না, চাটুবৃত্তি আর সুপারিশের কাঙালপণায় পৌরুষকে নিত্য যারা অবমানিত করে,—তারাই নাকি মধ্যবিত্ত বেকার।

এই বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র আওড়াতে আওড়াতে অশোক ঘরে এসে ঢোকে, আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেমন যেন মনে হয় তার, একদিন আসবে যেদিন মধ্যবিত্ত নামক পদার্থটি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই যে তা'র জনশ্রুত পিতা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য এত কষ্টে তা'কে বি-এ পাস করিয়েছেন—এ কিসের জন্য? এদেশের কুশাসন, কুনীতি, কুপ্রথা আর কুসংস্কারকে সে কেরানি-জীবন যাপনের দ্বারা সমর্থন ক'রে চলবে, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত হয়ে থাকবে, এই কারণেই কি নয়? অক্ষম গভর্ণমেণ্ট, শোষক ব্যবসায়ী, বিলাসী জমিদার সম্প্রদায়, আর লালসাস্ফীত ধনাঢ্যের দল—এদেরই সমর্থন ক'রে, এদেরই হাত থেকে পারিশ্রমিক নিয়ে মধ্যবিত্তের সৃষ্টি। ধন্য মধ্যবিত্ত, দাস্য সুখে হাস্য মুখ!

রেণু একদিন বললে, টাকাটা পাবার কি করলে, দাদা?

অশোক বললে, বাবার 'ডেথ সার্টিফিকেট' ওরা চেয়েছিল, পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপর আর চিঠি আসেনি।

টাকা পাওয়া যাবে ত?

নিশ্চয়ই।

সেই টাকায় কি করবে মনে আছে?

আছে রে, তোর বিয়ের জোগাড় করবো।

বিয়ে! বিয়ে আমি কিছুতেই করবো না। সেই টাকা পেলে তুমি একটা ছোটখাটো ব্যবসা আরম্ভ করবে।

অশোক বললে, হাস্যকর প্রস্তাব। বি-এ পড়ার মধ্যে অর্থশাস্ত্র ছিল বটে, কিন্তু অর্থকরী শিক্ষা ছিল না। ব্যবসা করতে গিয়ে টাকা নষ্ট হ'লে ভাগ্যও ফিরবে না, তোর বিয়েও হবে না।

রেণু বললে, কিন্তু বিয়ে ত আমি করবো না, দাদা?

কি করবি?

ভালো করে আমি লেখাপড়া শিখবো।

শিখে কি করবি?

শিক্ষিত মেয়েরা যা করে তাই করবো।

অশোক বললে, অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিবি। লেখাপড়া শেখা ত ভালো, কিন্তু ছেলেদের অন্ন যাবে মেয়েদের হাতে। তোরা হাসিমুখে কাজ আদায় করবি, আর ছেলেরা মুখ কালো ক'রে ফিরে যাবে। এখনই বেকার মেয়ের দল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এর ফল কি জানিস?

তুমি কি লেখাপড়া শিখতে মানা করো?

মোটেই না। আমি বলি, ঠিক কোন্ লাইনে কাজ নিবি, সেই অনুসারে লেখাপড়া কর্। পারবি?

রেণু বললে, পারবো।

অশোক একদিন বোনের জন্য সহজ পাঠ্য কতকগুলি বই-কাগজ এনে হাজির করলো এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাস তিনেক ধ'রে সকাল, দুপুর ও রাত্রে রেণুকে পড়াতে লাগলো।

একদিন হঠাৎ অসময়ে সে ফিরে এলো। রেণু কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকালো। অশোক হেসে বললে, ট্যুইশনিটা গেল।

কেন?

ছাত্রের বাবা মোটা চাকরি পেলেন দিল্লীতে, তাঁরা কাল চ'লে যাচ্ছেন—এই ব'লে এ-মাসের আংশিক কাজের দরুন সাড়ে চারটি টাকা অশোক রেণুর হাতে দিল।

বিবর্ণ ভীত মুখে রেণু বললে, সাড়ে চার টাকায় ক'দিন চলবে?

অশোক বললে, তিন আনা ক'রে রোজ—সাড়ে চার টাকায় অন্তত তিন সপ্তাহ ত বটেই।

কিন্তু ধোপা, বাড়ীভাড়া, কেরোসিন তেল—

ভয় পাচ্ছিস কেন? হাজার টাকার কথা ভেবে সাহস সঞ্চয় কর,—ও টাকা ত আর মারা যাবার ভয় নেই। অবশ্যই পাবো। আজ না হয় কাল। ইতিমধ্যে যা হোক ক'রে চালিয়ে নে।

কিন্তু চালাবার কোনো উপায় নেই, তা জানো দাদা?

অশোক হেসে উঠলো। বললে, আচ্ছা ধর, আমি মেয়ে আর তুই পুরুষ— আমি যদি বাড়ীতে থাকতুম, তুই কেমন করে খাওয়াতিস? একটা বুদ্ধি বার কর দেখি?

নির্বাক স্তব্ধ হয়ে রেণু দাঁড়িয়ে রইল। হাসি-পরিহাসে যোগ দেবার তার একটুও আর সামর্থ্য নেই।

কই, জবাব দিলিনে?

না, দেবোনা জবাব।

অশোক বললে, আমি তোর গার্জেন, আমার কথার জবাব দিবিনে কেন?

রেণু বললে, গার্জেন তুমি আমার নও, আমিই তোমার অভিভাবক। আমি বলছি, ওই গানের আড্ডা থেকে একখানা আয়না এনে নিজের চেহারাটা একবার দেখো। কী হয়ে উঠেছ, দেখতে পাচ্ছ?

অশোকের শিশুকালে শোনা তার মায়ের কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়। তাঁরই প্রেতিনী যেন এসে তার সহোদরার কণ্ঠে ভর করেছে। ঢোক গিলে অশোক বললে, তা অবস্থা খারাপ হ'লে চেহারা খারাপ ত হবেই।

রেণু বললে, সুতরাং আমি স্থির করলুম, আজ থেকে এখানেই রান্নাবান্না করবো। বাইরে থেকে ডাল ভাত এনে তোমাকে খেতে দেবো না।

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অশোক বললে, পোড়ারমুখি, তার মানে জানিস?

হ্যাঁ, জানি। রোজ আট আনা পড়বে, পড়ুক। তুমি যেমন করে হোক আজ থেকে রোজগার করবে। এই বলে রাখলুম।

অশোক বললে, এখনও বলছি এসব দুর্বুদ্ধি মাথায় ঢোকাসনে রেণু, সর্বনাশ হবে।

রেণু বললে, থামো দাদা, আমার কথার ওপর কথা বলতে এসোনা। খাওয়াতে যদি তুমি না পারো, আমি ঝি-গিরি করতে যাবো। যারা হতভাগ্য, যাদের অন্ন জোটে না, তাদের আবার পরিচয় কি? ঝি-গিরি কিম্বা রাধুনী-গিরি—যা পাই।

তুই কি আমার সর্বনাশ করতে চাস রেণু?

রেণু হাসলো। হেসে বললে, বা'র বা'র ও কথা ব'লোনা। তোমার আছে কি যে সর্বনাশ হবে?

তা বটে। অশোক চুপ ক'রে গেল।

আশ্চর্য মনে হয় রেণুর এই নিঃসঙ্গতা। স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দের স্বাদ তার জানা নেই, এই প্রকার জীবনের অবস্থাই যেন স্বাভাবিক। সে ভাগ্যক্রমে অনেক নীচে পড়ে গেছে, এই চেতনা থাকলে উপরের মানুষদের প্রতি তার ঈর্ষা থাকতে পারতো। কিন্তু তা নেই। রেণুর দুঃখবোধ কম। সেজন্য অনেক প্রশ্নের সহজ জবাব মনে মনে সে পেয়ে গেছে।

কিন্তু একালীন মানুষ আর মানুষীর দল হয়ত অনেক এগিয়ে চলেছে, এই কথা কল্পনা করলেই তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না, সকলের পায়ে পায়ে সমান গতিতে চলতে হবে। দুঃখ, দারিদ্র্য, ভাগ্যের লাঞ্ছনা—এসব মনের একটা অস্থায়ী অবস্থা বিকার মাত্র। যেমন মেঘ ভেসে চলে সূর্যরশ্মিকে ঢেকে। মাঝে মাঝে বর্ষণ, মাঝে মাঝে কুয়াশা, কিন্তু যে বিশাল অগ্নিকুণ্ড থেকে বিশ্বের প্রাণ-প্লাবন নিত্যকাল ধ'রে নিঃস্রাবিত হচ্ছে, সেইটি সত্য। দুঃখবোধ না থাকলে দুঃখের অস্তিত্ব নেই; মন সেখানে সহজ, নির্বিকার। নিঃস্বের চক্ষু কেবলই রিক্ততাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরীক্ষা করে, তাই তার প্রাণের মধ্যে বেদনার নিত্য আন্দোলন। রেণু সেদিক থেকে নিজেকে সরিয়ে দেখতে লাগলো।

এটা হাস্যকর অনেকেই বলবে। কূপমণ্ডুক জানে, আলো তার পক্ষে বাধা, অন্ধকারটাই সত্য। দারিদ্র্য আর দৈন্যবোধ যার নেই, অধঃপতিত অবস্থাকে যারা অপমানজনক মনে করে না, তাদের উন্নতি ঘটবে কেমন ক'রে?

যারা সর্বহারা তারা সবাই সন্ন্যাসী হতে পারতো, কিন্তু হয়নি। তাদের সংগ্রাম কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়, অভাবকে নষ্ট করার জন্য। তারা বড় হবে, মানুষ হবে, অধিকার আহরণ করবে, শক্তি সঞ্চয় করবে। জীবনযুদ্ধের আদি কথা এই।

কেরোসিন প্রদীপের মলিন শিখার দিকে রেণু স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। সামনে একরাশি বই-কাগজ। পাশে মেঝের ওপর একখানা হাত মাথার তলায় দিয়ে পরিশ্রান্ত অশোক তন্দ্রাচ্ছন্ন। রাত বারোটা বাজে।

কিন্তু দুরাশার একি পরিহাস? আগন্তুক কেউ ঘরে এসে দাঁড়ালে এখনই বলবে কি? নিরুপায় দুটি ভাই-বোন একান্ত আগ্রহ আর অধ্যবসায়ে প্রস্তুত হচ্ছে—ভবিষ্যৎ স্বপ্ন-সফলতার জন্য—একি অন্ধকারের দিকে ঢিল ছোড়া নয়! কী তা'রা পাবে? কী তা'রা চাইবে? কোন্ দিকে তাদের পথ?

দাদা?

সচকিত হয়ে অশোক তাকালো। বললে, কি রে?

ঘুমোলে?

না, ঘুমোইনি। শুয়েছিলুম চুপ ক'রে।

রেণু বললে, লেখাপড়া কতদিন আমাকে করতে হবে, বলতে পারো?

হাসিমুখে অশোক বললে, যতদিন তুই বাঁচবি।

কিন্তু লাভ কি?

তন্দ্রার ঘোরে অশোক দর্শন-শাস্ত্র আওড়িয়ে দিল। বললে, লেখাপড়া ত লাভের জন্য নয়, পথ খুঁজে পাবার জন্যে।

রেণু বললে, তুমি ত পথ খুঁজে পাওনি, দাদা?

অশোক কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, যে-শিক্ষায় নিজের পথ খুঁজে পাওয়া যায়, সেই শিক্ষা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যি আমাকে দেন নি।

তবে কি তুমি বলতে চাও, একালের কোনো বাপ-মা ছেলে মেয়েদের সৎশিক্ষা দেয় না?

হ্যাঁ, তাই আমি বলতে চাই। তার কারণ এ যুগে মা-বাপরাও সৎশিক্ষা পায় না, সন্তানদের জীবনে তারই প্রায়শ্চিত্ত। পথ হয়ত আছে, কিন্তু খুঁজে

পেলুম না, এই হোলো ট্র্যাজেডি। —অশোক নিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলো।

রেণুর মনে মনে মীমাংসা হোলো না। বললে, তবে কি আমরা কেবল মা-বাপের ওপর দোষ চাপিয়ে দুঃখের বোঝা টেনে চলবো, দাদা?

শিক্ষাগুরু উত্তর দিলেন, দোষ চাপানোর কথা নয়, কথা দুর্ভাগ্যের। এক যুগে বিপ্লব ঘটে, পরের যুগে তার ফললাভ। দুর্ভাগ্যের কথা এই, আমাদের কালেই চেতনা এলো। আগের যুগের লোকেরা পথ দেখিয়ে যায়নি।—বলতে বলতে অশোক উঠে বসলো।

রেণু তাকালো দাদার মুখের দিকে।

অশোক বললে, বলতে পারিস, আমরা দুজনে কি আমাদের জীবনে কোনো অপরাধ করেছি?

কম্পিত কণ্ঠে রেণু বললে, না। কিন্তু তুমি অমন করে তাকিয়ো না দাদা, আমার ভয় করে।

অশোক উঠে ঘরে পায়চারি করতে লাগলো। বিড় বিড় ক'রে বললে, দুদিন তুই রাঁধিসনি আমি জানি। জানি তুই কেমন ক'রে আমাকে ভাত দিচ্ছিস। এও জানি, তুই নিজে আজ কি খেয়ে রয়েছিস।

রেণু বললে, তুমি চুপ করো দাদা, নৈলে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে যাবো।

অশোক চুপ ক'রে গেল। রেণু বললে, যখন অন্য আলোচনা চলছে তখন খাবার কথা পাড়া অসভ্যতা। ব'সে ব'সে বাপ-ঠাকুরদাদার দোষ দিচ্ছ, কিন্তু তুমি নিজে যে লেখাপড়া শিখলে তা'র কি ফল পেলে?

অশোককে আবার উত্তর দিতে হোলো। বললে, লেখাপড়া শিখেছি বাবার জামার পকেটে থেকে। তিনি জানতে দেননি যে তাঁর মৃত্যু হবে একদিন; আমি জানতে পারিনি যে আমার কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে।

তাহ'লে তুমি কি শিখলে?

কিছুই ত শিখিনি। বরং এইবার শিক্ষার হাতেখড়ি।

রেণু চুপ ক'রে গেল।

আলোটায় তেল ছিল না, দেখতে দেখতে একসময়ে মলিন হয়ে নিবে গেল। দরজাটা খোলা, তারই ধারে বিছানাটা টেনে নিয়ে অশোক এক

সময়ে শুয়ে পড়লো। এপাশে রইলো রেণু। পোড়া কেরোসিন প্রদীপের দুর্গন্ধে ভরা অন্ধকার ঘরের অদৃশ্য বোবা দেওয়ালগুলির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে তার সহস্র প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে লাগলো।

বীমা কোম্পানীর কলিকাতা শাখা আপিসে অশোককে আসতে হোলো। প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল, টাকা তোলবার সম্পূর্ণ অধিকার পেতে এখনো কিছু দেরি। তা'ছাড়া স্বর্গত মৃত্যুঞ্জয়ের কোষ্ঠি ও জন্ম-সালের সঙ্গে পলিসির একটা পার্থক্য ঘটেছে, সেটা নিয়ে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। বয়সের বিচারেই প্রিমিয়মের পরিমাণ ধার্য হয়ে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে একটা গরমিল চ'লে আসছে।

অশোক বললে, আগে থেকে আপনারা এ সব ভুল শুধরে নেননি কেন?

ভুল উভয়ের, সুতরাং এ আলোচনায় লাভ নেই। টাকা মারা যাবে না, তবে কিছু দেরি হ'তে পারে।

অশোক হাসবার চেষ্টা করে বললে, মারা গেলে নিশ্চিন্ত হতুম, কিন্তু অস্বস্তিকর আশা বড় পীড়াদায়ক। আচ্ছা,—নমস্কার।

অশোক পিছন ফিরলো। প্রধান কর্মচারী তার আপাদ-মস্তক পরিচ্ছদের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন।

রেণুর প্রস্তাব শুনে অশোক খান দশেক দরখাস্ত পাঠিয়েছিল নানা আপিসে। তাদের ভিতর একখানার মাত্র জবাব এসেছে, চাকুরি খালি নেই। তবু, পথে বেরিয়ে ঘরে ফিরে যেতে কেমন আতঙ্ক হয়, ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নামবার সময় বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করে। আজকে যে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগছে, তা নয়,—কিন্তু দৈবাৎ যদি কিছু ঘটে। দৈবাৎ সে যদি ভাগ্যের সাক্ষাৎ পায়; হঠাৎ পিছন থেকে কোনো হৃদয়বান লোক যদি এসে তা'কে মোটরে তুলে নিয়ে যায়,—এমনি একটা কোনো কল্পনা। পথে নাকি অনেকে কুড়িয়ে পায় সোনার মোহর, টাকার নোট, কিম্বা একটা মণিব্যাগ।

এমন ত সত্যিই ঘটতে পারে, সে কারো নজরে প'ড়ে গেল! চেহারাটা তার ভালো, স্বাস্থ্যও ভালো,—সে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বালক ধ্রুব একদিন মধুসূদনের দেখা পেয়েছিল, হর-পার্বতী একদিন এক

ব্রাহ্মণের পথের পাশে মোহরের থলী ফেলে দিয়েছিলেন—অন্যমনস্ক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই থলি দেখতে না পেয়ে চ'লে গিয়েছিল। এই ত একালেও শোনা যায়, কোন্ ভাগ্যবান গৃহশিক্ষক জমিদার পত্নীর সুনজরে প'ড়ে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে উঠলো। অমুক মহারাজার কৃপায় কোন্ দরিদ্রের ভাগ্য ফিরে গেছে। অমুক ব্যবসায়ীর দপ্তরে শিক্ষানবিশি করতে করতে অমুক ব্যক্তি পেয়ে গেল এক মস্ত সুযোগ। কেউ জুয়া খেলে লাখ টাকা, কেউ লটারীতে লক্ষীলাভ। এই যে ভারতীয় ইহুদী—মাড়োয়ারী, এরা ছাতু খেয়ে গামছা বিক্রি করতে এলো, ছাতু খেয়ে হোলো ক্রোড়পতি। এই যে কুলি, এরা অবাধে উপার্জন করে। আর মধ্যবিত্ত যারা, তারা খোঁজে চাকৃরি। চাকৃরি না পেয়ে তারা কাঁদে, অশোকের মতো দৈবাৎ সৌভাগ্যের সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।

কিন্তু যে কোনো কাজ জুটলেই সে যে খুশী হবে, এমন কথা কে বললে? হোটেলের বয় হ'তে তার বাধে, মাড়োয়ারীর কাপড়ের দোকানে খাতা লিখতে সে রাজি নয়, ট্রামের কন্‌ডাকৃটরি সে পারবে না, আপিসের চাপরাশি হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। সে এইভাবে লেখাপড়া শিখেছে যাতে সে যে কোনো আপিসের ভদ্র কেরানি হতে পারে। কেরানি হ'তে সে চায় না—কিন্তু এই তার বংশানুক্রমিক, এই তার সংস্কার,—যাকে ব'লে ঐতিহ্য। মধ্যবিত্ত বাঙালীর একমাত্র পরিচয় হোলো ছোট অথবা বড় কেরানি, তার কারণ কেরানির প্রকৃত ব্যাখ্যাই হোলো মধ্যবিত্ত বাঙালী। বাঙালী ব্যবসায়ী একথা শুনলে হাসি পায়; বাঙালীর স্বাধীন জীবিকা, এটা রসিকতা মাত্র। ভদ্র বাঙালী কেরানি-গিরি করে—ব্যস, নিশ্চিন্ত। আগুনে পুড়বে না, জলে ডুববে না, হারাবে না, পালাবে না,—অব্যয়, অক্ষয়। পাস করলেই চাকৃরি, চাকৃরি পেলেই বিয়ে, বিয়ে হলেই ছারপোকার মতো দলে দলে কেরানির জন্ম। কেরানি গাড়ী চাপা যায় না, জলে ডোবে না, যুদ্ধে মরে না,—দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, মহা-মারীতে, ভূমিকম্পে কেরানির বিনাশ নেই। অত্যন্ত সতর্ক, সচকিত, সচল ও সরল। একবার কোনো মতে কেরানি হ'তে পারলেই জীবন ও মরণের সমস্ত প্রকার সমস্যার সমাধান। পৃথিবীতে কোথাও অসন্তোষ নেই, পরিবারে কোথাও অশান্তি নেই!

দিন আষ্টেক ধ'রে কল্‌কাতা শহরটাকে লোফালুফি ক'রে অশোক আবার

বাসায় ফিরে এসে বসলো। যেন সে একটা মরুভূমি পেরিয়ে এসেছে, যেন প্রাণের দিগন্তব্যাপী তৃষ্ণা আর রুক্ষতা তার মুখে চোখে লেখা। এবার অন্তত দিন দুই নিদ্রা, গভীর নিদ্রা। বিগত আটটা দিনের মর্মান্তিক নিরাশা যেন সে ভুলতে পারে; যেন পথে পথে আহরণ করা অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস আর নিজের চিত্তক্ষোভ সে ঘুমের মধ্যে ভুলে যেতে পারে।

খেতে ব'সে সেদিন সবিস্ময়ে সে বললে, তুই কি আজকাল ভেল্‌কি দেখাচ্ছিস নাকি, রেণু ?

রেণু হাসিমুখে বললে, কেন, দাদা ?

ভাতের থালার দিকে চেয়ে অশোক বললে, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ জ্বাললি কেমন ক'রে ? এ যে একেবারে রাজসিক আহারের তালিকা রে ?

রেণু বললে, ছ মাস যে আধপেটা খেয়ে আছো, মনে নেই ?

খুব মনে আছে। কিন্তু আমি ভাবছি এটা ভোজ, না ভোজবাজী ? ভাজা, ঘণ্ট, ডাল, চচ্চড়ি, মাছের ঝোল,—মাছ পেলি কোথায় তুই ?

রেণু রাগ ক'রে বললে, মাছ ছিল পুকুরে, সেখান থেকে বাজারে, বাজার থেকে এঘরে। এবার শুনলে ত ?

অশোক বললে, শুনলুম, কিন্তু বুঝতে পারলুম না। এসব রাঁধলি কখন বল্ ত ?

অত জবাবদিহি করতে পারিনে, আগে খেয়ে নাও দেখি ?

বটে। রাতারাতি এ দেখছি একদম ভানুমতির খেল্। আলোটা বোধ হয় নেববার আগে একবার দপ ক'রে জ্বলে উঠেছে, না রে ?

রেণু বললে, দাদা, তুমি দেখছি একেবারেই গোল্লায় গেছ। একটু ভালো খাওয়া দেখলে কি আজকাল তোমার এই অবস্থা ঘটে ?

অশোক কি যেন উত্তর দেবে, এমন সময় বাইরে কা'র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রেণু গলা বাড়িয়ে বললে, এই যে আমি এখানে, ক্যান্তর মা।

বছর খানেকের একটি ছেলে কোলে নিয়ে একটি স্ত্রীলোক দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। রেণু বললে, বাবুলকে আনলে যে আবার ?

আর বোলোনা দিদিমণি, কি চেনাই চিনেছে তোমাকে এই পাঁচ ছ'দিনে। বৌদিদির কাছে থাকতেই চায় না।

রেণু হাসি মুখে উঠে বাবুলকে কোলে নিল। ছেলেটা হাসি মুখে ঝাঁপিয়ে এলো তার বুকে।

ক্ষ্যান্তর মা বললে, আমি এখন চললুম দিদিমণি, ঠিকের কাজ কিনা, এখনো দু'জায়গায়। তারপর গলা নামিয়ে বললে, মা বাপের অল্প বয়স হ'লে ছেলে-পুলের আদর কম, নিজেরাই এখন নিজেদের নিয়ে মেতে থাকে, বুঝলেনা ?

ক্ষ্যান্তর মা চ'লে গেল।

খেতে খেতে অশোক বললে, কাদের ছেলে রে ?

রেণু বললে, এই ত পাশের বাড়ীর। আমাদেরই এক পাঁচিলে। বৌটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে দিন পনেরো। ছেলেটা আমাকে খুব চিনেছে, দাদা। এ-কদিন তুমি বেরিয়ে গেলেই আমার কাছে দিয়ে যায়, সারাদিন থাকে।

কিন্তু পরের ছেলেকে সারাদিন রাখতে তোর ভালো লাগে ?

রেণু চুপ ক'রে একবার দাদার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলো, কিন্তু তখনই আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, তাড়াতাড়ি তুমি খেয়ে নাও দেখি ?

অশোক বললে, তা নিচ্ছি, কিন্তু সারাদিন কচি ছেলেকে নিয়ে কাটালে তোর পড়াশুনো হবে ?

রেণু বললে, তুমি যদি বারণ করো তাহলে নেবোনা।

বারণ আমি কেন করব রে ? তুই একলা থাকিস, বরং এ একটা সঙ্গী মন্দ নয়। আমি কেবল তোকে ভেবে দেখতে বলছিলুম।

এই ব'লে অশোক পরমানন্দে পুনরায় ভোজনে মন দিল। খেয়ে দেয়ে উঠে যাবার সময় হঠাৎ রেণুর হাতখানার দিকে অশোকের চোখ পড়লো। বললে, তোর হাতের রুলিটা কোথায় গেল ?

রেণু বললে, তুলে রেখেছি।

মিছে কথা।

মিছে কথা আবার কি ? একলা থাকি সারাদিন, হাতে সোনার জিনিস থাকা কি ভালো ? পেটে ভাত জোটে না যাদের, তাদের গয়না পরা কেন ?

উত্তেজিত হয়ে অশোক বললে, তোর ভূয়োদর্শন আমি শুনতে চাইনে। মাত্র চার আনার সোনা দিয়ে লোহার রুলি বাঁধানো ছিল। দুমাসে দুগাছাই তুই বিক্রি করেছিস। সত্যি না ?

বাবুলকে কোলে নিয়ে রেণু ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তারপর বললে, এসব প্রশ্ন করছ কোন্ মুখে, দাদা? বাইরের টাকা ঘরে আনো, তাহলেই সব কথার জবাব পাবে।

বিশ্রাম নেওয়া অশোকের হোলো না। হাত ধুয়ে ফিরে এসে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে সে ব'সে রইল। তারপর ময়লা জামাটা গায়ে চড়িয়ে সে বেরিয়ে গেল।

ছোট ছেলের আদর যত্ন নেবার অভ্যাস রেণুর ছিল না। আত্মীয় পরিজনের সংখ্যা তাদের কম, যারা আছে তারা কেউ কারো খবর নেয় না। মা গেছেন মারা, তার বয়স তখন সাত, দাদার এগারো। আশে পাশে, নিকটে দূরে তাদের শিশু কোথাও জন্মায়নি। শিশু তা'র কাছে অভিনব, অনেকটা যেন বিস্ময়ের বস্তু, অনেকটা যেন নতুন ক'রে দেখা, নতুন ক'রে জানা। বাবুলকে প্রথমে সে নিয়েছিল অনভ্যস্ত নতুনত্বের মোহে। তার আস্বাদটা যেন কেমন ঘন, সুখের যন্ত্রণায় যেন অস্বস্তিকর। কোলে না নিলে দুই হাতে যেন চাঞ্চল্য আসে, কোলে টেনে নিলে কেমন যেন আনন্দময় বিরক্তি।

বাড়ীর গিন্নি এক আধবার উপরে এসে রেণুদের উড়নচুড়ে ঘরকন্না দেখে গেছেন। চারিটী টাকা তিনি নিয়মিত ঘর ভাড়া পান, এরপরে ভাড়াটেদের সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্য কম। তাঁর দুই পায়ে বাত, ওপর নীচে করা তাঁর সাধ্যে কুলোয় না। কিন্তু কদিন থেকে তিনি শিশুর কলকণ্ঠ শুনছিলেন। আজ তিনি একবার উপরে উঠে এলেন,—বাতের ব্যথা তাঁর কিছু কম ছিল।

দরজার কাছে এসেই তিনি বসে পড়লেন। বললেন, পারিনে বাছা, ওপর নীচে করলেই বুকে হাঁপ ধরে। ওমা, নতুন বউয়ের ছেলে না দেখছি? পাশের বাড়ীর ত?

রেণু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

ঘুমিয়েছে, শুইয়ে দাও না মা? তোমাকে মেয়ে বলে ডাকি, নামটি তোমার কি মা?

রেণু।

দাও, শুইয়ে দাও। পাঁচ সাত দিন ধ'রে দেখছি, ক্যান্তর মা ওকে আনে এবাড়ীতে। তোমার কাছে বুঝি থাকে ভালো?

রেণু বললে, এই ত দেখছেন, আমার কাছে এলেই হাসিখুশি থাকে।

গিন্নি বললেন, বেশ বেশ, ওদেরো ভালো, তোমারো ভালো। ওর বাপের ভারি দয়ার শরীর; আজ চাঁদা দিচ্ছে, কাল বারোয়ারি দিচ্ছে, লোককে ধার দিয়ে ফেরৎ নেয় না,—খুবই সুনাম। হবে না কেন মা, মোটা চাকরি যে। আর খেতে পরতে ত ওই দুজন,—স্বামী আর স্ত্রী। বুড়ী ঠাকুমা আছে, কিন্তু তার গঙ্গাবাগে পাছতলা। অম্বলশূলের রুগী, বয়স আশী—দিন গুনছে ব'সে ব'সে। তা বেশ, বেশ। কত দেয় ওরা গা?

রেণু চমকে উঠলো। উত্তর দিতে গিয়ে সে থতিয়ে গেল।

গিন্নি বললেন, তা কি হয় বাছা আজকালকার দিনে? ছেলেটা ত সারা দিনই রয়েছে তোমার কাছে, পরিশ্রম কি তোমার কম হয় মা? কিছুই কি দেয় না?

আনত অপমানিত মুখে রেণু বললে, দেয়।

কত শুনি? যদি নিতান্ত কম দেয়, আমি বলে ক'য়ে না হয় এক আধ টাকা আরো—

উদ্বেগে অধীর হয়ে রেণু বললে, বলতে আপনার কিছু হবে না, আমাকে তিন টাকা ক'রে দেবেন বলেছিলেন। সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

বেশ বেশ—ওমা, তোমার ঘরের এমন চেহারা কেন, রেণু? জিনিষ পত্র হাঁড়িকুঁড়ি, বাক্স প্যাঁটরা এসব কোথায়?—গিন্নি যেন একটু বিস্মিত হলেন।

রেণু বললে, আমরা ত বিশেষ কিছু আনিনি সঙ্গে?

গিন্নি নির্বাক বড় বড় চোখে একবার তার দিকে তাকালেন। দেখলেন আপাদমস্তক, দেখলেন সমস্ত ভঙ্গীটা। গোয়েন্দা বিভাগের লোক পলাতক সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তার করে যেমন ধারালো চক্ষে নিরীক্ষণ করে, সেইভাবে দেখতে দেখতে একসময় তিনি বললেন, ক'দ্দিন হোলো?

সরল আয়ত দুই চক্ষে রেণু তার দিকে তাকালো। দুই আঁখিপল্লবে তার

নিষ্কলুষ কৌমার্যের সলজ্জ জড়তা। কুঞ্চনরেখাহীন মসৃণ মুখখানি আরক্তিম তারুণ্যে টসটসে। গিন্নীর প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে সে বললে, কি বলছেন?

বলি কদ্দিন বেরিয়েছো ছুজনে?—মহিলার ভ্রূভঙ্গী যেন কোন্ এক অর্থে ভরা।

ছুজনে? ও, তা এই আট ন'মাস হোলো বৈকি।—রেণু বললে, কিন্তু দেখছেন ত অবস্থা, দাদার একটা কাজকর্ম না জুটলে আর কোনো উপায় নেই।

গিন্নি সবিস্ময়ে হাসিমুখে বললেন, ওমা, ও কি কথার ছিরি? ওকথা কি বলতে আছে?

রেণু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাঁর মুখের দিকে তাকালো।

গিন্নি ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বললেন, হিন্দুর ঘর, দাদা ব'লে ডাকা আবার কি গো?

কি বলছেন আপনি?—ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে রেণু বললে, সহোদর বড় ভাই, তাঁকে দাদা বলবো না?

সহসা আঘাত খেয়ে গিন্নি যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এরপর কী যে তিনি বলবেন, কি ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা তিনি অনুধাবন করবেন, তার কূল-কিনারা পেলেন না। হঠাৎ তিনি আবার ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন ধরলেন, তোমাদের মা বাপ কোথায় বাছা?

বাবুলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রেণু বললে, মা বাবা মারা গেছেন।

তোমাদের আর কেউ নেই?

আজ্ঞে না।

ও: তাই জন্তেই!—আচ্ছা মা, উঠি আজকের মতন—ব'লে গিন্নি মাটিতে ছুই হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভাঙা বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিজের মনেই বললেন, সহোদর বড় ভাই। তা হবে,—আমি মনে করি বুঝি······রাম বলো, ছুর্গা, ছুর্গা—

অপরাহ্ণে ঠিকা কাজ ক'রে যাবার সময় ক্যান্তর মা আবার এসে হাজির হোলো। দেখলো, বাবুল খেলনা নিয়ে ব'সে রয়েছে পাশে, দিদিমণি পড়াশুনোয় মশগুল।

ছেলেটাকে নিয়ে যেতে এলুম, দিদিমণি। মা গো, কী পড়াশুনো তোমার গা? দাদা বুঝি হাকিমি জুটিয়ে দেবে?—ক্ষ্যান্তর মা এসে ঝুপ ক'রে দরজার ধারে ব'সে পড়লো।

মুখ তুলে রেণু বললে, তোমাকে ক'বাড়ীতে কাজ করতে হয়, ক্ষ্যান্তর মা?

সে কথা আর বোলো না দিদিমণি, খাটুনি সেই সকাল থেকে আরম্ভ। তিন খানা ক'রে রোজ পোড়া মাজা। চার বাড়ী মিলিয়ে মাসে পনেরো টাকা হয়।

ওতে তোমার চলে?

ক্ষ্যান্তর মা বললে, না চললে করব কি, দিদিমণি? একটা কাজ আরো পেতে পারি, কিন্তু শরীরে কুলোয় না। মেয়েটা বড় হোলো, বিয়ে না দিলে আর চলে না।

রেণু বললে, মেয়ের বাবা কোথায়?

সন্নিসি হয়ে চলে গেছে, দিদিমণি।

রেণু চুপ ক'রে গেল। মানুষের বেদনার স্থান হয়ত সে স্পর্শ ক'রে ফেলেছে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ক্ষ্যান্তর মা বললে, সকাল সন্ধ্যা তুমি লেখাপড়া ক'রো, দিদিমণি, কিন্তু এ বেলায় ত তুমি একটু আধটু অন্য কাজও করতে পারো?

মুখ ফিরিয়ে রেণু বললে, কি বলো ত, ক্ষ্যান্তর মা?

ক্ষ্যান্তর মা বললে, ওবাড়ীর দাদা-বৌদিদি দুজনেই বলছিলেন। ধরো, সেলাইয়ের কল একটা পেলে তুমি ত পাড়ার মেয়েদের জামা, সেমিজ, ফরক্—এসব তৈরী করতে পারো? কিছু কিছু আসবেও বটে।

রেণু বললে, আমি ত ওসব শিখিনি, ক্ষ্যান্তর মা?

গলা নামিয়ে ক্ষ্যান্তর মা বললে, শিখতে কতক্ষণ? পড়া-শুনোয় কী লাভ দিদিমণি? হাতের কাজেই ত পয়সা।

কিন্তু সেলাইয়ের কল পাবো কোথায়? শেখবার জন্যেই বা আমায় দেবে কে?

তা যদি তুমি বলো, সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো। দাদাবাবু কী যে দয়ালু, তা তোমায় বলতে পারবো না। পুজোর সময় পাঁচটি ক'রে টাকা, দুখানা কাপড়, একমণ চাল—এই হোলো আমার বাঁধা বক্শিস।

অপ্রার্থিত দানের অস্বস্তিকর অনুভূতি স্মরণ করে রেণু বললে, থাক্ ক্যান্তর মা,—ছেলেটিকে রাখার জন্য ওঁরা তিন টাকা ক'রে দেবেন, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এর পর কিছু দেখলে আমার দাদা রাগ করবেন। ওতে কাজ নেই।

ক্যান্তর মা বিমর্ষভাবে বললে, এত অভাবের মধ্যে আছো, দিদিমণি, তাই বলছিলুম। ভদ্দল্লোকের মেয়েদেরই ত আজকাল বেশি দুঃখ কষ্ট দিদিমণি ?— আচ্ছা দাও ছেলেটাকে, আমি যাই। বেলা গেল।

বাবুল জেগে উঠেছিল। রেণু তাকে তুলে এনে তার হাতে দিল। যাবার সময় ক্যান্তর মা ব'লে গেল, কথাটা ভেবে দেখো, দিদিমণি। তোমার ভালোর জন্যেই বলছিলুম।

ভাববার কিছু নেই, কারণ এটা যে তার পক্ষে কল্যাণজনক, এটুকু বুঝবার শক্তি তার আছে। লেখাপড়ার পরে বিদ্যা আছে, কিন্তু বিত্তের সম্ভাবনা কম। তার এই জীবন, নিত্য দারিদ্র্যে যা অবনত—এই জীবনের চেহারা সে জানে। তার দেবপ্রতিম সহোদর, হতাশায় আর উপবাসে জর্জর—দেখছে সে অহরহ। বাঁচাটা তার পক্ষে লজ্জা, বাঁচাটা গুরুভার—বাঙালী মেয়ে পৃথিবীর নারীসমাজের অভিশাপ, এও ত সে অনুভব করছে দিনের পর দিন। যন্ত্রণা জমছে তার স্নায়ুতন্ত্রে, অসন্তোষের বারুদ জমছে তার মস্তিষ্কে—কিন্তু সে বাঙালীর মেয়ে। সে শান্ত, সে নির্বিকার, সে নিরীহ। তা'র ব্যক্তিত্ব নেই, তা'র স্বাতন্ত্র্য নেই,—তা'র বড় জীবনের পিপাসা নেই। অপরের অন্ন আর আশ্রয়, অপরের করুণা আর ইচ্ছায় না বাঁচলে তা'র অস্তিত্ব স্বীকৃত হবেনা। নিতান্ত নগণ্য বাঙালীর মেয়ে সে।

আধঘণ্টা খানেক পরে ক্যান্তর মা আবার ফিরে এলো। দরজায় হেলান দিয়ে রেণু তখন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাছে এসে ক্যান্তর মা বললে, দিদিমণি, আবার বলতে এলুম তোমাকে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। আমি তোমাকে কাজ এনে দেবো পাড়ার লোকের। মোটামুটি শিখতে পারলেই দেখবে কাঁচা পয়সা।

রেণু কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সহসা ক্যান্তর মা এদিক ওদিক তাকিয়ে রেণুর হাতখানা টেনে চারটি টাকা গুঁজে দিয়ে বললে, এ মাসের বাড়ীভাড়াটা

দিয়ো, দিদিমণি। না, না—আপত্তি শুনবোনা। লোকের দয়া মায়া অমন ক'রে ফিরিয়ে দিতে নেই। মানুষ কখনো মানুষের পর নয়।

ক্ষ্যান্তর মা যেমন এসেছিল, তেমনি আবার ঝড়ের মতোই চ'লে গেল। আগষ্ট হাতখানায় চার খণ্ড আগুনের আঙরা নিয়ে পাষাণ প্রতিমার মতো রেণু দাঁড়িয়ে রইলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন আসন্ন হয়ে এসেছে।

তিন

মাস চারেক পরে আবার এই কাহিনীর সূত্র ধরা গেল।

ইন্‌স্যুয়রেন্সের টাকা এখনো পাওয়া যায়নি, তবে ইতিমধ্যে দুজায়গায় অশোক কাজ পেয়েছিল। কোনো এক ডাক্তারখানায় সে কাজ পেলে অনেক উমেদারির পর, কিন্তু প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ার ফলে মাসখানেকের মধ্যেই সে কাজে ইস্তফা দিতে হোলো। গোটা বারো টাকা সেখানে পাওয়া গেছে। এর পরে হঠাৎ তার আর একটা কাজ জুটে গেল এক বইয়ের দোকানে, কিন্তু একদিন সে নির্ভুল হিসাব বুঝিয়ে দিতে না পারায় মালিকের মনে কি যেন একটা সন্দেহের সঞ্চার হোলো,—ফলে, একটা অপবাদ সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো। সেখানে পাঁচটা টাকা মাত্র পাওয়া গেছে।

কিন্তু তারপরে প্রায় দুমাস হ'তে চললো সে নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় থাকলেও নিতান্ত উপবাস ঘটেনি। রেণুর হিসাব-বুদ্ধি প্রখর, এই কয়মাস মোটামুটি সে চালিয়ে দিয়েছে। কোনোদিন একটু ভালো খাওয়া, কোনোদিন কিছু মিষ্টান্ন, কোনোদিন সামান্য ফলমূল, কোনোদিন বা এটা ওটা। রেণু পুরুষ মানুষের জিহ্বার স্বাদ-বৈচিত্র্য বোঝে। এত অভাব আর অভিযোগের মধ্যেও খাদ্য-আয়োজনে সে নিপুণ নতুনত্ব প্রকাশ করেছে। রেণুর ভালো ঘরে বিয়ে হ'লে ভালো রকমের গৃহিণী হ'তে পারতো।

মাঝখানে কয়েকজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে অশোকের দেখা হয়েছিল। তারা কেউ জীবিকার সন্ধান পেয়েছে, কেউ এখনো অন্বেষণে। দু চারজন মুরুব্বি ধ'রে সুবিধে ক'রে নিয়েছে। অশোকের না আছে চলনসই মামা, না আছে

সব-জজ পিসেমশাই, না বা বড়বাবু খুড়শ্বশুর। অন্তত একটা দিলদরিয়া ভগ্নীপতি থাকলেও তার সুবিধে হয়ে যেতো। সুতরাং চাকরি খোঁজা স্থগিত রেখে ভগ্নীপতি খুঁজে বেড়ালে রেণুর বিয়েটাও এতদিন হয়ে যেতো এবং ওই সঙ্গে কোনো একটা যেমন তেমন চাকরি।

বন্ধুরা কেউ কেউ বললে, এখন থেকেই কেরানিগিরি? কি করবি তিরিশ টাকায়? বরং কেরানিগিরিতে উন্নতি করার চেয়ে নেতা হওয়া সহজ। আয়, রাজনীতিতে ভিড়ে যাই। মনে আছে ত, ভারত আমাদের পরাধীন?

অশোক বলেছিল, আমার একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত ভারত পরাধীন থাকলে ক্ষতি মনে করব না। আর নেতা? যার গাড়ী নেই, বাড়ী নেই, ব্যাঙ্কে টাকা নেই, খবরের কাগজে শেয়ার নেই, সে হবে নেতা? গরীবের দেশে কোনো গরীব লোক নেতা হ'তে পারে? এমন একজন বড় নেতাও দেখাতে পারিস, যে আমার মতন গরীব? গরীব নেতা, তার যত বড় প্রতিভাই থাকুক, এদেশে কল্কে পায় না।

অশোক তীর বেগে চ'লে গেল।

কলেজের ছাত্র থাকতে একবার দলে ভিড়ে সে এক রাজনীতিক শোভা-যাত্রার সঙ্গে বেরিয়েছিল। হাতে ছিল ঝাণ্ডা। দুপুরের রোদ, শীতের মধুর হাওয়া, এক পকেটে কমলা লেবু, অন্য পকেটে চানাচুর, কলেজ পালিয়ে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়া কী আনন্দ! পথের দুধারের বারান্দায় পুরনারীদের লাজবর্ষণ, উৎসুক কৌতূহল,—সে কী কৌতুক! রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেল, ট্রামবাস থেমে গেল, পাহারাওয়ালা আর সার্জেণ্ট চললো পিছু পিছু,—ভারত উদ্ধারের অত বড় আয়োজন আর কবে হয়েছিল? পথে পথে 'বন্দে মাতরম্', পদে পদে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', —সেই সম্মিলিত চীৎকারে শীতের মধুর রৌদ্রে আর স্বচ্ছন্দচারী ছাত্রদের পায়ে পায়ে কী উত্তেজনা! সেই সব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষরা ছাড়া দেশের আর সবাইকে মনে হয়েছিল দেশের শত্রু। সেদিনকার মিছিলে যোগ দেওয়াই ছিল স্বাধীনতার একমাত্র পথ।

কিন্তু তারপর? চানাচুর আর কমলালেবু ফুরিয়ে গেল। জলকলের

মাঠে ঢুকে ঝাণ্ডাটা একপাশে ফেলে রাখা, আর রঙিন পতাকা কোমরে বেঁধে একদিকে হাঁটা দেওয়া। মন্ত্রবলে শোভাযাত্রা ফিকে হয়ে এলো। কেউ ভবানীপুর, কেউ শিবপুর, কেউ টালা, আর কেউ বা টালিগঞ্জ। কয়েকটি ছাত্রী ছিল শোভাযাত্রার সম্মুখ সীমান্তে—অবশেষে তাদের স্ব স্ব ঠিকানায় পৌঁছে দেবার জন্য উৎসাহী ছাত্রদের মধ্যে কী প্রতিযোগিতা, আর হুড়োহুড়ি। পুরুষের স্বভাবদৈন্যের সঙ্গে খেলা ক'রে ছাত্রীদের কী আমোদ সেদিন। সেই যে শোভাযাত্রা তাতে আর সন্দেহ নেই, কারণ পুরোভাগে ছিল তরুণী নারীর শোভা।

কিন্তু এ সমস্তই সম্ভব হয়েছিল সেদিন, কারণ, পিতা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য সেদিন বেঁচেছিলেন। যত অসুবিধার ভিতর থেকেই হোক, কলেজের মাইনেটা জুটতো নিয়মিত, অন্ন সমস্যার ভাবনা ছিল না। লাল ঝাণ্ডায় সেদিন আবিষ্কার করা যেতো রক্ত-গোলাপের মোহ, আর স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে পাওয়া যেতো সুখ স্বর্গের রোমাঞ্চ। সেদিন গায়ের পাঞ্জাবীটা ছিল ধোপদস্ত, ধুতিখানা ছিল আন্‌কোরা, পায়ের জুতোটা থাকতো চকচকে, আর কাঁচা দাড়িগোঁফ কামানো মুখের জন্য একখানা সাবানও পাওয়া যেতো। কারণ, মৃত্যুঞ্জয় ভট্‌চাযি বেঁচে ছিলেন সেদিন।

তারপর দেখা গেল সমস্তটাই প্রপঞ্চময় মায়া। তার পরেও শোভাযাত্রা অনেকবার বেরিয়েছে, কিন্তু সেদিনকার সেই তরুণ-তরুণী, সেই সব শোভা-যাত্রীরা কোথায় গেল তাদের ঠিকানা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতমাতা লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, কোনো ছেলে গেল বিলাতে, কেউ রইল ভারতে ছোট বড় চাকরির আশায়, কেউ বা কিছু বাণিজ্যিক দুরাশায়। আর মেয়েরা? এত দুঃখেও ভারতমাতা খুশী হয়ে হাসলেন, মেয়েরা প্রায় সবাই গেল শ্বশুরবাড়ী; আর বিশেষ কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রতিবাদ অথবা অসন্তোষ আর তাদের তেমন নেই, বয়সের উচ্ছ্বাস গেছে ক'মে। তরুণদলের নেতা যাঁরা সেদিন ছিলেন, তাঁরা অধুনা বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যস্ত, বোধ করি সংগঠন অথবা পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় অর্থকরী মোটা চাকুরিতে মশগুল,—তবে হ্যাঁ, ভারত স্বাধীন হ'লে তাঁরা অবশ্য খুশীই হবেন।

বউবাজারের মোড়ে সেদিন আরো কয়েকটি প্রাচীন বেকারের সঙ্গে দেখা

সাক্ষাৎ। অশোক পাশ কাটাতে পারলো না, বেকার-তীর্থসঙ্গম বউবাজারেই সে ধরা প'ড়ে গেল। সর্বপ্রথম প্রশ্ন, কি করছিস আজকাল? উত্তরটাও সেই আদি ও অকৃত্রিম, বিশেষ কিছু না। তারপর দুপুরবেলা চায়ের দোকানে ঢোকা গেল। অতঃপর যথারীতি কেউ বলে সিনেমা 'স্টারের' গল্প, কেউ পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ করে, কেউ উচ্ছে ভেজে বলে, পটোল; কেউ বা চাল ভাজার ওপর আভিজাত্যের রং বুলিয়ে বলে, মুড়ি। কারো বিলাত না যেতে পারার বিক্ষোভ, কারো বিয়ের কথা চলছে ঠাকুমার শেষ বয়সের ইচ্ছানুযায়ী, কারো কবি হবার সখ, কেউ বা হ'তে চায় কম্রেড। ওদের মধ্যে একজনের একটু আলাপ হয়েছে পাড়ার নীলিমার সঙ্গে, একজনের ইচ্ছা হয়েছে সিনেমায় ঢোকার, একজনের বাসনা জীবনের নানা প্রকার অভিজ্ঞতা আহরণ করার, একজন বা আশা করে ধনী লোকের কন্যার সঙ্গে বিয়ে। অবশেষে ওদেরই মধ্যে একজন ব'লে বসলো, চলো হে, সবাই মিলে গ্রামে ফিরে যাওয়া যাক্।

গ্রাম!

অশোক চমকে উঠলো। গ্রাম কোথায়? গ্রাম কী পদার্থ? তাদের কোনো গ্রাম নেই, কোনো দেশ নেই, ধানের ক্ষেত কখনো সে পায়ে মাড়ায়নি, কখনো সে নিশ্বাস নেয়নি গাছপালার গন্ধে, কুয়া-পুষ্করিণীর জলের স্বাদ সে জানে না। শহরের সে কীটানুকীট, সে কেবল চ'রে বেড়ায় ধুলোয়, নিরাশায়, সংশয়ে। পাথরের পর পাথর, প্রাসাদের পর প্রাসাদ, প্রতারণার পর প্রবঞ্চনা—এই তার নিত্য দর্শন। এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ কেবল মরুভূমির বালুকণা। এখানকার আকাশে স্নেহ নেই, বাতাসে আয়ু নেই, মৃত্তিকায় প্রাণ নেই। পাথরে প্রতিফলিত মধ্যাহ্ন সূর্যের জলজ্বালার মতো ক্ষুধিত-তৃষিত মানুষের নিষ্ফল বাসনাও এখানে হা হা ক'রে জ্বলছে। শত শত অজগর সরীসৃপের মতো হিংস্র পথ শাখা-প্রশাখায় চারিদিকে প্রসারিত; বঞ্চিতের চিত্তগ্লানির নিশ্বাসে আর ধনাঢ্যের লোল-লালসার লালায় সেই পথ কলঙ্কিত। যেন জীবন ও মৃত্যুর উদ্‌ভ্রান্ত জুয়াড়ীর মেলায় এখানে অবিশ্রান্ত সৌভাগ্য আর হতভাগ্যদের ছিনিমিনি চলছে। নগরের মত্ত তাণ্ডবে তাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত। কিন্তু গ্রামে ফিরে যাবে তারা কেমন ক'রে? নগরের অতিকায়া পাগলিনীর মদমত্ত উন্মাদনা তা'রা দেখে চলেছে মাতালের মতো,—তা'রা ক্লান্ত

ক্লিষ্ট, ছিন্ন মলিন তাদের বসন-ভূষণ, অধঃপতনের অপমানে তা'রা নতশির, এই ক্লিন্ন-ক্লেদাক্ত বেশ নিয়ে তা'রা কেমন ক'রে গিয়ে দাঁড়াবে মাতৃস্বরূপিনী গ্রামের মুখোমুখি ? সেখানকার করুণ মৃৎপ্রদীপজ্বলা দীন দুঃখীর কুঁড়ে ঘরে নগরের উচ্ছ্বসিত মাদক রসের জারক বস্তু নেই, আছে কেবল সরল স্নেহ, আছে বিনিদ্র সেবা, আছে কোমল আত্মীয়তা। সেখানে সান্ত্বনা আছে, উৎসাহ নেই ; অন্নপূর্ণা আছেন, ধনলক্ষ্মী নেই ; সেখানকার প্রাকৃৎ পরিবেশে নগরের নিত্য বৈচিত্র্য নেই। নগরের সংস্কার নিয়ে কোন্ মুখে ওরা গিয়ে দাঁড়াবে গ্রামে ?

মনোস্থির করতে রেণুর দেরি হয়নি। ক্ষ্যান্তর মা বুঝতে পারেনি, রেণুর স্বভাব-সরলতা ইস্পাতের কাঠামোয় মোড়া। নিজের নিরুপায় অবস্থা সম্পর্কে সে যেমন সচেতন, অপরের প্রভাবে আত্মসমর্পণও তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তা'র চেহারায় গ্রাম্য সৌকুমার্যের পরিচয়টা সুপ্রত্যক্ষ, কিন্তু চাতুরীতে অনভ্যস্ত হ'লেও বুদ্ধিতে সে উগ্র। ক্ষ্যান্তর মাকে সে জানিয়েছে, ভিক্ষা সে নেবে কারণ সে গরীব, কিন্তু অজস্র দান হাত পেতে নেওয়ার তা'র প্রয়োজন নেই, সে কাঙাল নয়। দাসীবৃত্তি বাঙালী মেয়ের পক্ষে অসাধ্য নয়, কিন্তু অহেতুক দান সে গ্রহণ করবে না, এতে দাতারও কোনো গৌরব নেই। এ নিয়ে দাদার সঙ্গে আলাপ করা সে দরকার মনে করেনি, এর ভিতরকার প্রচ্ছন্ন স্পর্ধাকে সে আলোচনার দ্বারা আমল দিতে চায়নি,—সুতরাং দাদারই নাম ক'রে সবিনয়ে সে ক্ষ্যান্তর মার প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করেছে। দারিদ্র্যের অভিমান তার কিছু ছিল বৈ কি,—যৌবনের ধারালো আত্মচেতনা এই প্রস্তাবের মধ্যে নিজেকে হীন হ'তে দেয়নি। মাটির তৈরি প্রতিমা সে বটে, কিন্তু দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে সেই মৃৎপ্রতিমার ছাঁচ বড় কঠিন। ক্ষ্যান্তর মাকে সেই কাঠিন্যের পায়ে মাথা ঠুকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

দেখা গেল ক্ষ্যান্তর মার আনাগোনার মাত্রা কিছু কমছে। আসে, কথা কয়, ফিরে চ'লে যায়,—কিন্তু ও-বাড়ী থেকে দয়ালু প্রস্তাব আর আসে না। কেবল তাই নয়, বাবুলের আসা-যাওয়াও কম। সকালে তাকে আনে, একটু রেখেই নিয়ে যায়। দুপুরে রেণু অপেক্ষা ক'রে থাকে, বিকালে কিন্তু বাবুলকে আর আনা হয় না। একদিন সারাক্ষণই দীর্ঘ প্রতিক্ষা, কিন্তু বাবুল এলো

সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেকের জন্য। একদিন দেখা গেল, ক্যান্তর মা তা'কে আনলেই না। ক্রমে ক্রমে ব্যবধান হোলো দীর্ঘতর। বাবুল নাকি তার মাকে ছেড়ে মাসির কোলে আসতে চায় না, তার নাকি দুরন্তপনা বেড়েছে, সে নাকি সকল সময় রাস্তার ধারেই থাকতে চায়। এমন ঘটনার পর রেণুর মনে বাৎসল্যের বেদনা সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ডাইনীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই, তার ওপর যেন বৈরাগ্য ভর করেছে, তার যেন নিষ্কৃতি ঘটেছে, সে যেন স্বস্তি পেয়েছে। শিশুর সম্বন্ধে সে যে একটুখানি মোহগ্রস্ত হয়নি তা নয়, কিন্তু সে মোহ মাত্র, হৃদয়ের একটা সাময়িক কুয়াশা, একটা অস্থায়ী আবেশ। যৌক্তিক বুদ্ধির আলোয় ওর আবিলতা অপসৃত হ'তে দেরি লাগেনা। এর পরে একদিন দুটো টাকা হাতে নিয়ে ক্যান্তর মা এসেছিল, বাবুলকে রাখার শেষ বকৃশিস। কিন্তু তাও রেণু প্রত্যাখান করেছে সস্নেহ হাসিমুখে। বলেছে, প্রাপ্যের অতিরিক্ত নেওয়ার ফলেই এযুগে অর্থনৈতিক সংগ্রাম, ওতে কাজ নেই, ক্যান্তর মা। তুমি বরং আমার নামে দয়ালুদের কাছে অনুরোধ জানিয়ো, টাকাটা কোনো পাগলা গারদের ফণ্ডে পাঠিয়ে দিতে। ভবিষ্যতে উপকার পাবার সম্ভাবনা থাকবে।

ক্যান্তর মা বিদ্রূপ না বুঝেই হেসে কুটিপাটি হয়ে চ'লে গিয়েছিল।

দিন কয়েক পরে একদিন দুপুরবেলায় ফিরে অশোক স্নান সেরে খেতে বসলো। আয়োজন সামান্য। আজকাল খাদ্য-তালিকার মধ্যে নতুন বকৃশিসের চিহ্ন আর থাকেনা। সেই গতানুগতিক ডাল-ভাতের সঙ্গে একটা পাঁচমিশেলী। অশোক হাসিমুখে বললে, তুই এক কাজ কর, রেণু। অত্যধিক ভোজনের ফলে শরীরে চর্বি হবার সম্ভাবনা। আর চর্বির মানে জানিস ত? ভুঁড়ি রে, ভুঁড়ি। আবার ভুঁড়ি হ'লে দিবানিদ্রা, আর দিবানিদ্রার অভ্যাস হ'লে চাকৃরি খোঁজায় ইস্তফা। আর তোর যদি ভুঁড়ি হয়, রাঁধবে কে? আচ্ছা, রান্না না হয় না করলি, কিন্তু ভুঁড়ি হ'লে তোর আর বিয়ে হবে না, মনে রাখিস।

রেণু রাগ ক'রে বললে, আচ্ছা হয়েছে, এখন আসল কথাটা কি বলো দেখি?

অশোক বললে, এই পাঁচমিশেলীটা বাদ দে। কেবল ডাল, ভাত আর

আলুসেদ্ধ,—পারবিনে খেতে ?

না।—রেণু বললে।

পারলে কিন্তু ভাল হোতো রে। চর্বিও হোতো না, খরচও কমতো।

রেণু বললে, আমি বলছি পারবোনা। তরকারি একটু না হ'লে শুধু ডাল-ভাতে আমার বমি আসে।

অশোক বললে, কেন, আলুসেদ্ধ ?

রাম বলো! আমি রুগী, না ডাক্তার, যে আলুসেদ্ধ খেয়ে থাকবো ? দাদা, তোমাকে মানা করছি, আমার রান্নাবান্নার ওপর তুমি কথা বলো না।

অশোক খেতে খেতে বললে, সতেরো টাকায় দুমাস তুই কেমন ক'রে চালালি বল্ ত ?

অতর্কিত প্রশ্নে রেণু যেন একটু থতিয়ে গেল। হঠাৎ কি প্রকার উত্তর পেলে অশোক খুশী হয়, সেকথা ভেবে সে যেন আর কুলকিনারা পেলে না। তারপর ঢোক গিলে জবাব দিল, প্রায় এক বছর ধ'রে যেভাবে চললো, তেমনি ক'রেই চলছে ? তবে আর বোধ হয় চালাতে পারবো না, তা তোমায় ব'লে রাখছি, দাদা।

হাঁ, তা জানি।...ব'লে অশোক চুপ ক'রে গেল।

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় সে বললে, আচ্ছা শ্রমের মর্যাদা কথাটার মানে জানিস, রেণু ?

রেণু বললে, শ্রমের আবার মর্যাদা কি ?

আছে এমনি একটা কথা। ব্রাহ্মণের ছেলে যদি মুচির কাজ করে, বি-এ পাস করা ছেলে যদি রিক্সা টানে, এম-এ পাস মেয়ে যদি তাঁত বুনে খায়, তবে সেটা হোলো শ্রমের মর্যাদা। অর্থাৎ যে কোনো জীবিকা নিয়ে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অন্নসংস্থান করা মোটেই অগৌরবের নয়।

রেণু বললে, কিন্তু মুচির অন্নে, রিক্সাওলার অন্নে, আর তাঁতীর অন্নে ভাগ বসানো শিক্ষিত ভদ্র সন্তানের ত' যোগ্য নয়। তা ছাড়া এটা শিক্ষা ও শিক্ষিত—উভয়ের পক্ষেই কলঙ্ক।

কেন ?—অশোক বললে।

রেণু বললে, কই কোনো মুচি ত ব্রাহ্মণের কাজ করেনা, কোনো তাঁতী

মেয়ে ত তাঁত ফেলে ছোটেনা এম-এ পাস করতে? শ্রমের মর্যাদা তারাই দেয়, তোমরা নয়।—এই ব'লে সে দীর্ঘ বক্তৃতা ফাঁদলো,—তোমাদের উচ্চ-শিক্ষার মোহ যখন ভাঙলো, পেটের অন্নের জন্যে তোমরা ছুটলে ওদের অন্ন কেড়ে নিতে। ব্রাহ্মণের কাজ ব্রাহ্মণ যে আজ খুঁজে পায়না, এর কারণ, তাদের সৃষ্টি-প্রতিভা নষ্ট হয়ে গেছে। ছি ছি, শ্রমের মর্যাদা নাম দিয়ে গরীবের ঘরে ডাকাতি—রেণু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

অশোক ভগ্নীর প্রতিবাদ শুনে হাসিমুখে চুপ ক'রে গেল। গত এক বছরে রেণু যা শিখেছে তা ব্যর্থ হয়নি দেখে তার কিছু গর্বও হোলো।

আহার শেষ ক'রে হঠাৎ সে বললে, দুটো টাকা ধার দিতে পারিস,রেণু?

রেণু বললে, টাকা? টাকা পাবো কোথায়, দাদা? ভিখিরীর ঘরে ভিক্ষে চাও কেন?

হাসিমুখে অশোক বললে, মাঝখানে যে রকম সচ্ছল অবস্থা দেখালি, তা'তেই সাহস ক'রে চাইছি রে। পারবিনে?

না। বরং তোমার কাছে থাকে যদি কিছু তবে দাও। আজ সন্ধ্যেয় আর আলো জ্বাল্‌তে পারবো না।

বলিস কিরে? একেবারে দেউলে হয়ে বসেছিস? নাঃ তুই দেখছি ভারি অমিতব্যয়ী! আরে, আলো জ্বেলে কি হবে? এটা যে শুক্লপক্ষ? মফঃস্বল শহরে গেছিস কখনো? গেলে দেখতিস, শুক্লপক্ষে সেখানেও সরকারী রাস্তায় আলো জ্বলেনা।

রেণু বললে, দুটো টাকা কি তোমার বিশেষ দরকার?

উৎসাহিত হয়ে অশোক বললে, হ্যাঁ, বিশেষ দরকার। একটা প্রকাণ্ড স্বাধীন ব্যবসা ফাঁদবো।

দু'টাকায়?

হ্যাঁ, দুটাকা হ'লেই হবে। পারবি?

ক্যান্তর মা'র কথা মনে ক'রে রেণু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলো। তারপর বললে, না, পারবো না। তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা করো।

অশোক বললে, এতক্ষণ কী ভাবলি?

ভাবলুম, যদি ধার করিতে পারি! কিন্তু পারবো না, দাদা।

অল্প একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে অশোক বেরিয়ে গেল। কিন্তু সেদিন ফিরলো সে সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরেই। বিস্ময়ের কথা এই, আসবার সময় সে বাজার ক'রে এনেচে। চাল, ডাল, আলু, নুন, মসলা, ও কিছু তরি-তরকারী। বহুদিন পরে নতুন সব্জীর চেহারা দেখে রেণুর চোখ মুখ খুশীতে ভ'রে উঠলো। জিনিষ পত্র নামিয়ে অশোক বললে, এক সপ্তাহ অন্তত চালাবি। একটু জিরোই, তারপর তেল টেল এনে দেবো। কই, এবেলা উনুন ধরাসনি ?

হাসিমুখে রেণু বললে, একটু জিরিয়ে ধরাবো, দাদা।

ওরে পোড়ারমুখি, আমি সব আনলুম পরিশ্রম ক'রে, আর তুই নিবি বিশ্রাম ? মানে ?

রেণু বললে, মানে, এতই আশ্চর্য হয়েছি এসব দেখে যে, খানিকক্ষণ দম না নিলে আর চলছে না।

অশোক সহোদরার পরিহাসে হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললে, সত্যি বলতে কি, তোকে একটু চম্‌কে দেবার ইচ্ছেও ছিল। আসল কথাটা শোন্। আমার এক ধনী বন্ধুর কাছে ধার করেছি। সে তার সিগারেটের খরচ থেকে পাঁচটা টাকা ফেলে দিল।—নে নে, এবার উনুন ধরা। অবস্থা খারাপ হলে ক্ষিদে পায় বড় বেশি। মনে হচ্ছে যেন তিন দিন খাইনি।

কিন্তু উনুন আজকে নাই ধরালুম, দাদা ?

কেন, তুই কি আমাকে শুকিয়ে মারতে চাস্ ?

রেণু বললে, থামো। যে রোজগার করতে পারে না, তা'কে মারতেও লজ্জা করে। আমি বলছিলুম, ওবেলাকার ডাল-ভাত আছে, তাই খেয়ে না হয় এবেলাটা—

অশোক বললে, বটে, টাট্‌কা শাকসব্জীর গন্ধে রাত্রে বুঝি আমার ঘুম হবে ? সে হবে না, এক্ষুণি উনুন ধরা, তরকারী রাঁধ—

অগত্যা রেণুকে রাজি হ'তে হোলো। বললে, তবে যাও, শিগগির চারিটি কয়লা কিনে আনো। অমনি কেরোসিন আর সর্ষের তেল এনো।

তাই বল্ হতভাগি যে তোর কয়লা ছিল না।—এই ব'লে অশোক উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

বাজার বেশি দূরে নয়, একটু বাদেই সে কয়লা, তেল এনে হাজির

করলো। রেণু উনুন ধরিয়ে কুটনো কুটতে বসলো। অনেক দিন পরে আজ আবার যেন একটা সৌভাগ্যের জোয়ার এসেছে তাদের ঘরটিতে। পাঁচটি টাকা ধার দিয়েছে যে বন্ধু, যত সামান্যই হোক, সেই উদারপ্রাণ অপরিচিতের পায়ের কাছে নারীর অন্তর অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় নিজেকে আহত ক'রে দিল।

রান্না চড়াবে এমন সময়ে অশোক পিছনে এসে দাঁড়াল। বললে, রেণু তুই যদি রাগ না করিস তবে একটা কথা বলতে পারি।

কি শুনি ?

অশোক ইতস্তত ক'রে বললে, ধর্মতলা দিয়ে যাচ্ছিলুম, দেখি একটা হোটেলে ডিমসিদ্ধ সাজিয়ে রেখেছে। কী সুন্দর সাজানো, কী চমৎকার রং— আর ঝাল-মসলা দিয়ে যা কারি বানিয়েছে !

রেণু বললে, দেখে বুঝি তোমার খুব খেতে ইচ্ছে হলো, দাদা ?

ওই, অমনি বুঝি তোর সন্দেহ ? খেতে ইচ্ছে করলেই ত' তুই বলবি, বাজে খরচ, ভোজন-বিলাসী—এইসব। খাবার জিনিস দেখলে খেতে ইচ্ছে করা কি অপরাধ ?

রেণু বললে, খেতে ইচ্ছে ছিল, আনলে না কেন ?

আনলে তুই ঠিক রাঁধতিস ?

ওমা, তা রাঁধবো না কেন ? যাও, এক্ষুণি আনো।

অশোকের মুখে হাসি ফুটলো। এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে ছিল, এবার হাসিমুখে পকেট থেকে একটি ডিম বা'র ক'রে বললে, এই নে, তোকে ভয় না ক'রেই এনেছিলুম। আলু দিয়ে রান্না কর, আধখানা ক'রে খাবো দুজনে।

রেণু একবার তার দাদার দিকে তাকালো। দারিদ্র্যের রিক্ততায় কোনো-দিন তা'র চোখে জল আসেনি, আজো এই সামান্য খাদ্যের প্রতি দাদার একাগ্র আগ্রহ দেখে তা'র চোখ দুটি শুকই রইলো। কিন্তু উনুনের ধারে ব'সে তা'র মন ছুটে চললো পৃথিবীর সেই সব অজানা হতভাগ্যদের দিকে, যাদের এটুকু সম্বলও নেই ; যাদের উপবাসী দেহ পথের ধারে শুয়ে প্রাণ হারায় ; লোক-লোচনের অন্তরালে ব'সে দরিদ্রের ভগবানকে যারা কাতর কণ্ঠে ডাকে। আজ কেবল তাদের কথা মনে ক'রেই সহসা রেণুর চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

কিছু বলতেই সে চেয়েছিল, কিন্তু বললে না। মুখ ফিরিয়ে রেণু নিজের মনে কাজ করতে লাগলো।

রাত্রির আহার শেষ ক'রে উঠে অশোক বললে, তোকে এখন বলবোনা, কাজ একটা আরম্ভ করছি কাল সকাল থেকে। বলেছি ত' দু'টাকা মূলধন। খাটতে পারলে পয়সা পাবো। আর শোন্ বলি রেণু, আজ থেকে শুয়ে পড়বো সকাল-সকাল। কাল থেকে ডেকে দিবি ভোর চারটে বাজলে। ভোর থেকেই কাজ। যা তুই এবার খেয়ে নিগে।

আচ্ছা, ডেকে দেবে ঠিক সময়ে। তুমি শুয়ে পড়ো।

ভালো কথা। আজ সে রাস্তায় এক জ্যোতিষের কাছে হাত দেখিয়েছিল। জ্যোতিষ তা'র আপাদমস্তক দেখলো, তারপর তার হস্তরেখা বিচার ক'রে বললে, হাঁ বেটা, তোর সৌভাগ্য এসেছে। হয়ত ভালো চাকৃরি, নয়ত পরের ধন! আঠাশ বছর বয়সে অনেক টাকা জমাতে পারবি, বেটা·· এখন সময়টা একটু মন্দা চলছে—

জ্যোতিষকে একটা পয়সা দিয়ে চ'লে যাবার পরেই কিন্তু ধনী বন্ধুর সঙ্গে দেখা। হাতে হাতে ফল, নগদ পাঁচ টাকা ধার পাওয়া! এ-কথাটা রেণুকে না বললে তার ঘুম হবে না। সত্য সত্যই তা'র নক্ষত্র ফিরলো নাকি?

অশোক উঠে রান্নার চালার কাছে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ তা'র মনে হোলো রেণু যেন চোরের মতো চুপি চুপি তার আহার শেষ করছে। কেরোসিনের ডিবে নেবানো, কেবল উনুনের মরা আঁচের রাঙা আভাটা তখনও রয়েছে। সেই অস্পষ্ট আলোয় অশোক লক্ষ্য করলো, তরকারীর চিহ্ন নেই তার পাতে; জ্যোৎস্নার আভাসে যতটুকু দেখা যায় কেবল একরাশি ভিজা ভাত, নুন মেখে তাই সে নাড়াচাড়া করছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, দুজনের মতো তরকারী রাঁধতে রেণুর সাহসে কুলোয়নি।

একটি বছর ধ'রে অশোক তা'র সহোদরার আহারাদির চেহারা লক্ষ্য করেনি। বাঙালী দরিদ্র মেয়ে পুরুষের খাওয়ার শেষে উনুনের ধারে ব'সে কী যে অনাদর আর অভাবের খাওয়া খায়, এ দেখলে মানুষের মাথা হেঁট হয়ে আসে। অশোকের মুখে আর আওয়াজ ফুটলোনা, পা টিপে-টিপে

সে স'রে এলো। অন্ধকারে পুনরায় নিঃশব্দে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, হায়রে জ্যোতিষের ভবিষ্যৎবাণী! সে যে কত ব্যর্থ, সে যে কত পরিহাস, তা কি বুঝবার আর প্রয়োজন রইলো? জীবন সম্পর্কে কোনোপ্রকার আশাবাদ এ যুগে কি কোন সান্ত্বনা দেয়?

চার

শ্রমের মর্যাদার আলোচনাটা অত সহজে ভুললে চলবে না। তার সঙ্গে দুটাকার ব্যবসা, বন্ধুর কাছে টাকা ধার নেওয়া, এবং নবতম অধ্যবসায়—এগুলোকে একত্রে সংযুক্ত করলে একটা কোনো অর্থ দাঁড়ায় বৈকি।

রেণু বলেছে, মুচির অন্ন ব্রাহ্মণে যদি কেড়ে খায় তবে সে ডাকাতি। কিন্তু এমন ত হ'তে পারে, শ্রমের মর্যাদা রাখতে যাওয়ার মানেই কুলি-মজুর আর শ্রমিকের অন্ন অপহরণ করা নয়? তাঁতীর জাতি-ব্যবসায় অধিকার ক'রে নেওয়া হয়ত মন্দ, কিন্তু যে পরিশ্রমে সর্বসাধারণের অধিকার, সেখানে নিশ্চয়ই বিবেকের দংশন নেই। মনে হচ্ছে, রেণু তা'র নিজের মতামতটা গুছিয়ে বলতে পারেনি।

দুটাকার ব্যবসাটা রেণুর কাছে গোপন রাখা সহজ, কিন্তু রাস্তাঘাটে তা'র প্রকাশ্য ব্যবসা গোপন করবে সে কেমন ক'রে? সেটা অসম্ভব। অতএব অম্লানবদনে ভোর বেলা উঠে অশোক চ'লে গেল একখানা সংবাদপত্রের আপিসে। সেখানে হিন্দুস্থানীদের ভিড় ঠেলে পঞ্চাশখানা কাগজ কিনে সে বেরিয়ে এলো। ভোর বেলা, শহর তখনও সম্পূর্ণ জাগেনি। ঝাড়ুদাররা তখনও পথে পথে কাজ করছে। সেই সময় কাগজগুলি এক হাতে চেপে ধ'রে অশোক ছুটলো। এই ব্যবসা তার পক্ষে সম্মানহানিকর কিনা একথা সে ভাবলো না, সে আজ অপমানিত বোধ করলো এই কারণে যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। শ্রমের মর্যাদা সে রাখবে, অবশ্যই রাখবে, এর পারিশ্রমিক কত তাও তার অবিদিত নেই। কিন্তু তবু গলি-ঘুঁজি দিয়ে সে লুকিয়ে চললো। নিজেকে সে লুকোচ্ছে না, কিন্তু লুকোচ্ছে তার নামের সঙ্গে জোড়া বি-এ ডিগ্রিটাকে। ওটা জানাজানি হলে তাকে লোকে করবে দয়া,

তার নাম উঠবে এই কাগজে, তা'র প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে হা-হুতোশ করবে একদল বিচক্ষণ প্রবীণ। যারা আজো অর্থকরী উচ্চশিক্ষার আশা ক'রে, যারা আকাশে নির্মাণ করে প্রাসাদ, যারা ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের স্বপ্নজাল বোনে,—তা'র এই পেশা দেখে সেই সব নাবালকের দল ভীত হয়ে উঠবে। সুতরাং এই কাজ তা'র গোপনেই করা ভালো।

কয়েকখানা কাগজ বিক্রি করলে সে পথে পথে। কমিশনটা হাতে হাতে, যাকে বলে নগদ বিদায়। প্রকাশ্য বড় রাস্তার চৌমাথায় এসে হাঁকলে এতক্ষণ অর্ধেক অবশ্যই কাটতে পারতো, কিন্তু অশোকের সে সাহস নেই। কা'র কাছে তার সম্মান-দায়িত্ব, কে তার কল্যাণকামী, কেই বা তা'কে এভাবে দেখলে ছি ছি করবে, কেনই বা তা'র এই চক্ষুলজ্জা? কিন্তু তবু যেন পা উঠলো না। যেন চারিদিক থেকে নিঃশব্দ অপলক চক্ষু তা'কে পথে পথে অনুসরণ করছে ; যেন সমস্ত সমাজ, সমস্ত অধ্যাপক ও ছাত্রদল, যেন নিরুপায় ও অভিশপ্ত মধ্যবিত্ত সাধারণ রোষ-বিদ্রূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দুই কান ধ'রে বলছে, শ্রমের মর্যাদা বটে, কিন্তু এ তুমি করলে কি, ওহে গ্রাজুয়েট? আমাদের সামাজিক আভিজাত্যের মান রাখলে না একটুও?

সমাজ!

অশোক থমকে দাঁড়ালো। কোনো সমাজে সে মানুষ হয়নি। সমাজের নিরীখ তা'র মনে নেই। নগরের পল্লীতে পল্লীতে তার জীবন কেটেছে, যাযাবর মানুষের মতো তারা কোথাও স্থির থাকেনি, কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গেই তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল না, কোনো আত্মীয় পরিজনের মধ্যেই তাদের যোগাযোগ নেই। কোথায় সমাজ, কোথায় বা তার অনুশাসন? কলকাতার লক্ষ লক্ষ লোক পঙ্গপালের মতো নগরের পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়, তারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন, একের সঙ্গে অপরের পরিচয় নেই। তাদের একত্র করলে একটা সৈন্যদল হয়, কিন্তু সমাজ হয় না। তারা আপন আপন স্বকীয়তা নিয়ে উদাসীন,—নগরের সহস্র সহস্র জন্ম-মৃত্যু নিয়ে তাদের কোনো উদ্বেগ নেই, রোগে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে নগরের এক অংশ উজাড় হয়ে গেলেও অন্য অংশের কোনো ক্ষতিবোধ নেই। তারা সত্য সত্যই মরুভূমির বালুকণা, সবাই একত্র কিন্তু প্রত্যেকেই আত্মীয় যোগশূন্যহীন। এখানে সমাজ কোথায়?

স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এ যুগের কোনো সমাজের অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। একের জন্ম অপরের বেদনাবোধ নেই, একজন অন্যের শুভবুদ্ধির আশ্রয়ে স্থান পায় না, যৌথ-জীবনযাত্রা চূর্ণ হয়ে পড়েছে, ব্যক্তিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থপর সংগ্রাম চলছে প্রতি ঘরে ঘরে, প্রাচীন আদর্শের খণ্ড ভগ্নাংশ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত প'ড়ে রয়েছে, এখানে সমাজের বিশেষ আকার কোথায়? পুরাতন সমস্তই ভাঙছে একে একে, নূতন কোথাও গ'ড়ে উঠতে পারছে না। প্রাচীন নীতি বিদায় নিচ্ছে লজ্জায়, সংস্কারের অভাবে, অথচ নব্য নীতি মাথা তুলতে পারছে না কোথাও। আজ সে নিজে উদরান্ন সংগ্রহের জন্ম ফিরছে পথে পথে, আজ সে যে-কোনপ্রকার পরিশ্রম, যে কোনো পেশা, যে-কোনো কাজ করতে উদ্যোগী। কিন্তু রূপার চামচ মুখে নিয়ে যারা সংসারে জন্মেছে, তাদের উদরান্ন সংগ্রহের কোনো উদ্বেগ নেই। তাদের পরাশ্রিত বলো, পরশ্রমজীবী বলো, কিন্তু তারাই ঠাঁই পায় মানুষের দলে। তাদের মধ্যে দুর্নীতি থাক্, অসাধুতা আর অনাচার থাক্, তারা নীচেকার মানুষদের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলুক, কিন্তু তবু তাদের প্রাপ্য সম্মান মানুষের কাছে কমেনি। তাদেরই মধ্যে অশোক দেখেছে লোভীর নির্লজ্জ লোভ! অসৎ প্রকৃতির কুৎসিত আত্মপ্রচার, লুণ্ঠনবৃত্তির বর্বর অনাচার, দুর্নীতির নিদারুণ উৎপীড়ন। সত্যবাদী যারা নয় তারা এখনকার মানুষের কাছে পায় সম্মান, কল্যাণকামী যারা নয় তারা পায় শ্রদ্ধা, হিতবাদী যারা নয় তারা পায় যশ। যারা কোনো দিন উপবাসীর মুখে অন্ন যোগায়নি, অনাশ্রিতকে দেয়নি স্নেহের আশ্রয়, দুঃখী মানুষের জন্ম যাদের বুকে এক বিন্দু অশ্রুর আন্দোলন নেই, যাদের ধনলোভ, যশোলাভ, পদমর্যাদা-লোভ ও কর্তৃত্বলোভ পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠে আজ বঞ্চিত ব্যর্থ বুভুক্ষু ও বিত্তহীনদের পদদলিত করতে উদ্যত—তারাই প্রতিষ্ঠা পায় নির্বোধ জনসাধারণের নিরুপায় অশিক্ষার কাছে। এখানে সমাজ কোথায়?

আজ পথের ধারে দাঁড়িয়ে কেন ভগ্নী রেণুর জন্ম তার মন কাঁদে, কেনই বা তার বুকের মধ্যে নিষ্ফল ও নির্বাক যন্ত্রণা হাহাকার করে? কেন ওই নিষ্কলুষ নিরপরাধ তরুণী উপবাস করে মুখ বুজে, কেন ভাগ্যের হাতে মার খায় অকারণে, কেন কুকুরের মতো বিতাড়িত হয়ে বেড়ায় এক দুয়ার থেকে অন্য দুয়ারে? দারিদ্র্যের অন্ধ গহ্বরের মধ্যে ব'সে রেণু আজ তপস্বিনীর মতো

পৃথিবীর ভাগ্যহীনদের জন্ম অশ্রুমোচন করে, এ দৃশ্য যত হাস্যকরই হোক, এর চেয়ে বেশি হাস্যকর হোলো, সেই সব নগর-বিলাসিনী অভিজাত নারী-সম্প্রদায়ের চটকদার নারী-আন্দোলন। যাদের অন্নের দুর্ভাবনা নেই, যাদের সাজসজ্জা প্রসাধন অলঙ্কারের দুশ্চিন্তা নেই, যারা নিরাপদ আশ্রয় আর নিরাপদ সম্মানের মধ্যে ব'সে কেবলমাত্র বিলাস-বিভব-ফ্যাশন-স্টাইলের আলোচনায় চায়ের পেয়ালায় ঝড় তোলে, যারা বহিপুরুষের মেজাজ ও মর্জির কৌতুক নিয়ে লীলাছলায় দিন কাটায়, এবং আপন স্বেচ্ছাচারকে অবারিত রাখার জন্ম অভিভাবক-বিদ্বেষ প্রচার ক'রে বেড়ায়,—তারা পায় নারীজগতে সম্মান। সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের রূপবতী আর রূপাজীবার সাজসজ্জা প্রসাধনে আজ প্রভেদ কোথায়? একই পাউডার ক্রীম, একই রক্তিম রাগ, একই অঙ্গভঙ্গী, একই বাগ্‌ভঙ্গী, একই আবেদন, এবং পুরুষকে খুশী করার ও নিজেকে লোভনীয় করার একই দৈহিক চক্রান্ত।

অথচ নিষ্পাপ ও নিরুপায় রেণু? পথের ধারে দাঁড়িয়ে গ্রাজুয়েট হকারের চক্ষে কেন আজ বাষ্প জমে ওঠে? কেন আজ ওই নিরপরাধ কুমারীর মনে দেখা দেয় বিপুল সংশয়; অপরিসীম নিরাশা আর এযুগের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা? ভদ্রনারীর সম্মান আজ কোথাও নেই, কিন্তু সমাদর আছে সিনেমা জগতের পতিতাদের, যারা চটুল আনন্দ আর অগ্নিস্রাবী দেহমাদকতার নেশা ছড়িয়ে বেড়ায়। তাদের ছবি, তাদের জীবনী, তাদের যশ, তাদের খেয়াল-খুশি, তাদের বিভিন্ন রুচিবিকারের অনাবশ্যক ও হাস্যকর পরিচয় কাগজে কাগজে, পথে ঘাটে, লোকের মুখে মুখে সগর্বে প্রচার করা হয়। কেন? কেন এই বিকৃতি? কেন এই অবমাননাকর উদ্দীপনা? কেন আজ এদেরই পৈশাচিক উল্লাসের প্রাঙ্গণের প্রান্তে একাকিনী বসে তা'র সহোদরা রেণু অশ্রুর অশ্রুত বেদনায় অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু-মন্ত্র জপ করবে?

দরিদ্রের সমাজ নেই, দরিদ্রের ধর্ম নেই, দরিদ্রের জীবন-নীতি কোথাও কিছু নেই। তাদের এক ও অদ্বিতীয় পরিচয় তারা সর্বহারা, তারা নিঃস্ব। আজ অশোক সহসা যেন প্রবল শক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো, অকৃত্রিম অহঙ্কারে যেন তা'র পৌরুষকে রোমাঞ্চিত ক'রে তুললো। সে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে, নির্বিকারে সকাল বেলাকার জন-বহুল চৌমাথার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে

উচ্চকণ্ঠে হাঁকতে লাগলো, সংবাদপত্রের নাম ও সেদিনকার নূতন খবর। সে আজ নিঃস্বের দলের দলী, তার সমাজ নেই, তার ধর্ম নেই,—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শবসাধনায় সে আজ ব'সে গেছে।

অশোক তারস্বরে হাঁকতে লাগলো পথে-পথে।

দু'টাকার ব্যবসাটা দাদা যে জমিয়ে তুলেছে তা'তে আর রেণুর সন্দেহ নেই। মূলধন ঠিকই আছে, কেবল মুনাফার অংশ দিয়ে দুবেলা হাঁড়ি চড়ছে, এমন সৌভাগ্য কম লোকেরই হয়। খাটুনি বেশি, কিন্তু তা'র তুলনায় ছ'আনা আট আনা পয়সা আরো অনেক বেশি। দাদার অসময়ের জন্য ওর ভিতর থেকেই রেণু নিঃশব্দে আধলা পয়সা জমাতে সুরু করেছে। দাদার গায়ে শীতবস্ত্র নেই, পায়ের ক্যাম্বিশের জুতো ফুটো হয়ে তিনটে আঙুল বেড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সময় মতো একটু সরবৎ না দিলে পুরুষ মানুষের পক্ষে এত রোদে আনাগোনা কঠিন। সেদিকেও লক্ষ্য রাখা চাই। তাদের দুর্ভাগ্যের মেঘ মলিন আকাশের প্রান্তে একটু যেন রৌপ্যরেখা চিক চিক ক'রে উঠেছে।

ক্ষ্যান্তর মা তাদের অবস্থার সামান্য উন্নতি দেখে খুব খুশী। একদিন বললে, দিন পনেরো হবে, না দিদিমণি? তোমার দাদা নতুন কাজে লেগেছে, তাই বলছি।

রেণু বললে, হ্যাঁ, ক্ষ্যান্তর মা, এই দুই হপ্তা হোলো।

দিদিমণি, আমার আনন্দ তোমাকে বোঝাতে পারবো না। কতদিন ধরে দেখছি তোমাদের, কেমন যেন মায়া প'ড়ে গেছে।

তা ত' বটেই, ক্ষ্যান্তর মা। আমারও তাই।

ক্ষ্যান্তর মা উৎসাহিত হয়ে বললে, অনেক গরীবের ঘরে অনেক গরীব মেয়ে দেখেছি দিদিমণি, কিন্তু তোমাকে দেখলুম একেবারে নতুন।

রেণু রান্না করছিল। এলোথেলো খোঁপার ঝলক ঝুলছে তার কপালে, রাঙা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, গায়ে এবেলা জামা নেই, পরণের শাড়িখানা যেমন

তেমন। সহসা আত্মসচেতন হয়ে মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে সে প্রশ্ন করলে, কেন, ক্ষ্যান্তর মা?

ক্ষ্যান্তর মা বললে, কেন? ইচ্ছে করে আয়নাটা এনে তোমাকে দেখাই। খাওয়া পরার যত্ন নেই, খাটুনির কামাই নেই, আদর করবার মানুষ নেই, তবু তোমার চেহারা যেন সাক্ষাৎ পার্বতী। সত্যি বলছি দিদিমণি, এমন গড়ন-পেটন আমি আমার জন্মে-জীবনে দেখিনি।

তরকারীতে একটু জল ঢেলে দিয়ে রেণু কিছু গম্ভীর হয়ে বললে, তোমার সুনজরে পড়েছি তার জন্যে আমার খুব আনন্দ, ক্ষ্যান্তর মা। কিন্তু দাদার আশ্রয়ে থাকি, আশীর্বাদ করো, নিজের দিকে যেন কোনোদিন আমার চোখ না পড়ে।

ক্ষ্যান্তর মা হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কথাটা যেন তা'র ভালো লাগেনি, রেণু বুঝতে পারলো। ওটাকে মোলায়েম করার জন্য সে পুনরায় বললে, এই ক'মাসে কত সাহায্য তুমি করেছ তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের উপকার ভুলে যাবো, এমন দুর্মতি যেন না হয়। ক'টা বাজলো, ক্ষ্যান্তর মা? কই, দাদা ত' এখনো এলেন না?

ক্ষ্যান্তর মা বললে, হ্যাঁ, প্রায় একটা বাজে, দিদিমণি। তোমার দাদা ত' আসে বারোটার মধ্যে, না?

এক একদিন একটু দেরি হয়-বটে।

রেণুর মেজাজ বুঝে ক্ষ্যান্তর মা বললে, দাদাবাবু আমার সাক্ষেৎ দেবতা! অমন চাঁদের মতন ছেলের কী কষ্ট, দেখলে চক্ষে জল আসে। পেটের অন্নের জন্যে যদি ঘুরেই বেড়াতে হোলো, লেখাপড়ার কী দাম রইলো, মা? আচ্ছা, দিদিমণি— ?

কি, ক্ষ্যান্তর মা?

আমার কথাটায় তুমি কান দিলে না এই আমার দুঃখ। আমি তোমাকে বার বার বলছি দিদিমণি, কথাটা একবার কিন্তু বাবুর কানে তুললেই কাজ হয়ে যেতো।

রেণু বললে, কিসের কথা বলো ত? ওঃ তুমি সেই দাদার চাকুরির কথা বলছ বুঝি?

ক্ষ্যান্তর মা সাহস ক'রে বললে, চাকুরি ব'লে চাকুরি ? পঞ্চাশ টাকা মাইনে। দু আনা চার আনার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় না বেড়িয়ে একেবারে চেয়ার-টেবিলে গিয়ে বসা। দশটা-পাঁচটা কাজ, সরকারী চাকুরি—আর কি কিছুর ভাবনা থাকবে, দিদিমণি ? চচ্চড় ক'রে মাইনে বাড়বে দাদাবাবুর, তোমার বিয়ের তখন ভাবনা কি ?

লোভনীয় প্রস্তাব বটে। রেণু হাসতে লাগলো,—কিন্তু এই নিঃস্বার্থ উপকার তুমি কেন করবে, ক্ষ্যান্তর মা ?

আমি তোমাদের দাসী, তোমাদের খেয়ে মানুষ। আমার সাধ্যি কি, তোমাদের ভালো করা, মা ? ওই ওপরঅলার ইচ্ছেতেই সব হবে। তোমাকে ব'লে রাখছি, বাবুকে পায়ে ধ'রে ডেকে আনবো আমি, একবারটি তুমি কেবল মুখের কথাটা খসাবে। ব্যস, পাকা আমটির মতন টুক্ ক'রে পড়বে সরকারী চাকুরি তোমার দাদার পায়ের কাছে।—ক্ষ্যান্তর মা ব্যগ্র অধীর দৃষ্টিতে রেণুর মুখের রেখা পরীক্ষা করতে লাগলো।

রেণু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বললে, কিন্তু ও-বাড়ীর বাবুই বা আমাদের এত উপকার কেন করবেন, ক্ষ্যান্তর মা ?

রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে ক্ষ্যান্তর মা বলতে লাগলো, দয়া, স্রেফ দয়া, দিদিমণি। কত দয়া করলেন উনি এই পাড়ায় এসে, একমুখে বলতে পারিনে। তুমিই বলো ত' মা, এমন দয়ালুরা না থাকলে কি আমাদের অন্ন জুটতো ? একেবারে নির্জলা দয়া, নিঃস্বার্থ—

রেণু আবার হেসে উঠলো। বললে, আচ্ছা, তুমি এখন যাও, ক্ষ্যান্তর মা। দাদা আসুন, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করি, তারপর বাবুলের মাকেও একবার—

হাত নেড়ে ব্যস্ত হয়ে ক্ষ্যান্তর মা বললে, ওকথা মুখে এনো না, দিদিমণি। তা হ'লেই সর্বনাশ। পাঁচদিকে পাঁচজন শত্রু, কানাকানি হলেই সব ভেস্তে যাবে। এ বাজারে চাকুরির চেষ্টা চুপি চুপি। আগে ভালোয় ভালোয় কাজটা হয়ে যাক্, তারপর সুখবর সবাই শুনবে, শত্রুর মুখে ছাই পড়বে।

রেণু আবার সরল দৃষ্টিতে তাকালো। বললে, আমাদের ত কোনো শত্রু নেই, ক্ষ্যান্তর মা ?

আছে, খুব আছে দিদিমণি। সৌভাগ্যের শত্রু চারিদিকে। শত্রু

আমাদের আনাচে-কানাচে, কেবল মিষ্টিমুখে কথা কয় বলে তাদের আমরা চিনতে পারিনে। বন্ধু হয়ে তারা ঘাপটি মেরে থাকে চারদিকে। কিন্তু কেউ নিঃস্বার্থ নয় দিদিমণি—সুবিধে পেলেই একে একে ছোবল মারে। ঘরের দেওয়ালটাকেও তাই বিশ্বাস করতে নেই।—বলতে বলতে ক্ষ্যান্তর মা হাঁপাতে লাগলো। কী যে উৎকণ্ঠা তার মুখে চোখে।

রেণু তা'র ঘর্মাক্ত ও উদ্দীপ্ত চেহারা দেখে আবার হেসে বললে—আচ্ছা, এখন তুমি এসোগে, ক্ষ্যান্তর মা। এখনই দাদা এসে পড়বেন। এসব কথা পরে হ'লেও চলবে, কেমন?

আচ্ছা, আমি এখন চললুম। কিন্তু ভেবে দেখো দিদিমণি, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না—বলতে বলতে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত ক্ষ্যান্তর মা তখনকার মতো প্রস্থান ক'রে রেণুকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রেণু আবার নিজের কাজে মন দিল। মাঝে মাঝে ক্ষ্যান্তর মা কেমন যেন অজানা আশঙ্কার আভাস সঙ্গে নিয়ে আসে।

সকাল গেছে, মধ্যাহ্ন গেল, অস্বস্তিকর প্রতীক্ষায় অপরাহ্নও প্রায় যায় যায়,—রান্না-বান্নায় ঢাকা দিয়ে, বা'র দুই স্নান ক'রে, দীর্ঘকাল অস্থির পায়চারী ক'রে এক সময় অবসন্ন শরীরে রেণু তার লেখাপড়ার বই কাগজ নিয়ে সবেমাত্র বসেছে, এমন সময় বাইরে অপরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর আর পদশব্দে সে সহসা উৎকর্ণ হয়ে তাকালো। ক্ষ্যান্তর মা অতি উৎসাহবশে যদি কাউকে এনে থাকে তবে রেণু কি ভাবে তার দাদার অনুপস্থিতিতে সমস্ত ব্যাপারটার প্রতিকার করবে, তাই ভেবে সে চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু নড়বার শক্তি তা'র ছিল না, স্থাণুর মতো নিশ্চল হ'য়ে সে ব'সে রইলো।

হঠাৎ তা'র দরজার কাছে একটি বছর বারো বয়সের সুন্দর ফুটফুটে কিশোর বালক এসে উঁকি মারলো। দুজনে চোখাচোখি হতেই বালকটি ব্যস্ত ভাবে বললে, আপনি একবার বাইরে আসুন ত? অশোকবাবু এসেছেন।

তীরবেগে রেণু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দাদা? কই?

বাইরে এসে রেণু স্তম্ভিত হয়ে গেল। দুইজন লোক অতি সন্তর্পণে

অশোককে ধ'রে ধ'রে নীচের থেকে তুলে এনেছে। মাথায় ও কপালে তা'র ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, নিমীলিত চোখ, জামায় ও কাপড়ে রক্তের ছোপ, পায়ে একপাটি জুতো নেই।

দাদা!—যেন শাবকহারা সারসীর আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলো মহাশূন্য,—কি হোলো দাদা তোমার?

ঝাঁপিয়ে এসে রেণু ধরলো অশোককে। অশোক শুধু শীর্ণ হেসে জড়িত কণ্ঠে বললে, শ্রমের মর্যাদা পেলাম, ভাই।

ভাই বোনের এই করুণ দৃশ্যে বোধ করি কিছু স্বর্গ-মহিমা ছিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য আগন্তুক তিনজনের একটু আত্মবিস্মৃতি ঘটলো। তারপর বালকটিই আগে বললে, তাড়াতাড়ি ওঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিন, এখন একটু ভাল মনে হচ্ছে।

ঘরে এসে ক্ষিপ্রগতিতে যেমন-তেমন ক'রে বিছানাটা পেতে রেণু অশোককে শুইয়ে দিল। অপর দুইজন লোকের হাতে ছিল একখানা ভালো কম্বল, কয়েকটি ঔষধপত্র, তুলা ও ব্যাণ্ডেজ, একটা বড় ফ্লাস্ক্, এবং একটি সাজিতে কিছু ফলমূল ও মেওয়া। তা'রা দরজার কাছে সেগুলি নামিয়ে রাখলো।

নীচের থেকে খবর পেয়ে গিন্নি তাঁর বাত-বেদনা উপেক্ষা ক'রে ওপরে উঠে এলেন। সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে তিনিও যেন হতচকিত হয়ে গেলেন। বললেন, কি হোলো, বাবা?

একটি লোক বললে বাঙ্গালী-হিন্দুস্থানী দাঙ্গা!

ওমা, সে আবার কি গা?

পেটের ভাত নিয়ে কাড়াকাড়ি, বুঝলেন না?

ঘরের ভিতরকার দরিদ্র চেহারা দেখে কিশোর বালকটির হৃদয় বোধ করি অভিভূত হয়ে থাকবে। জুতোটা ছেড়ে ভিতরে এসে রোগীর গায়ে ধীরে ধীরে সে কম্বলখানি চাপা দিয়ে দিল। তারপর শিয়রের কাছে এসে স্তিমিত ও অর্ধজাগ্রত অশোকের গায়ের উপর হাত বুলিয়ে প্রস্তর-প্রতিমার দিকে চেয়ে বললে, বিশ্রাম নিলে একটু ক'মে যাবে, বাবা ব'লে দিলেন। নীচে আমাদের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমরা এবার যাই।—এই ব'লে সে আবার উঠে দাঁড়ালো।

রেণু নিশ্বাস ফেলে বললে, তোমার নাম কি, ভাই ?

আমার নাম মণিমোহন চট্টোপাধ্যায়। আমরা যাচ্ছিলুম আমাদের বনগাঁর বাগানে। শিয়ালদা ষ্টেশনের কাছে উনি কাগজ বিক্রি করছিলেন, এমন সময় তিন চারজন হিন্দুস্থানী হকারের সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হয়। ওঁকে গালাগাল দিতেই উনি একটা পাথর তুলে একজনকে মারেন। তারা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ওঁকে মেরে পালিয়ে যায়! আমরা আজ সারাদিন ওঁকে নিয়ে হাসপাতালে আর আমাদের বাড়ীতে ছিলুম। আমাদের বাগান যাওয়া হয়নি!

কৃতজ্ঞতার কোনো ভাষা রেণুর মুখে এলো না।

লোকদুটি বাইরে দাঁড়িয়েছিল। মণিমোহন বললে, আচ্ছা, আমরা যাই। আবার আসবো খবর নিতে। কম্বলখানা ওঁর গায়ে থাক্, আর ওই ফ্লাস্কে গরম দুধ আছে, ওসব মা দিয়েছেন।—এই ব'লে সে ঘর থেকে বেরিয়ে লোকদুটিকে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

দরজার কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গিন্নি সমস্তটা স্তব্ধভাবে নিরীক্ষণ করছিলেন। এবার সহসা চোখ মুছে বললেন, কপালের গেরো মা, তুমি আমি কা'রো সাধ্যি নেই যে রোধ করি। যাই, দাঁড়াতে পারিনে মা, বাতে পঙ্গু। হ্যাঁ, এক কথা তোমাকে ব'লে যাই। দেবার ক্ষ্যামতা ত আমার কিছু নেই, ভগবান মেরে রেখেছে। তা যাই হোক, এমাসের ঘরভাড়া থেকে তুমি একটি টাকা কম দিয়ো, রেণু। যেমন ক'রে হোক আমি চালিয়ে নেবো।

এমন স্বার্থত্যাগ তাঁর জীবনে এর আগে ঘটেছে কিনা তাঁর নিজেরও মনে পড়ে না। এমন অকল্পিত ও অভাবনীয় আচরণ যেন নিজেরই কাছে বিস্ময়। একটি টাকা ফস ক'রে গরীবকে দান করা সহজ, কিন্তু এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের ফলে তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে, সেই কথাটি ভাবতে ভাবতে ক্ষুণ্ন মনে তিনি নীচে নেমে গেলেন।

এক সময় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে রেণু আলো জ্বাললো। অশোক আর কথা বলেনি, সাড়াও দেয়নি, নিশ্চল হয়ে চোখ বুজে প'ড়ে রয়েছে। মণিমোহন ব'লে গেছে বিশ্রাম নিলে একটু কমবে। তা'হলে এতক্ষণ কমেনি, কমতে পারে মাত্র। রেণু একবার নিঃশব্দে হেঁট হয়ে দেখলো, অশোকের নিশ্বাস পড়ছে কি ভাবে। কিন্তু নিশ্বাস সরল নয়। কখনো দ্রুত, কখনো ধীর।

রেণু নিজের নিশ্বাসটাও অনুভব করতে পারছে। কখনো ধীর, কখনো দ্রুত। কিন্তু চঞ্চল হ'লে ত' তার চলবেনা। তার মাথার উপরে কেউ নেই, তার অভিযোগ জানাবার কোনো ক্ষেত্র নেই, এই দুর্ঘটনাকে দৈব ব'লেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু দৈব কি,—রেণু ভাবলে, দেবতা কোথায়? বাবা গল্প বলতেন, আকাশ ফেটে দৈববাণী হলো! দুষ্কৃতকে বিনাশের জন্য নাকি, সম্ভবামি যুগে যুগে। কিন্তু কোথায় দেবতা, সাধুকে পরিত্রাণের জন্য কোথায় তাঁর আবির্ভাব? দরিদ্রের সহনশীলতা অনেক বেশি, তাই কি তা'র ওপরে আসে আঘাতের পর আঘাত? বাবা বলতেন, সুধাসমুদ্র মন্থনের কথা। নীলকণ্ঠ পান করলেন হলাহল আকণ্ঠ! কোথায় সেই সুমেরু শিখর, এই দারিদ্র্য আর মৃত্যুর নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার কোথায় সেই বিশল্যকরণী আর সঞ্জীবনী? সে শুনেছে, নারায়ণ আসেন ব্রাহ্মণের বেশে গরীবের কুঁড়ে ঘরে। দেয়াল বিদীর্ণ ক'রে নাকি আবির্ভূত হয়েছিলেন নৃসিংহ অবতার। ভগীরথ নিয়ে গিয়েছিলেন গঙ্গাকে অভিশপ্ত পিতৃপুরুষকে নরকবাস থেকে উদ্ধার করতে। পাষাণী অহল্যা প্রাণবতী হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে!

একটির পর একটি ছায়াচিত্রের মতো, স্বপ্নের মতো। একটির পর একটি কাহিনী রেণুর কল্পনার উপর দিয়ে স'রে যেতে লাগলো। কিন্তু দৈব কি? নিরুপায় জননীর কোল থেকে মৃত্যু এসে ছিঁড়ে নিয়ে যায় সন্তানকে, সে কি দৈব? উপবাসীর মুখের অন্ন কেড়ে খায় বর্বরের লালসা, আর দস্যুর লৌহচক্র নিরপরাধের বুক দলিত ক'রে চলে যায়, সেও কি দৈব? পথে পথে যার আশ্রয়, পাখীর মতো যারা পেটের অন্ন খুঁটে খায়, অপমানে যারা নতশির, দুয়ারে দুয়ারে যারা বিতাড়িত, ভাগ্যের হাতে যারা চিরলাঞ্ছিত, তাদের প্রতিই কি দৈবের অভিশপ্ত কৃপাদৃষ্টি নিরন্তর জাগ্রত থাকে? দুঃখ-দুর্দশার দাহনে তারা জ্বলছে কোন্ দৈবের তুষ্টির প্রয়োজনে? কোথায় সেই নির্দয় দৈব, কোথা দরিদ্রের ভগবান?

বাইরে জ্যোৎস্না রাত, বাতাস লঘু, পৃথিবী নিথর, সুস্নিগ্ধ মৃত্যুর মতো সুন্দর। রেণু তা'র দাদার শিয়রে জেগে ব'সে রইল অপলক চক্ষে। আলোটার শিখা মৃদু মলিন। আর একটু পরেই হয়ত নিবে যাবে। বাইরে থেকে অল্প অল্প ঠাণ্ডা

আসছে। কিন্তু উঠে গিয়ে দরজাটা দিয়ে আসার উৎসাহ তা'র নেই। থাক্ আজ সব জান্‌লা-দরজা খোলা। আজ বাইরের সঙ্গে ভিতরের সুস্পষ্ট যোগাযোগ হয়ে যাক্। চন্দ্রহসিত ওই রাত্রির সুন্দর আবরণের অন্তরালে যে নিষ্ঠুর নিরুদাসীন ভাগ্যদেবতা ব'সে দরিদ্র মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, আজ তা'র সঙ্গে বায়ুতরঙ্গে একটা সংযোগ ঘটুক। দিনযাত্রার যত কিছু গ্লানি, পদদলিতের যত চিত্তক্ষোভ, নিরুপায়ের নিষ্ফল দীর্ঘশ্বাস, আর নারীজীবনের নিদারুণ ব্যর্থতার চেহারা দেখে যেন ভাগ্যদেবতা আপন কুকীর্তিতে শিউরে ওঠেন; যেন তাঁর সমস্ত কল্যাণসৃষ্টি নিজেরই কাছে নিরর্থক মনে হয়; যেন কল্প-কল্পান্তরের কোটি-কোটি নরকঙ্কাল সহসা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন করে; যেন তাঁর আসন টলে ওঠে দরিদ্রের ভগ্ন হৃদয়ের অভিশম্পাতে!

কিন্তু চঞ্চল হ'লে রেণুর চলবে না। অপ্রত্যাশিত দেবতার আবির্ভাব ঘটবে না তাদের এই ভাঙা ঘরে, সে জানে। এটা পৌরাণিক মায়ালোক নয়, রূঢ় বাস্তবতায় ভরা এই ঘরকন্না। দাদা শয্যাশায়ী, কতদিন অকর্মণ্য থাকবে বলা কঠিন। তা'র পথ্য, তা'র ঔষধ। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘর ভাড়ার টাকা। এর সঙ্গে তার নিজের প্রাণধারণের প্রশ্ন আছে। তাদের এক বছর আগেকার কেনা পুরনো জামা-কাপড়, সেগুলিতে এখন আর সম্ভ্রম রক্ষা অসম্ভব,—অথচ তা'র ব্যবস্থার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। প্রতিদিন চা'ল আসে, আজ আসেনি। ঘরে একটু নুন, দুটি ছোট আলু, আর কয়েকটি দানা ডাল,—এই হোলো ভাণ্ডারের অবশেষ। এটা অভাবের সুলভ বর্ণনা নয়, মধ্যবিত্তের দুর্দশার পুরাতন চিত্র নয়, কিন্তু এই অভাব রেণুর নিত্য। অশোক সক্রিয় থাকলে এগুলি ঢাকা পড়ে, রেণু একটু অন্যমনস্ক হয়, এই মাত্র। আজ আবার সেই নিত্য রিক্ততার উপরকার আবরণ স'রে গেছে, আর কিছু নয়।

হঠাৎ খোলা দরজার কোণে কিসের যেন আওয়াজ হোলো। সহসা মনে হোলো, ভাঙা বারান্দার পাঁচিলের গা বেয়ে প্রকাণ্ড গোখরো সাপ হিস হিস শব্দে ভিতর দিকে এগিয়ে আসছে। সচকিত হয়ে রেণু স্বল্প অন্ধকারের ভিতর থেকে মুখ তুলে তাকালো। দেখলো, ক্ষ্যান্তর মা তাকে হাতছানি দিয়ে চাপা গলায় ডাকছে, দিদিমণি, অ দিদিমণি ?

রেণু উঠে এলো দরজার কাছে। চৌকাঠের বাইরে এসে বললে, কি, ক্যান্তর মা ?

রোগীর কানে না ওঠে, এমনি মৃদু গলায় ক্যান্তর মা বললে, সব শুনেছি দিদিমণি, দাদাবাবু ভালো হয়ে যাবে, ভয় কি ? জেগে আছে বুঝি ?

না, ঘুমোচ্ছেন।

বেশ, বেশ,—রুগী ঘুমোলেই আদ্ধেক অসুখ ভালো।—তারপরেই হাসিখুশি মুখে ক্যান্তর মা বললে, তুমি একবারটি এদিকে এসো ত' দিদিমণি, এই সিঁড়ির কাছে।

রেণু বললে, কেন ক্যান্তর মা ?

একগাল হেসে ক্যান্তর মা বললে, ঠাকুর এসেছেন, একটা পেন্নাম করবে এসো।

ঠাকুর! ঠাকুর কে ?

ওমা, তোমার যেন কিছুই মনে থাকে না, বাছা। ও-বাড়ীর বাবুকে এনেছি, তিনি দেখা করবেন তোমার সঙ্গে।

সন্ত্রাসে রেণুর বুকের ভিতরটা যেন ধকধক ক'রে উঠলো। বন্যহরিণী বাঘের গন্ধে যেমন থমকে অন্যপথে পালায়, তেমনি ক'রে সে পিছু হটে ঘরের ভিতরে এলো। কম্পিত কণ্ঠে বললে, না, না, দরকার নেই দেখা ক'রে। তুমি যাও, ক্যান্তর মা।—ব'লে ছুটে এসে নিদ্রিত অশোকের কম্বলচাপা দু'খানা পা সে আঁকড়ে ধরলো। তারপর অধীর উদ্বিগ্ন রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলো, দাদা, দাদা শুনছ ? কে এসেছে দেখো ত ?

আড়ষ্ট মৃদুস্বরে অশোক অতি কষ্টে সাড়া দিল। শীর্ণকণ্ঠে বললে, কে এসেছে, রেণু ?

বাঁচলো, বাঁচলো রেণু। যেন সর্বনাশ থেকে বাঁচলো। যেন দস্যুর হাত থেকে অপ্রত্যাশিত পুরুষ এসে তাকে রক্ষা করলে। তৎক্ষণাৎ সে হাসলো উচ্চ উল্লোলে পাগলিনীর মতো, দেউলিয়ার মতো। তারপরেই সে হাসি থামালো। থামিয়ে অসম্বৃত কণ্ঠে বললে, তুমি জেগে আছ ? না আসেনি কেউ—কেউ আসেনি। আমার ভয় করছিল।—তোমাকে একটু দুধ দেবো, দাদা ?

হ্যাঁ, দে।

রেণু তৎক্ষণাৎ উঠলো। দ্রুত পদে গিয়ে ভিতর থেকে দরজাটা সে বন্ধ ক'রে দিল। তারপর ফ্লাস্ক থেকে কলাইয়ের গেলাসে একটু গরম দুধ ঢেলে অশোকের অধরের কাছে ধরলো। তা'র ঘর্মাক্ত হাতখানা তখন অধীর অস্থির আতঙ্কে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে।

অশোক সেরে উঠছে অল্প অল্প ক'রে। মাথার ঘা শুকিয়ে এলো। চোখের তারার রক্তের ছোপ দেখা গিয়েছিল, সেটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। জ্বর নেই। গায়ের ব্যথা কমেছে। বিছানা ছেড়ে সে এখন উঠতে পারে।

মণিমোহন ইতিমধ্যে বার কয়েক এসেছিল। সুধু হাতে একদিনও আসেনি। কোনোদিন ফল, কোনোদিন মেওয়া, আবার কোনোদিন বা তাদের বাড়ীতে তৈরী টাটকা নোন্‌তা খাবার নিয়ে সে এসেছে। যখনই আসে, একখানা চিঠি আনে। ইংরেজিতে লেখা চিঠি,—সুন্দর সহৃদয় চিঠির মর্ম। অশোক চিঠির জবাব দেয়। কিন্তু তা'র ঘরে সব সময় কাগজ কলম থাকে না। সুতরাং ওই চিঠিরই নিচেকার শাদা অংশটুকু ছিঁড়ে নিয়ে আর মণি-মোহনের ফাউণ্টেন পেনে সে জবাব লেখে। সুন্দর তা'র হাতের ইংরেজি হরপ, ভাষাটি পরিচ্ছন্ন, বক্তব্যটি সরল মর্মস্পর্শী। চিঠি দিয়ে মুখ তুলে হাসি-মুখে অশোক বলে, ঠিক লোকের হাতে চিঠিখানা পড়বে ত? মণিমোহন যাবার সময় ব'লে যায়, নিশ্চয়ই। আপনি একটু হাঁটতে পারলেই কিন্তু আমাদের বাড়ী আসতে হবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। শিগগিরই হাঁটতে পারবো, পারলেই যাবো।

মণিমোহন চ'লে যায়। অশোক তার পথের দিকে চেয়ে ভাবে, ফুলের মতন সুন্দর, ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতন। উদ্বেল আনন্দে আর অসীম কৃতজ্ঞতায় তার ক্লান্ত দুই চোখে যেন আবার সুখের তন্দ্রা নেমে আসে। বাইরের রৌদ্রোজ্জ্বল স্বচ্ছ নীলাকাশ তা'র জানালার কাছে এসে যেন মধুর হাসিমুখে বন্ধুর মতো তা'র শুভকামনা ক'রে যায়।

তা'র মনে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। দীর্ঘ পনেরো দিন ধ'রে তা'র এই সংসার কি ভাবে চললো, কোথা থেকে আসছে ঔষধ পথ্য, সকাল না হ'তে

কেমন ক'রে রেণু তার মুখের কাছে এনে ধরে গরম নিমকি-মোহনভোগ-চিঁড়ে-ভাজা-গরম দুধ, কেমন ক'রে রেণুর মুখে ভাত জোটে, ঘরভাড়াই বা সে এমাসে কেমন ক'রে জোগালো,—এই সব প্রশ্ন সম্ভবত ক্লান্তিকর ব'লেই তার মুখে আর আসতে চায় না।

কিন্তু দীর্ঘ পনেরোটি দিন তাদের পক্ষে যেন অনন্তকাল। প্রশ্ন সে করেনি, খোঁজ খবর সে নেয়নি—কিন্তু চেয়ে চেয়ে সে দেখেছে সহোদরাকে। কখন সে স্নান করে, কখন সে দুটি ভাত মুখে দেয়, কখন একটু বিশ্রাম নেয়—অশোকের চোখে পড়েনি। কী কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে তপস্বিনীর সংগ্রাম চলছে অহোরাত্র, সে ত' বোঝে! পৃথিবীর সর্বপ্রকার দুষ্টশক্তি চারিদিক থেকে আঘাত ক'রে তাকে চূর্ণ করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বাঁচার জন্য সংগ্রাম করছে রেণু প্রাণপণে,—একথা সে ত জানে!

দিন কয়েক পরে সে ডাকলো, রেণু, খেতে দিবিনে?

রেণু সাড়া দিল না, কিন্তু মিনিট দুই পরে চটা-ওঠা কলাইয়ের থালায় ক'রে নরম-গরম ভাত অশোকের কোলের কাছে এনে নামালো। আনন্দোজ্জ্বল মুখে অশোক বললে, গরম ভাতে মাখন? পেলি কোথায় রে?

মাখন একটু না খেলে তুমি সেরে উঠবে কেমন ক'রে?

তা বটে। কিন্তু আলুভাজা, মুগের ডালের ঝোল, কচি মাছ, ঘন দুধ—এসব?—অশোক মুখ তুলে বললে, ওরে বাবা, মেঘের মতন মুখ তোর, দেখলে যে ভয় করে রে?

রেণু কেবল বললে, খেয়ে নাও ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অশোক হাসিমুখে বললে, কিন্তু তোকে দেখলে যে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তুই ভারি রোগা হয়ে গেছিস, রেণু।

রেণু মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল।

একান্ত তৃপ্তির সঙ্গে আহার করতে করতে অশোক বললে, রাগ তোর হবারই কথা। হিন্দুস্থানী লোকটার গালাগাল খেয়ে চুপ ক'রে থাকলেই হয়ত তুই খুশী হতিস। কিন্তু কি জানিস, রোদে তেতে-পুড়ে হঠাৎ সেদিন মাথাটা

গরম হয়ে গেল। অনেক সহ্য করেছি, সেদিন আর সামলাতে পারলুম না।—ওরে রেণু, আর একটু নুন দিয়ে যা ভাই।

একটু নুন এনে রেণু তার পাতের ওপরে দিল। অশোক বললে, এই দেখনা, বাবার দরুণ হাজারটা টাকা একবার হাতে এলে হয়। সব গুছিয়ে নেবো, ভয় কি? সব বিপদেরই একটা ভালো দিক্ আছে। সেটা কি জানিস, বিপদ কখনো দাঁড়ায় না, চলে যায়।

রেণু বললে, আর একটু ডাল এনে দেবো তোমাকে?

দে, আছে ত? কিন্তু তোর জন্যে রেখে তবে আমায় দিবি, নৈলে ভাঙা মাথা আবার ঠুকে ঠুকে ভাঙবো ব'লে দিচ্ছি।

রেণু রান্নাঘর থেকে ডাল এনে তার পাতে দিল। বললে, ভাত আরো দুটি দেবো, ব'সে বসে খাও।

অশোক বললে, তা খাচ্ছি, কিন্তু তুই কি সাংঘাতিক মেয়ে বল্ ত? এতদিন ধরে এত ওষুধ-পথ্যি কেমন ক'রে জোটালি রে? তোর কাছে ত' একটি পয়সাও জমা ছিল না?

ছিল।—রেণু বললে, আনা তিনেক পয়সা।

ওরে পোড়ারমুখি, তিন আনায় কুড়িদিন রাজভোগ খাওয়া যায়? বল্ না শুনি কি ভাবে তুই চালাচ্ছিস?

রেণু সহসা একটু থতিয়ে গেল। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে মলিন মুখে একটা মিথ্যা কথা বললে, তোমার মণিমোহনের কাছে টাকা ধার করি, যখনই সে আসে।

বলিস কি?—অশোক স্তব্ধ হয়ে গেল। পরে বললে, টাকা! টাকা ধার করতে গেলি পরের কাছে? ওরা যে বড়লোক, ওদের কাছে দয়া প্রার্থনা পাপ। আমাকে চিঠিতে লিখেছে, যে কোনোদিন যে কোনো সময়ে গাড়ী পাঠাবো, আপনি আসবেন। আমি জবাব দিলুম, মোটরে চড়া আমি পছন্দ করিনে, জীবনযাত্রায় বিলাস আমার কাছে ঘৃণ্য। শরীর একটু সারলে নিজেই আমি হেঁটে যেতে পারবো।—তুই টাকা ধার করলি তাদের কাছে?

রেণু চুপ ক'রে রইলো।

অশোক আবার উৎসাহের সঙ্গে বললে, কিন্তু যাই বল্, তোর বুদ্ধির কাছে

আমি হার মানছি। তুই না থাকলে আমি থাকতুম কোথায়? একটি বছর—পুরো একটি বছর অদ্ভুত কৌশলে আর ধৈর্যের সঙ্গে চালিয়ে এলি—

রেণু নতমুখে চ'লে গেল।

দুরবস্থা, অসম্মান, বিপদ—কিছুই তোকে হার মানাতে পারলো না—অশোক বলতে লাগলো, অথচ কোনদিন সম্পূর্ণ উপবাস করিনি। কিছু না কিছু তুই নিশ্চয় মুখে তুলে দিয়েছিস। কত উৎপীড়ন করেছি তোকে—মুখ বুজে মায়ের মতন সয়েছিস। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে, আশা আছে, বুঝি কিছু ভরসাও আছে। বাবার টাকাটা পাই, দেখবি ভালো বাড়ীতে থাকবো, ভালো ক'রে ব্যবসা করবো—এই সব দুর্দশা আমি ঘোচাবো। বিশ্বাস করছিস নে, কেমন?

দুটি ভাত এনে রেণু তা'র পাতে দিল। অশোক মুখ তুলে পুনরায় বললে, আর—আর তুই যা চাইবি তাই দেবো। সিল্কের শাড়ি, সোনার চুড়ি,—আরে শোন্, শোন্, মুখপুড়ি, রাগে একেবারে ঠক্ঠক্ করছিস। দেখবো তখন বর্ষার পরে শরতের রোদ ওঠে কিনা?

ফিরে দাঁড়িয়ে আর্তকণ্ঠে রেণু কেবল বললে, আমি কি তোমার কাছে কিছু চেয়েছি, দাদা?

হো হো ক'রে অশোক হেসে উঠলো। বললে, তুই চাইবি, সেই মেয়ে তুই! বাঙালীর মেয়ে জোর ক'রে কি কিছু চাইতে জানে? আমি বলে রাখলুম, সৌভাগ্য এসে তোরই পায়ের কাছে আশ্রয় চাইবে, তুই দেখে নিস।

হঠাৎ এক ঝলক তীব্র হাসি রক্তবমির মতো রেণুর মুখের কাছে উঠে এলো। কিন্তু চাঞ্চল্য দমন ক'রে সে ফিরে চলে গেল।

খেয়ে দেয়ে হাত ধুয়ে অশোক একখানা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়লো। রেণু স্নান ক'রে এসে সারাদিনের মতো আড়ালে গিয়ে রইলো।

দাদাকে খাওয়ানোটাই তার কাছে বড়, তা'র কাছে ধর্ম। রোগী সুস্থ হোক, সক্রিয় হোক, নিজের পরিণামের জন্য তা'র চিন্তা নেই। আকাশ আগুনে রাঙা হয়ে উঠুক, তার বুকের আগুনে পৃথিবীর মুখ ঝলসে যাক্, তা'র জীবন বিদীর্ণ ক'রে হলাহল উন্মুখর হয়ে উঠুক, কিন্তু তার ওই স্নেহের ধন যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। যেন একদিন তা'র ওই সহোদর বাঙালী মেয়ের বুকের

আগুন থেকে মশাল জালিয়ে দিকদিগন্তব্যাপী অগ্নিবিপ্লবে চারিদিক ছারখার ক'রে দেয়। আজকে তার অধীর অন্তরকে দুরন্ত শিশুর মতো সে ঘুম পাড়িয়ে রাখুক।

রান্নাঘরে এসে সে দাঁড়ালো।—দাদার আহার সামগ্রী থেকে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত ছিল, সেগুলি একত্র ক'রে অম্লানবদনে সে জান্‌লা গলিয়ে নীচেকার কানাচের আঁকুড়ে ফেলে দিল। কেন ফেলে দিল, সেকথা বিচার করবার সময়ও তা'র ছিল না। তারপর নিজের হাঁড়ির ঢাকাটা সে খুললো। দুদিনের পুরনো এলানো ভাত, উপরের দিকটা ফেনা হয়ে উঠেছে, দুর্গন্ধে বমি আসে। কিন্তু সেই কদন্নে মৃত্যুযন্ত্রণা নেই, এই হোলো একমাত্র সান্ত্বনা!

পাঁচ

চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর উপর প্রকাণ্ড ফটকওলা বাড়ির নিচে এসে অশোক দাঁড়ালো। শরীর তা'র সুস্থ, কাপড় চোপড় ওরই মধ্যে ভদ্র। মাথায় ব্যাণ্ডেজ নেই, কেবল পিছন দিকে ঘায়ের ওপর ছোট পটি লাগানো। ক্ষত প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

সুমুখেই চাকর বাকরেরা ছিল। ওদেরই মধ্যে যে লোকটি মোটর ড্রাই-ভার, সে অশোককে দেখেই এগিয়ে এলো,—আসুন, আসুন—

ভিতরে খবর যেতেই আগে সুচরিতা অর্থাৎ রায় বাহাদুর হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া পত্নী, যাঁকে অশোক মা বলে ডেকেছিল আঘাত পাওয়ার দিনে,—তিনি বেরিয়ে এলেন। এসে বললেন, এসো, বাবা এসো। ওঁর শরীরটা ভালো নেই, এবেলা বাড়ীতেই আছেন। ভালোই হোলো।— থাক্ থাক্ প্রণাম করতে হবেনা বাবা, হেঁট হ'লে তোমার মাথায় লাগতে পারে।

আপনারা সবাই ভালো আছেন?—নিতান্ত সৌজন্যের সঙ্গে অশোক বললে।

হ্যাঁ, বাবা, আছি এক রকম।—তুমি ওপরে উঠতে পারবে ত? কষ্ট হবে না?—সস্নেহ কণ্ঠে সুচরিতা প্রশ্ন করলেন।

অশোক বললে, আজ্ঞে না, আমি এখন বেশ ভালো।

উপরের সিঁড়িতে ওঠবার সময় উপর দিক থেকে জুতোর খটখট শব্দ নামতে লাগলো। মা হেসে বললেন, কে এসেছে, হেনা দেখেছিস ?

একটি তরুণী মাঝের সিঁড়ি অবধি নেমে এসে থম্‌কে দাঁড়ালো। হাসিমুখে নমস্কার ক'রে বললে, আপনি ? কতক্ষণ ? ভালো আছেন ত একটু ?

অশোক হেসে সবিনয়ে বললে, আপনাদের তদারকে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠেছি। মণিমোহন কোথায় ?

সে খেলতে গেছে, একটু বাদেই আসবে। চলুন আপনি ওপরে।

সকলেই অশোককে সাদর স্নেহে ওপরে নিয়ে গিয়ে তুললো। রায় বাহাদুর বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে ব'সে কতকগুলি চিঠিপত্র দেখছিলেন। অশোককে দেখে খুশি হয়ে নিজের হাতেই একখানা চেয়ার টেনে দিয়ে বললেন, বসো বাবা। মাথার ঘা কিছু সেরেছে দেখছি। তোমার জন্মে আমরা সবাই খুবই ব্যস্ত ছিলুম। আমি আশা করবো, এবার থেকে তুমি ওই কাগজ-বিক্রীর কাজ আর করবে না। তোমার মতন একজন ভালো গ্রাজুয়েটের এই রকম দুরবস্থা, আমাদের সমাজের পক্ষে কত বড় কলঙ্ক, তাই এ ক'দিন ভাবছিলুম।

অশোক বিনীতভাবে তাঁর কথাগুলি শুনলো। পাশে মা বসলেন, এপাশে হেনা বসলো। ওপাশে বসলেন এ বাড়ির প্রৌঢ় গৃহশিক্ষক।

সুচরিতা বললেন, আমাদের সেই যে বাধা পড়েছিল, আর আমরা বনগাঁর বাগানে যাই নি; তুমি ভালো হ'লে তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই যাবো, এই আমরা স্থির করে রেখেছি বাবা।

হেনা তার দুই কানের দুল দুলিয়ে বললে, আপনি এমন শান্ত মানুষ, অথচ আপনার সঙ্গে ওদের মারপিট বাধলো, এইটিই আশ্চর্য।

হরিমোহন বললেন, আজকের কোনো ছেলেই শান্ত নয় মা, তা'রা এক একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি!

অশোক একবারটি তাঁর প্রতি মুখ তুলে তাকালো। কিন্তু তরুণ রক্তাভ মুখ সে তখনই নামিয়ে নিল।

সুচরিতা বললেন, চলো বাবা, আমরা ওদিকের ঘরে ব'সে গল্প করিগে। হেনা, তুই চট্ করে গিয়ে তোর চায়ের নেমন্তন্ন সেরে আয়।

হেনা হেসে বললে, বরং তুমি চট্ করে গিয়ে এবেলাকার রান্নার ব্যবস্থা ক'রে এসো মা, অশোকবাবু ততক্ষণ একটু বিশ্রাম নিন্।

অশোককে নিয়ে মা ও হেনা আবার এ-মহলে এলেন। সুচরিতা বললেন, নেমন্তন্নে তুই যাবিনে ?

না গেলেও চলে। অশোকবাবু না এলে বরং একবার যেতুম।

সপ্রতিভ অশোক বললে, আমার জন্মে কেন থাকবেন আপনি ? তার চেয়ে একবার গিয়ে ঘুরেই আসুন, আমি বসি।

ধন্যবাদ, আপনি ব্যস্ত হবেন না—হেনা তাকে থামিয়ে দিল।

মা গেলেন ভাঁড়ারের দিকে, অশোক এসে বসলো হেনার উপরতলাকার ড্রইংরুমে। দুজনে মুখোমুখি বসলো। অশোকের দাড়িটা কামানো নয়, জামায় বোতাম নেই, কাপড়-চোপড় যেমন-তেমন। হেনা হেসে বললে, আপনি বুঝি দেখছেন চারিদিকে, আর ভাবছেন আমরা বড়লোক, কেমন ?

অশোক হেসে বললে, না। অনেকদিন আগে তখন কলেজে পড়ি, একটা সিনেমার ছবিতে দেখেছিলুম, একটি বন্য মেয়েকে এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে আনবার পর মেয়েটি অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে ভাবছে, সে একটা অদ্ভুত সভ্যতার মধ্যে এসে পড়েছে।

হাসিমুখে হেনা বললে, যাক, বাঁচলুম। এতক্ষণে আপনার মুখে কথা ফুটলে।

অশোক কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর নতমুখেই বললে, আপনাদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, সেই কথাই আজ আমি বিশেষ ক'রে জানাতে এসেছি।

তা'র সলাজ ভাবটি হেনার খুব ভালো লাগলো। কথা কইতে গেলে অশোকের মুখে চোখে কেমন একটি মানসিক কৌমার্য ভেসে ওঠে, যেটি আধুনিক তরুণ যুবকের মধ্যে দুর্লভ। রক্তাভ মুখে নবর সুন্দর শ্মশ্রুরেখা, আয়ত চোখে আজও কিশোর-স্বপ্ন-ভঙ্গীটি কৃত্রিমতাদুষ্ট নয়। আধুনিক মেয়ে হেনা, যার দৃষ্টি ধারালো অন্তর্ভেদী ; আধুনিক ছেলে অশোক, কলকাতার আবহাওয়ায় মানুষ,—কিন্তু যেন এ যুগের দাগ পড়ে নি।

বললে, কৃতজ্ঞতা পরের কথা। আপনি আমাদের সেদিন চমকে দিয়েছিলেন

কিন্তু। খবরের কাগজ বিক্রী করে একজন উঁচুদরের গ্রাজুয়েট—এইটিই সেদিনকার রোমান্স। সে যে কী বিস্ময় তাই বাবাকে সেদিন বলছিলুম! বাস্তবিক, গল্পই শুনেছি, চোখে দেখি নি কখনো। আমার চিঠিগুলো প'ড়ে কী আপনার মনে হোতো, অশোকবাবু?

মুখ তুলে হাসিমুখে অশোক বললে, সে ত আপনাকে লিখে জানিয়েছি।

তা জানিয়েছেন—হেনা বললে, কিন্তু আপনার চিঠিতে কোথাও অস্পষ্টতা নেই, তাই প্রত্যেকটা কথা যেন আঘাত করে। যতই শান্তশিষ্ট মানুষ আপনি হোন্ না কেন, আপনি কিন্তু নিতান্ত সাদাসিদে লোক নন্; বেশ কড়া-কড়া কথা আপনার।

অশোক বললে, কিন্তু গরীবের পক্ষে এগুলো ত বেমানান্!

আপনার পক্ষে নয়, এই আমার ধারণা। গরীবরা আপনার মতন মন নিয়ে জন্মায় না। প্রত্যেক চিঠিতে আশা করেছি আপনি ভালো কথা বলবেন—কিন্তু আশা করা মিথ্যা হয়েছে।

অশোক আবার হাসলো।

এম-এ পড়া ছাত্রী হেনা তা'র হাসির তাৎপর্য বুঝলো। বললে, ভালো কথা মানে মিছে কথা নয়, অশোকবাবু। জানি বৈকি, মিছে কথাতেই লোকের মন ভোলানো সহজ।

অশোক তাড়াতাড়ি বললে, কিন্তু আমি ত সত্য কথাই বলবার চেষ্টা করেছি, মিস চাটার্জি।

হেনা হেসে বললে, সত্য বলেছেন, কিন্তু সুন্দর ক'রে বলেন নি, সেই ত দুঃখের কথা! আপনাকে নিষ্ঠুর বলছি কি বিনা কারণে? আচ্ছা অশোক-বাবু, আপনার ভগ্নীকে আনলেন না কেন?

অশোক বললে, তিনি এখানে এলে খুশি হতেন না।

বেশ, তাহলে আমিই একদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হবো!

তাতে তিনি আরো বেশী আঘাত পাবেন।

বিস্মিত হেনা বললে, কী বলছেন আপনি?

অশোক বললে, ঠিকই বলছি। দারিদ্র্য আমার কাছে অহঙ্কার, কিন্তু রেণু মনে করে, দারিদ্র্যটা মানুষের সব চেয়ে বড় লজ্জা, মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু।

আমি ঠিকই জানি, আপনি তার ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করবে। মনে করবে, আপনি তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে গেছেন।

নেমন্তন্ন করলেও তিনি আসবেন না ?

না। সে জানে ছোটয়-বড়য় সামাজিক আদান-প্রদান হয় না। কিন্তু ক্ষমা করবেন, এ আলোচনা ভারী অপ্রিয়।

হেনা একটু থতিয়ে বললে, কিন্তু আমাদের আপনারা বড় লোক ঠাউরে ছোট ক'রেই রাখতে চান ?

অশোক কুণ্ঠিত ভাবে বললে, বড়লোকের কথা গল্পে শুনেছি, তাদের ভয় করেছি, কিন্তু তাদের ভাল ক'রে জানিনে। তারা ভালো কি মন্দ, ছোট কি বড়, তাও আমাদের জানা নেই। জানি শুধু তারা বড়লোক।

উত্তর দেবার আর কিছু রইলো না। অথচ এর পরে আর এখানে থাকাও অশোকের পক্ষে যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। এখানে স্বাচ্ছন্দ্য নেই, স্বাধীন কল্পনা এখানে ছোটে না। আড়ষ্ট অপাংক্তেয় অসুস্থ হয়ে এখানে দীর্ঘকাল থাকা যন্ত্রণাদায়ক। এরা যেন সবাই মিলে তাকে স্নেহ করছে, কৃপা করছে, অপ্রাপ্য সম্মান দিতে বসেছে। তার মতো নিঃস্ব ব্যক্তিকে দিয়েও এরা যেন সই করিয়ে নিতে চায় যে, এরা ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাকে এ-মহল থেকে ও-মহল ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে, তাদের কত সম্পদ, তারা কত ঐশ্বর্যের অধিকারী। তাদের বাড়িখানা বড়, গাড়ীখানা নতুন, তাদের এতগুলি গদিআঁটা উঁচু আসন, মেঝেয় কার্পেট, চায়না গ্লাশ, দেয়ালে বিদেশী আঁকা ছবি, কাঁচের ঝাড়। তাদের অনেক আছে।

অশোকবাবু ?

অশোক সচকিত হয়ে তাকালো। হেনা বললো, আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে যাবেন ?

অশোক বললে, কোথায় বলুন ত ?

ভয় নেই, অনেক লোকের মাঝখানে নিয়ে যাবো না আপনাকে, এই একটু এদিক-ওদিকে—একা একা—

কিন্তু আমাকে যে এক্ষুণি ফিরতে হবে! রেণু একা আছে।

হেনা বললে, তা হ'লে যাবার সময় আপনাকে আমিই একটু এগিয়ে দেবো ?

কেন এই আগ্রহ অশোক বুঝতে পারলো না। এটা কি প্রলোভন ? এটা কি পথের কুকুরের মুখের কাছে মাংসখণ্ড নাচানো ? এরা বড়লোক, হয়ত এদের এই পেশা। এরা হয়ত লুব্ধ গরীবকে এনে সুসজ্জিত সুন্দর আসবাব আর সুবেশা সুন্দরী নারীকে এক সঙ্গেই দেখায়। ধনসম্পদ এবং নারীসম্পদ এদের কাছে একই মূল্য পায়। নারীর প্রাণকে এরা হয়ত স্বীকার করে না, নারীকে তাদের ঐশ্বর্যের উপকরণ মনে করে। কিন্তু কেন যাবে হেনা তার সঙ্গে ? কেন এই ভালো লাগালাগি ? হয়ত ধনীর কন্যার চোখে সে একটা নতুন খেলনা, হয়ত সে কৌতুকের বস্তু, হয়ত বা সে এই তরুণীর খেয়াল-খুশির উপাদান। একাকী পথে যেতে কিছু চূর্ণ হাসি, কিছু কথা-কৌতুকে রঙিন, কিছু আলাপ-হৃদয়ের সুরে সরস। এরপরেই ত শূন্য, শুধু শূন্য। কেবল অবারিত পথ তা'র চোখের সামনে অজগরের মতো প'ড়ে থাকবে তৃষ্ণার দীর্ঘ জিহ্বা মেলে দিয়ে।

কিন্তু উত্তর দেবার আগেই ঘরের দরজায় সুচরিতার আবির্ভাব ঘটলো। তাঁর পিছনে পিছনে চাকর এলো প্রচুর আহারের আয়োজন নিয়ে। অশোক কুণ্ঠিত ও আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এতক্ষণ ধ'রে চলেছিল প্রলোভনের পালা, এবার এলো বিদ্রূপের পালা।

সুচরিতা বললেন, প্রথমেই তোমাকে বলে রেখেছি বাবা, আমাদের বাগান যাওয়া হয়নি তোমারই জন্যে, সুতরাং এবার যেদিন যাওয়া হবে, তুমি সঙ্গে যাবে, কেমন ?

হেনা হাসিমুখে বললে, আমাদের সব কথাতেই ইনি ভয় পাচ্ছেন মা। তুমি ওঁকে বলো যে, সেখানে বাঘ-ভাল্লুক, যক্ষ-রক্ষ, ভূত-প্রেত কেউ নেই।

নতমুখে হেসে অশোক বললে, না, আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনারা কবে যাবেন, বলুন ?

সুচরিতা বললেন, কর্তাকে জিজ্ঞেস করলুম। উনি বললেন, বেশ ত, এই রবিবারেই মন্দ কি ? তোমার কিছু অসুবিধে হবে, অশোক ?

সকুণ্ঠ সঙ্কোচে অশোক বললে, কিন্তু এই রবিবারের মধ্যে আমি হয়ত গাড়ীভাড়া যোগাড় করতে পারবো না।

গাড়ীভাড়া!—হেনা বিস্মিত হয়ে তাকালো।

অধিকতরো বিস্ময়ে সুচরিতা বললেন, গাড়ীভাড়া কী বাবা! তুমি ত যাবে আমাদের সঙ্গে!

মুখ তুলে অশোক বললে, আমার আলাদা গাড়ীভাড়া লাগবে না বলছেন?

মা ও মেয়ে একবার পলকের জন্য দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর দুজনেই হেসে উঠলেন উচ্চকণ্ঠে। হাসি থামলে হেনা বললে, আচ্ছা আপনি এবার একটু খান্ দেখি? ভয় নেই, আমরাও খাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

চাকর তিনটে টিপাই সাজিয়ে দিয়ে গেল। সুচরিতা খাবারগুলি তিনভাগ ক'রে দিলেন। দিয়ে বললেন, সেই দিন থেকে ভেবে রেখেছি তুমি ভালো হয়ে আমাদের এখানে এলে আমরা এক সঙ্গে ব'সে খাবো।

কথাটা মিথ্যা নয়। হেনা বললে, জানেন অশোকবাবু, এ-বাড়ি থেকে যেদিন সন্ধ্যায় মা আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিলেন, মণিমোহন আপনাকে নিয়ে গেল······রাত্রে মায়ের কী কান্না!

সুচরিতা বললেন, এখন আর সে আলোচনা থাক্ মা।

হেনা একখানা টোষ্ট তুলে নিয়ে তাতে কামড় দিল। কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠলেন দুজনে, আহারের প্রতি অশোকের কোনো আসক্তি নেই। সে যেন অটল, স্তব্ধ। হেনা বললে, খেতে আরম্ভ করুন, অশোকবাবু?

আজ্ঞে না—থাক।

সুচরিতা বললেন, তোমার জন্যে যে সব তৈরী ক'রে আনলুম, একটু কিছু খাও বাবা?—তিনি মিনতি জানালেন।

হঠাৎ অশোকের চোখে ভেসে উঠলো, সন্ধ্যার অন্ধকারে রেণুর সেই কদন্নের গ্রাস মুখে তোলার বীভৎস দৃশ্যটি। আর্তকণ্ঠে সে বলে উঠলো, ক্ষমা করবেন আমাকে। একমাস ধ'রে আপনাদের অনেক খেয়েছি, অনেক দিয়েছেন আপনারা আমাকে জানি, আজকের এই আচরণে আপনারা ব্যথা পাবেন, হয়ত বা অসম্মানিত বোধ করবেন। কিন্তু—কিন্তু আমি পারবো না, আজ আমাকে যেতে দিন। এই ব'লে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

পুনরায় বললে. আমি এসেছিলুম কৃতজ্ঞতা জানাতে, খেতে নয়, আমি ঋণী, সেই কথা

আহত কণ্ঠে হেনা বললে, কিন্তু এটা ত অসামাজিক, অশোকবাবু।

স্তম্ভিত নির্বাক দুই নারীর মুখের উপর অশোক বললে, অপরাধ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আজকের জন্য, কেবল এই সময়টির জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন, যেতে দিন—

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে অশোক সটান নেমে গেল। কিন্তু ঢোকার রোয়াক পেরিয়ে ফটকের কাছে যেতেই বাধা পড়লো। মণিমোহন ছুটে এসে তাকে বললে, চুপি চুপি এসে বুঝি পালাতে দেবো ভাবছেন ?

আর্তস্বর অশোকের মুখ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছিল। উদ্গত অশ্রু রোধ ক'রে সে বললে, এই ত, তোমার জন্যেই এতক্ষণ ব'সে ছিলুম ভাই। এবার আমাকে ছেড়ে দাও।

মণিমোহন তার হাত চেপে ধ'রে বললে, কখ্খনো ছেড়ে দেবো না। আপনি পালাবেন বুঝি মনে করেছেন ? মা-দিদি না হয় আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন, আমি বুঝি আপনাকে যেতে দেবো ? এতদিন বুঝি অমনি-অমনি আপনার কাছে যাতায়াত করলুম ?

সুকুমার কিশোরের চক্ষু আনন্দে-আগ্রহে ঝকঝক করছে। অশোকের মন টলে উঠলো। বললে, আমি ত বলে গেলাম ভাই, আসছে রোববারে আবার আসবো'!

তা হবে না, অন্তত এখন একবার আমার পড়ার ঘরটায় আপনাকে যেতে হবে। আজ আমার ছুটি, পড়বো না, আপনাকে নিয়ে একটুখানি লুডো খেলবো।

আমি লুডো খেলা জানিনে, মণিমোহন।

মণিমোহন বললে, না জানলেও খেলা চলে, ও খেলাটার এই মজা। তা ছাড়া আপনাকে খানিকক্ষণ অন্তত ধ'রে রাখতে পারবো ত ?

অশোক বললে, কিন্তু একটা খবরের কাগজওয়ালাকে নিয়ে তোমাদের এই আতিশয্য কি দেখতে ভালো ভাই ?

সরল চক্ষু তুলে মণিমোহন বললে, আপনি কাগজওয়ালা? কিন্তু আপনি যে আমার দাদা।

কেমন ক'রে?

মা বলেছেন। আমরাও জানি।

মা সত্য বলেন নি, তোমরাও জানো না।

মণিমোহন বোধ করি কিছু বিপন্নভাবে চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, দিদি বুঝি কিছু বলে নি আপনাকে?

অশোক বললে, কি বলো ত?

গত বছর এমন সময়ে আমার দাদা মারা গেছেন টাইফয়েডে তিনি দিদির চেয়ে বড়। অনেকটা যেন আপনার মতন দেখতে ছিলেন তিনি।

অশোক কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়ালো। তারপর বললে, আচ্ছা চলো, তোমার পড়ার ঘর দেখে আসি।

ভিতর মহলে কেমন ক'রে খবর গিয়েছিল। সুচরিতা আবার হাসিমুখে নেমে এলেন। তিনি রাগ করেন নি। মণিমোহনের পড়ার ঘরে এসে হাসি-মুখে অশোকের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আগে বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন পেরেছি অশোক। আজ থেকে তুমি নিজের ইচ্ছেয় আসবে-যবে, ক্ষিদে পেলে চেয়ে খাবে, কেমন? তোমাকে বুঝতে না পেরে হেনার চোখেও জল এসেছিল বাবা।

অশোক বললে, আমিও আগে কিছু জানতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করুন।

রবিবারে বাগান-যাত্রার ব্যাপারে অশোক অবশ্য উপস্থিত হোলো। কিন্তু ধনীলোকের বনভোজনের চেহারাটা কিরূপ সে বর্ণনাটা অনাবশ্যক। সেদিকে তা'র লক্ষ্য ছিল না।

কলিকাতা থেকে প্রায় ঘণ্টাদুয়েকের রেলপথ। স্টেশন থেকে কোন্ এক নদীর পথে। কি যেন গ্রাম। কোথায় যেন এক ফল-ফুলের বাগান। শরৎকালের শেষ, নতুন হেমন্তের আকাশ। সূর্যের আলোয় সোনার রং মাখানো।

পল্লীগ্রামে অশোক এই প্রথম নিশ্বাস নিলো। কবিতায় পড়েছিল, বনময়

গ্রাম-বীথিকার আশে-পাশে অলক্ষ্য পাখীর কূজন-গুঞ্জন, নদী গেয়ে যায় গান বাতাসের কানে কানে, আর মন্থর জীবন চলে নিশ্চিন্ত আনন্দে। দেখে দেখে অসীম পরিতৃপ্তিতে অশোক স্তব্ধ হয়ে রইলো। কবিতার গ্রামে প্রাণ ছিল না, জীবন্ত পটভূমি ছিল না।

হরিমোহন বললেন, বর্ষাকাল ছাড়া মাসে একবার আসি কয়েক ঘণ্টার জন্যে, অনেক খাটুনির পর যেন নতুন উৎসাহ নিয়ে ফিরে যাই। তুমি এবার থেকে আমাদের সঙ্গে এলে খুবই খুশি হবো বাবা।

তাঁবুর ভিতরে ব'সে কথা হচ্ছিল। বাইরে গালিচা পেতে তাসখেলা আর ভোজনপর্বের আসর জমেছে। অশোক বললে, আসতে খুবই ইচ্ছে করে, বিশেষ পাড়াগাঁয়ে, কিন্তু নানা অশান্তির মধ্যে থাকি কিনা—

গড়গড়ার নলটা একবার টেনে হরিমোহন গলা ঝাড়া দিলেন। তারপর বললেন, ট্রেনে আসতে আসতে ভাবছিলুম, তুমি যদি কিছু না মনে করো তাহ'লে কথাটা পাড়বো—মানে তোমার কাজের কথা বলছি অশোক।

হ্যাঁ,—বলুন—অশোক বললে।

যে কাজ করতে গিয়ে তোমার এমন দুর্ঘটনা ঘটলো, সেই কাজ যে মন্দ এমন আমি বলিনে। পৃথিবীতে এমন অনেক বড় মানুষ জন্মেছেন, যাঁরা অনেক নিচের থেকে জীবন আরম্ভ ক'রেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, ও কাজটা তোমার পক্ষে অসুবিধাজনক।

অশোক তাড়াতাড়ি বললে, সে আমি জানতুম, কিন্তু বাবার দরুন হাজার-খানেক টাকা এক বীমা কোম্পানীতে আটক পড়ায় আমাদের খুব অসুবিধে হয়েছে। টাকাটা পেলে আমি কিছু কাজকর্ম আরম্ভ করতে পারতুম।

হরিমোহন বললেন, পাচ্ছ না কেন?

অশোক বললে, সাক্ষী-সাবুদ-সার্টিফিকেট—সবই দাখিল করেছি, ছোট-খাটো দলিলের ত্রুটি তাও সারা হয়েছে,—অথচ এমনিই ওঁরা দেরি করছেন, আর আশা দিয়ে রাখছেন। ভারী বিপদে পড়েছি।

বটে—হরিমোহন বললেন, আচ্ছা, ওটার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আর কিছু গণ্ডগোল যদি না থাকে, আমি শীঘ্রই আদায় ক'রে দেবো। কিন্তু এটা ত তুমি বুঝতে পারো বাবা, তোমার এই অবস্থা, এটাকে সারিয়ে তুলতে

হবে। এর একটা খরচ আছে। হাজার টাকার যে অংশটা বাকি থাকবে, তাই নিয়ে ব্যবসা ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়ানো আজকালকার দিনে···এর ওপর বোনের বে-থা,—তা'কে ত আর আইবুড়ো রাখতে পারবে না, কিন্তু কবে কোন্ উদার যুবক বিনাপণে তোমার ভগ্নীকে বিয়ে ক'রে খবরের কাগজে নাম ছাপিয়ে বাহাদুরি নেবেন, সে আশায় তুমি বসে থাকতে পারবে না। সুতরাং অবিলম্বে উপায় একটা কিছু তোমাকে করতেই হবে।

অশোক দিশাহারা হয়ে এদিক-ওদিকে তাকালো।

হরিমোহন নলটা আর একবার টেনে বললেন, তুমি যদি ইতিমধ্যে কিছু স্থির ক'রে থাকো তা হ'লে অবশ্য আলাদা কথা।

তাড়াতাড়ি অশোক বললে, আমি বিশেষ কিছু স্থির করি নি, করার সময়ও পাই নি।

তোমার ছোট বোনটি এখন কত বড় বাবা ?

তা এই ধরুন, একুশ-বাইশ বছরের হবে। বাবা ওর বিয়ের চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ মারা গেলেন। ওকে নিয়েই আরো আমার অসুবিধে, নইলে মফঃস্বলে একটা মাস্টারী নিয়ে চ'লে যেতে পারতুম।

তোমাদের ঘরের ভাড়া কত ?

চার টাকা।

হরিমোহন কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার আর কোথাও কোনোপ্রকার বাধ্যবাধকতা নেই ত বাবা ?

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে অশোক তাঁর মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু তখনই জবাব দিল, না, কিছু নেই।

হরিমোহন বললেন, তাহ'লে প্রথম দরকার হোলো, তোমার একটা মাসিক উপার্জন···তা'র সঙ্গে সঙ্গে ওই হাজার টাকাটা তোমার হাতে এসে পড়া—

অশোকের বুকের ভিতরটা অকল্পিত সম্ভাবনার সঙ্কেতে যেন ধকধক ক'রে উঠলো। তার এই পোড়া ভাগ্যে একেবারে ফাঁকি ঘটবে না, একথা আজ সাহস ক'রে ভাবতে দোষ কি ? রেণু দৈবকে বিশ্বাস করে নি, কিন্তু অশোক স্বাভাবিকতাকেই বা অবিশ্বাস করতে যাবে কেন ? আজ রাত্রে ফিরে গিয়ে সে বলবে, ওরে পোড়ারমুখী, ঝড়ের সঙ্গে ধূলি-জঞ্জাল ছোটে, দরিদ্রের ঘরের

চালা উড়ে যায়, নৌকাডুবি হয়, কিন্তু ঝড়ের ভ্রূকুটির পিছনে যে সুস্নিগ্ধ বর্ষণ ছিল, সে কি তুই দেখতে পেয়েছিলি? কুয়াশা যত দীর্ঘস্থায়ীই হোক না কেন, সূর্যের আলোয় তার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। বিপদ স্থায়ী হয় না, বিপদের মধ্যে এইটিই ত বড় সান্ত্বনা।

সেদিন সমস্ত দিন অশোক ঘুরে বেড়ালো বনময় গ্রামে। হেমন্তের বেলা কী সুন্দর, অনামা পাখীর ডাক কী অপরূপ। আজ তার সত্য সত্যই একা থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে; মন যেন ছুটে চলেছে আনন্দময় শূন্যে, যেন তারই খুশির দোলা নিয়ে দুলছে দূরে ওই হরিৎশস্যের শীর্ষ। এই যে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি আর সৌভাগ্যের সম্ভাবনা তার জীবনে দেখা দিল, এ যত অভাবনীয়ই হোক, একে সে অর্জন ক'রে আনলো তা'র শিরার অপরিমেয় রক্তক্ষরণে। আজ শূন্য আকাশ থেকে আশ্বাস বর্ষিত হচ্ছে ভাগ্যেরই চক্রান্তে। আজ মনে হচ্ছে, জীবনের সব অর্থ শুধু মিথ্যায় মিলিয়ে যায় নি, সব ব্যর্থতাই কেবলমাত্র ফাঁকি নয়,—কিছু বা তার অবশেষ ছিল। এতদিন পরে বুঝি ওই দূরে আজ সাগরের সীমানা দেখা দিল!

সুচরিতা স্বামীর সামনে ব'সে আলাপ করতে লাগলেন, অশোক তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। একদিকে মণিমোহনের সহপাঠী বন্ধুরা ক্যারম্ খেলায় মত্ত, একদিকে গৃহশিক্ষক আর হরিমোহনের জনদুই বন্ধু আর বাড়ির বাজার-সরকার মশাই তাসখেলার বাজী নিয়ে আত্মবিস্মৃত। ওদিকে হেনা তার ছোট মামীর সঙ্গে একটা পশমী সেলাই হাতে নিয়ে কি যেন আলাপ করতে ব্যস্ত। মামী তার সমবয়সী। সমস্ত মিলিয়ে আজকের দলটা বেশ ভারী।

অশোক মাঝ পথ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, হেনা ডাকলো, অশোকবাবু? আসুন, আমার ছোট মামীর সঙ্গে আলাপ করবেন।

অশোক ফিরে এসে দাঁড়ালো। ছোট মামীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হোলো। হেনা বললে, পল্লীগ্রাম দেখে আপনি একেবারে আত্মহারা, কিন্তু তাই ব'লে আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না?

অশোক বললে, না না, তা নয়। রায় বাহাদুরের সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলুম।

ছোট মামী বললেন, আপনার মাথার ঘা কি একেবারে সারে নি?

অশোক হেসে বললে, সারে নি ব'লেই ত জীববিশেষের মতন পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি।

ছোট মামীর সঙ্গে হেনাও হেসে উঠলো। হাসি থামলে হেনা বললে, কই, বললেন না ত, আজকের বনভোজন কেমন লাগছে আপনার?

হাসিমুখে অশোক বললে, বনভোজন কোথায়, এটা ত ভূতভোজন!

ছোট মামী ঘোমটার ভিতর থেকে মুখ তুলে তাকালেন। অশোক পুনরায় বললে, যেদিকেই দেখছি অনাবশ্যক খরচের চেহারা,—ব'সে ব'সে তাই রায় বাহাদুরের খরচের হিসেবটা ভাবছিলুম। এই অসামঞ্জস্যই ত চারিদিকে। কারো নদীতে একফোঁটা জল নেই, আবার কারো নদী কূলভাঙা পদ্মার মতন। কেন বলুন ত, এত বাজে খরচ করেন আপনারা?—আচ্ছা, আপনারা বসুন, একটু বেড়াই এদিকে-ওদিকে।

অশোক এগিয়ে গেল, কিন্তু কিছুদূর গিয়েই সে পিছন ফিরে দেখলো, হেনা এসেছে তা'র পিছনে পিছনে। জায়গাটা কিছু নিরিবিলি, সুতরাং তরুণীর সান্নিধ্যে অশোক একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

হেনা বললে, আপনার মন্তব্য শুনে ছোট মামী একটু অস্বস্তিবোধ করছিল, তা জানেন?

কেন বলুন ত? আমি ত অন্যায় বলি নি!

অন্যায় বললেই ভালো করতেন, লোকের কাছে খাতির বাড়তো! আসল কথা হচ্ছে, খরচপত্রের ব্যাপারে ছোট মামাই হচ্ছেন বাবার পরামর্শদাতা। বাবার বিষয়-সম্পত্তি তিনিই তদারক করেন। দাদা মারা যাবার পর আমার আর মণিমোহনের বিপদের শেষ নেই।

অশোক হাসিমুখে বললে, আপনার কথায় মনে হচ্ছে, ছোট মামার আচরণে আপনারা তুষ্ট নন্।

হেনা বললে, তুষ্ট না হ'য়ে উপায় কি, বাবার হাত-পা বাঁধা। মামার কারচুপি ধরার সাধ্যও তাঁর নেই।—যাকগে, এসব কথা খুব অপ্রিয়, তা'র চেয়ে চলুন নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসিগে।

কিন্তু ওঁরা যদি খোঁজেন আমাদের?

হেনা রাগ ক'রে বললে, আঃ, সব কথায় আপনার প্রতিবাদ। খোঁজে খুঁজবে, জানুক যে আমরা নদীর বানে ভেসে গেছি।

অশোক হেসে বললে, কিন্তু এখনকার নদীতে বন্যাই আসে, বান আসে না—এ ওঁরা জানেন।

চলতে চলতে হেনা মুখ তুলে তাকালো। বললে, পরিহাস-বুদ্ধি আপনার একটুও নেই, এই কথাই জানতুম। প্রথম থেকে আপনি এত আড়ষ্ট, এমন একবগ্‌গা তা কি বলবো।—মারপিঠের দিনে আপনি যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, মনে আছে?

না।

হাসপাতালে যেতে যেতেই আপনি অজ্ঞান হলেন। কিন্তু অচৈতন্য অবস্থায় কী বক্তৃতা আপনার।—হেনা বলতে লাগলো, ইকনমিক্‌স্ আপনার কণ্ঠস্থ, দেখলুম মেটিরিয়লিজমে আপনার দখল কী সাংঘাতিক, তার সঙ্গে পলিটিক্যাল ইকনমি—

অশোক বললে, কই, কিছুই আমার মনে নেই—

হেনা বললে, বাবা স্তম্ভিত, আমরাও অভিভূত। খবরের কাগজওলার পেটে-পেটে যে রুসো-ভোলটেয়র-গ্যারিবল্ডীর বারুদ আর মার্কস-এর জগা-খিচুড়ি—কে জানতো? ওরা দেখছে আপনি নিদারুণ বিদ্বান, আর আমি দেখছি, ওরে বাবা, এর ভিতরে সমাজ আর রাষ্ট্রবিপ্লবের কী প্যাশন!—এই ব'লে সে হাসতে লাগলো।

হাসতে হাসতেই এক সময়ে হেনা বললে, এক-একবার ভাবছিলুম, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মাথা দিয়ে আপনার অনেক রক্ত বেরিয়ে গেল! সেদিন দেখেছি, রক্তপাত আর হিংসার প্রতি আপনার কী ভয়ানক লালসা। খুশি হয়েছি, ভয় পেয়েছি।

অশোক বললে, খুশি হলেন কেন?

হেনা বললে, দেখলুম বাঙালী মার খেলে এখনও কথা কইতে জানে। ভয় পেলুম, আপনার মতবাদ ছড়াতে থাকলে দেশে-দেশে অরাজকতা।

অপরাহ্নের রোদে হেনার মুখ রাঙা। এম-এ পড়তে সে আরম্ভ করেছে, সুতরাং তার বয়সের আন্দাজ পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, মুখে

তার কৈশোর-তারুণ্য। বয়সের একটা সন্ধিক্ষণে এসে তার সর্বশরীর থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, আর এগিয়ে চলে নি। কেবল কথা বলতে গিয়ে সে চোখটা বাঁকায়, সেই বাঁকা চোখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ঠিকরে বেরোয়। দেহের ঐশ্বর্য অনেক, সে নিজেও সচেতন, তাই প্রসাধন-বিলাসের বাহুল্য দিয়ে সে দেহকে ভারাক্রান্ত করেনি।। কলেজে পড়ে, অথচ বাগ্‌ভঙ্গীতে চাতুরীর চাষ এখনো করে নি—এটা অভিনব। অনাবশ্যক ইংরাজী শব্দের প্রয়োগে আলাপের পথটাকে কণ্টকিত করে না—এতে অন্য সহপাঠিনীরা লজ্জা পাবে সন্দেহ নেই। কথায় কথায় একথা জানান দেয় না সে স্বাতন্ত্র্যবাদিনী। আলাপে পুরুষ-বিদ্বেষ নেই, নারীবাদের ওকালতি নেই,—সহজ বশ্যতায় পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ায়। যাকে বলে ছেলেমানুষ!

অশোক হঠাৎ বললে, আপনি অমন ক'রে হাঁটছেন কেন বলুন ত?

হেনা হেসে উঠলো। বললে, লুকোতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। আমার পায়ে একটু দোষ আছে কিনা। ছোটবেলায় হাসপাতালের ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছিল, সোজা করতে পারে নি। খুঁড়িয়ে হাঁটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

অশোক মর্মাহত হোলো। এত দ্রুত চলা তার পক্ষে অশোভন হয়েছে, তার পদক্ষেপের সঙ্গে সমতা রাখতে গিয়ে হেনা যে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে, এটা সে এতক্ষণ জানতেই পারেনি। নিজের গতি সে মন্থর ক'রে দিল। বললে, ক্ষমা করবেন, আগে আমি জানতে পারিনি। আপনার নিশ্চয় খুবই কষ্ট হলো এতটা আসতে?

ব্যস্ত হয়ে হেনা বললে, একটুও না, খোঁড়া পা আমার অভ্যাসের সঙ্গে তৈরী হয়ে গেছে। কিছুই কষ্ট হয় নি। বরং আপনার সহানুভূতিতেই আমার লাগবে বেশী। জানেন ত, কানাকে কানা আর খোঁড়াকে খোঁড়া ব'লে ধরিয়ে দিতে নেই!

অশোক হাসলো। হেসে বললে, জানি, সুন্দরীকে সুন্দরী বলাও বোধ হয় পাপ। তবু, আপনাকে বলতে আমার ভয় নেই।

কেন নেই শুনি?

অশোক বললে, তা'র কারণ, চাঁদে কলঙ্ক আছে থাকুক, সৌন্দর্য তা'র

পক্ষে বড়। আপনার পায়ে খুঁৎ আছে, এতে আমার বেদনাবোধ নেই; আপনার প্রকাশটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।—চলুন, এবার যাই।

নদীর পাড় ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে তারা যখন ফিরলো, তখন প্রায় সন্ধ্যা।

ছয়

মাসখানেক কেমন ক'রে রেণু আর অশোকের গ্রাসাচ্ছাদন চললো সে আলোচনা আপাতত অনাবশ্যক।

খবর যে অশোক কিছু নেয়নি তা নয়। চার আনা আট আনা মধ্যে-মাঝে এনেও দিয়েছে। ঘরভাড়ার খোঁজ নেবার তা'র প্রয়োজন হয় নি, কারণ তাগাদা আসে নি। দিনান্তে একমুটো কোনো মতে এনে রেণু তা'র মুখের কাছে ধ'রে দেয়। ভাই আর বোনের সেই স্বচ্ছন্দ সরস আলাপে যেন অনেকটা ভাঁটা পড়েছে।

তা পড়ুক। অশোক মনে মনে হাসে। রেণু যে এরপর আর কোনো স্তোকবাক্যে ভুলবে না, একথা সে জেনেছে। তাকে এখন আশ্বাস দেবার আর প্রয়োজন নেই, কার্যত অবস্থার পরিবর্তন না ক'রে অশোক তা'কে কোনো কথাই বলবে না। তা'র আর বেশী দেরি নেই।

এক-একবার ইচ্ছা করে, তা'র নূতন সৌভাগ্য-সূচনার কথা সে রেণুকে সালঙ্কারে জানায়। রায় বাহাদুরের সঙ্গে তা'র বুঝাপড়া, সুচরিতার স্নেহ, হেনার সঙ্গে তার অধুনা প্রায় প্রত্যহ সাক্ষাৎ ও ভ্রমণের বিবরণ, হাজার টাকা উদ্ধারের কিনারা, এবং তার চাকরি পাবার একটা অদূরবর্তী সম্ভাবনা—ইচ্ছা ক'রে রাত জেগে জেগে সমস্ত গল্পগুলি একে একে রেণুর কাছে বলে। কিন্তু অন্ধকারে ছিন্নশয্যায় শুয়ে সকৌতুক হাসিমুখে অশোক নিজের মুখেই হাত চাপা দেয়। থাক আজ নয়, আরো কিছু দেরি হোক। নাটকীয়ভাবে নিজের বাহাদুরি একদিন সে ঘোষণা করবে।

কিন্তু কই, রেণুরও ত কোনো উদ্বেগ নেই! তা'র মাথার ক্ষত সেরে গেছে, অমনি রেণু নিশ্চিন্ত! রেণু তার স্নানের জল দেয়, ভাত বেড়ে দেয়, রাত্রে বিছানা পাতে—কিন্তু কথা বলে না। দুঃখবাদিনী রেণু, নিরাশবাদিনী রেণু,—তা'র কল্পনায় যেন আর কোনো আলোক, কোনো কল্যাণ, কোনো

সুখস্বপ্নের আশা নেই। আর যেন সে বিশ্বাস করে না পৃথিবী সুন্দর, মানুষ মহৎ, জীবন একটা বিপুল আশার আশ্রয়, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব সহস্র মালিন্য থেকে মুক্তি নিয়েও উঠে দাঁড়ায়। রেণুকে আর এসব বিশ্বাস করানো যাবে না। সর্বনাশিনী সর্বস্ব হারিয়ে যেন দেউলে হয়ে পথের ধারে ব'সে গেছে। সে দাঁড়িয়ে যখন থাকে, যেন কাষ্ঠপুত্তলিকা; যখন চ'লে ফিরে বেড়ায়, যেন কলের পুতুল!

তবু এখন কিছুতেই অশোক এদিকে মন দেবে না। অভাব ঘটুক, রেণু উপবাস করুক, কঙ্কালসাব হোক, প্রেতের মুখবিকৃতির মতো এই কুৎসিত দারিদ্র্য চারিদিক থেকে তার বীভৎস চেহারা প্রকাশ করুক,—অশোক অটল। সে জানে, মাত্র একদিনের মধ্যে এ অবস্থার চেহারা সে ঘুরিয়ে দিতে পারবে। সুন্দর একটি ফ্ল্যাট্ সে নেবে নিরিবিলি শহরতলীর দিকে। পূর্ব-দক্ষিণ অংশ থাকবে তা'র খোলা,—জানলার ধারে বসিয়ে দেবে চন্দ্রমল্লিকার চারা, ওর সঙ্গে কোন্ না দুটো রজনীগন্ধা, আকাশের সোনার আলো তরঙ্গে তরঙ্গে নেমে আসবে তা'র জানলার ধারে হেনার হাসির মতো। তারই ধারে ব'সে অশোক কেবল আপন মনে পড়াশুনো করবে। উপার্জনের সময়টি ভিন্ন বই-কাগজ নিয়েই সে কাটাবে বাকি জীবন। রেণুর এই চেহারা থাকবে না, সুন্দর শাড়ি পরবে সে, মাথায় দেবে সুগন্ধ তেল, হাতে গুজরাটী ডিজাইনের চুড়ি। একদিন রেণুর সে বিয়ে দেবে রূপবান এক তরুণের সঙ্গে। রাজরাণীর মতো রেণু যাবে তা'র স্বামীর সঙ্গে। অশোকের সকল সাধনা সার্থক হবে।

দুঃসাহসিক অশোক তা'র রাশ আলগা ক'রে দিল হেনার সুখস্বপ্নে। নব্য যুবকের পক্ষে এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কী হ'তে পারে? একটা নাটকীয় দৈবদুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে হেনার পরিচয়; অচেতন অশোক প্রথম চক্ষুরুন্মীলন ক'রে দেখলো, যেন মূর্তিমতী সুন্দর দুরাশা, নতমুখী, অশ্রুবাষ্পভরা দুই চক্ষু অতন্দ্র, উন্মুখ, সাগ্রহ। সে যেন সামন্তযুগের কোনো নাইট্, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে জর্জর, হতচেতন,—তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে এক সালঙ্কারা অপরিচিতা রাজকুমারী, চোখে-মুখে অপার স্নেহ, করকমলে সেবার ঔৎসুক্য। কী যে অপরূপ, অশোক জানে।

স্বচ্ছন্দচারিণী হেনার উপরে অভিভাবকের কোনো শাসন নেই। সেদিন তা'রা গিয়েছিল টালীগঞ্জের ওদিকে। এই কলকাতা শহর, এই পুরনো শহরতলী, সেই ক্লান্তি-দায়ক সুদূর-প্রসারী পথ,—কিন্তু সেদিন সেই পথের বাস্তবের আবরণ অপসৃত হয়ে গিয়েছিল। একটিমাত্র সন্ধ্যা, আয়ু তা'র অল্পক্ষণ, কিন্তু অনন্তকাল, অনন্ত জীবন সেই অবকাশটুকুর মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছিল। আকাশে ছিল মলিন পঞ্চমীর জ্যোৎস্না, তারাগুলি ছিল অশোকের বুকের রক্তবিন্দুদলের মতো উৎসুক, পথের দুই পাশে আকন্দ আর কুন্দের ভীরু মৃদু গন্ধ। কালের শাসন আর সীমানার অপর পারে যেন দুটি তরুণ-তরুণী। সেখানে দারিদ্র্য ছিল না, রেণুর নিত্য চিত্তবিকারের অগ্নিশ্বাস ছিল না, সংশয় অশ্রদ্ধা আর হতাশাক্লিষ্ট মনো-ক্ষোভের কোনো জ্বালা ছিল না,—সমস্ত কিছু বাস্তবের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। এতদিন পরে সেদিন একটি নালা পার হ'তে গিয়ে হেনা তার হাতের উপরে ভর দিয়েছিল। ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর অশোক সেই স্পর্শটুকুকে কাঙালের গায়ে চন্দন-লেপনের মতো উপভোগ করেছিল। সেই রোমাঞ্চকর সন্ধ্যা অবিস্মরণীয়।

গত বৃহস্পতিবার তা'রা গিয়েছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সুচরিতা, মণিমোহন, আন্দুবাবু, ছোট মামী এবং সুচরিতার বড় পিসীমা বৃদ্ধা ছিলেন সঙ্গে। কোটালের গঙ্গায় ছিল স্রোত, হেনার প্রাণের মতো। মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ছিল উচ্ছ্বাস, অশোকের হৃদয়-দোলার মতো। হেমন্তের হাওয়ায় আর হেনার শুষ্ক চুলের মোহগন্ধে অভিভূত অশোক কোন্ ইন্দ্রজাল বুনেছিল আকাশে? কোন্ প্রতিবিম্ব দেখেছিল জাহ্নবীর তরঙ্গে তরঙ্গে?

হৃদয়, অধীর হোয়ো না! অন্ধকারে এই ছিন্নমলিন শয্যায় বিনিদ্র অশোক, পুরনো ঘরের রুগ্ন গন্ধ, উপবাসে কাতর তারা দুই ভাই-বোন,—এখানে আর কোনো সাক্ষী নেই। জন্তুর মতো তা'রা এই ঘরে লুক্কায়িত, আর্তের মতো তা'রা অনড়—কিন্তু এ সত্য নয়। রুগ্নতা সত্য নয়, দারিদ্র্য স্থায়ী নয়, চিত্তগ্লানি স্বাভাবিক নয়—এর থেকে উত্তীর্ণ হবে তারা একদিন। তারা বাইরে গিয়ে একদিন দাঁড়াবে মানুষের সহজ অধিকার নিয়ে, সুস্থ প্রাণ নিয়ে, সুন্দর হৃদয় নিয়ে। তারা ভাই-বোন একদিন বহির্জগতের আলোক আর সৌন্দর্যের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, আমরা মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে এসেছি

জীবনের আয়ুর্ময় প্রাঙ্গণে, আমরা অন্ধকার ও অস্বাস্থ্যকে অতিক্রম ক'রে এসেছি জ্যোতির্ময় বিশ্বের দরবারে, আমরা দারিদ্র্য থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি কমলার কৃপাদৃষ্টির আশ্রয়ে। মানুষের মাঝখানে, ঐশ্বর্য ও আনন্দের মাঝখানে আমাদের বাঁচবার অধিকার দাও!

রাত্রির এই চতুর্থ প্রহরে আর একটি মহামন্ত্র সে যদি মনে মনে জপ করে, কেউ কি শুনতে পাবে তা'র সেই বুকের ভাষা? কাল সে গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে হেনার সঙ্গে একা। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সেদিন অবধি যা'র বিশ্বাস ছিল না, প্রতিমার প্রাণময়তায় সে বিশ্বাস স্থাপন করবে কেমন ক'রে? তবু হেনার পিছনে পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো সে দেবীপ্রতিমার সম্মুখে। ওদিকে কুলুকুলুবাহিনী জীবনদায়িনী জাহ্নবীর আনন্দধারা, এদিকে জগৎ-পালিকা জগদ্ধাত্রী কালীর নিত্য জাগ্রত চক্ষু। সেই মূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে হেনার গায়ে তার গা ঠেকেছিল। মনে মনে সে উচ্চারণ করলে, যদি এই তরুণীর সঙ্গে তা'র বিয়ে হোতো! তা'র জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই, এর চেয়ে একান্ত প্রার্থনা আর কিছু নেই, এর চেয়ে একাগ্র তপস্যাও সে আর কিছু করে নি; কোনো ছলা-কলা, কোনো ইতর আয়োজন, অথবা চক্রান্ত তার নেই, প্রলুব্ধ করার মতো ঐশ্বর্য-সম্পদ তা'র কিছু নেই,—সে কেবল সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাচ্ছে, এই তরুণী তার পত্নী হোক। এমন যার উচ্চশিক্ষা, এমন ভদ্র যার অন্তঃকরণ, এমন যার স্নেহ-মমতা, যে এমন কল্যাণরূপিণী,—তার কাছে অশোক তার দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের আশ্রয় ভিক্ষা করছে। রাজকন্যার পদতলে রাখাল তা'র বেদনার বোঝা নামাতে চায়! হে বরদাত্রী দেবি, তুমি তার জীবনকে সার্থক ও সুন্দর ক'রে তোলো!

সহসা অন্ধকারে অস্ফুট আর্তস্বর শুনে অশোক চমকে উঠলো। ঘুমের ঘোরে রেণুর মুখ দিয়ে এই প্রকার আওয়াজ আজকাল নিঃসৃত হয়। গত কয়েকদিন থেকে রেণুর শরীরটা বুঝি ভাল নেই।

সস্নেহ মৃদুকণ্ঠে অশোক ডাকলো, ওরে, রেণু?

উঁ?—রেণু তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল।

ওরে পোড়ারমুখী তুই বুঝি সারারাত জেগে আছিস্? জেগে জেগে বুঝি নাক ডাকছিস্।—ওকি, কান্না হচ্ছে কেন?

রেণু নিঃশব্দে নিজের মুখে আঁচল চেপে ধরলো। কিন্তু কথা বললে না।

রাত শেষ হয়ে এসেছে, দূরে চটকলের বাঁশী শোনা যাচ্ছিল। এর পরে ঘুমোবার চেষ্টা আর বৃথা। অশোক গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, ছিঃ, কাঁদতে নেই রেণু—তুই ত আর কোনোদিন চোখের জল ফেলিসনি রে? দাঁড়া, আলোটা একটু জালি। দেশালাই কোথায় বল্ ত?

রেণু বললে, দেশালাইয়ে আর কাঠি নেই।

আচ্ছা থাক, দরজা-জানলাগুলো সব খুলে দিই। ভোরের আলো আসবে।—জানি, ইদানীং আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট খুব বেড়ে গেছে, আর যেন কিছুতেই উপায় পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এক বছরের ওপর তুই চালিয়ে এলি, চোখের জল ত কোনোদিন তোর পড়ে নি?

রেণু সাড়া দিল না, কেবল রোগীর মতো সে উঠে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

দরজাটা খুলে দিয়ে অশোক বললে, আর বোধ হয় ভাবনা নেই রেণু, ভালো দিন আমাদের আসছে। অভাবের উৎপীড়ন আর বোধ হয় তোকে সইতে হবে না রে, সেদিনের আর দেরি নেই।—বিশ্বাস হচ্ছে না তোর, কেমন?

রেণু বললে, না।

অশোক যেন কেমন একপ্রকার কৃত্রিম অট্টহাসি হেসে উঠলো। বললে, আচ্ছা, দেখে নিস। যেদিন তোর মুখে হাসি ফোটাতে পারবো, সেদিন কিন্তু আমাকে মোটা বাজি ধ'রে দিবি, পোড়ারমুখী।

সপ্তাহ তিনেক পরে অশোক হেনার সঙ্গে সন্ধ্যা নাগাৎ বেড়িয়ে ফিরছিল, মণিমোহন ছিল সঙ্গে। বাড়ির ফটকের কাছে তাদের বিদায় দিয়ে হাসিমুখে অশোক চ'লে যাবে, এমন সময় ড্রাইভার এগিয়ে এসে বললে, বাবু আপনাকে ডেকেছেন। তিনি চা খাবেন আপনার সঙ্গে।

তা'হলে ত আপনাকে পালাতে দেবো না—আসুন। ব'লে হেনা তা'র হাত ধরে টানলো।

মণিমোহন বললে, আজকে অব্রাহাম লিন্‌কনের গল্পটা আপনি শেষ করবেন, তবে যেতে দেবো।

অগত্যা অশোককে ভিতরে যেতে হোলো। রায়বাহাদুর উপরের ঘরে বসেছিলেন সুচরিতার সঙ্গে। অশোক গিয়ে হাজির হোলো।

রায়বাহাদুর হাসিমুখে বললেন, বসো। আমি অনেককাল আগে একবার যৌথ কারবারে নেমেছিলুম অশোক, লাভ-লোকসানটা বুঝি। তুমি আমাকে কত কমিশন দেবে বলো?

হাসিমুখে অশোক বললে, কিসের কমিশন বলুন ত?

তুমি টাকাটা পাবে এই সামনের উনিশ তারিখে, এই নাও তার চিঠি। কাল সকালে ব্যাঙ্কের চেকখানা তোমার হাতে আসবে। কিন্তু টাকা পেলে আমাকে কত কমিশন দেবে বলো?—হরিমোহন হাসিমুখে বললেন।

যথাসর্বস্ব!

অশোকের এই আকস্মিক পরিহাসে সকলেই কলহাস্যে ঘর মুখরিত ক'রে তুললো। হেনা মুখে আঁচল চাপা দিল।

সুচরিতা বললেন, পরের খবরটা শুনিয়ে দাও—যেটা আসল কথা!

রায়বাহাদুর বললেন, হ্যাঁ, কাস্‌টমস্‌-এ তোমার জন্যে একটা কাজেরও যোগাড় হয়েছে। অবশ্য মাইনে এখন অল্প, ষাট টাকা মাত্র। তবে বছর খানেকের মধ্যে চাকরিটা পাকা হলে অবশ্য মাইনেটা তাড়াতাড়ি বাড়বে।

অশোকের বুকের ভিতরটা ধকধক ক'রে উঠলো। তিনটে ছবি তা'র চোখের সুমুখে আর একবার ভেসে উঠলো—রেণুর মুখে হাসি, তা'র নিজের সুন্দর ফ্ল্যাট্, প্রিয়তমা স্ত্রীরূপে হেনা তার পাশে। অভিভূত ও স্তব্ধ হয়ে অশোক চেয়ারে ভর দিয়ে নির্বাক হয়ে ব'সে রইলো।

চায়ের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ আহারাদি সেরে যখন সে উঠে দাঁড়ালো, তখন রায়বাহাদুর বললেন, আগামী মাসের পয়লা থেকে তুমি কাস্‌টমস-এর কাজে জয়েন্ করবে, আমার সঙ্গে ওদের সেই কথাবার্তাই হয়েছে। এ-কদিনের মধ্যে বীমার টাকাটা পেয়ে তুমি নিজের গোছগাছ ক'রে নাও, কি বলো?

যে আজ্ঞে—অশোক বললে।

সুচরিতা বললেন,—কালকের কথাটাও অশোককে তুমি ব'লে দাও?

হ্যাঁ,—রায়বাহাদুর বললেন, কাল সাড়ে দশটা নাগাৎ তুমি আমাদের এখানে আসবে। সবাই মিলে আমরা একবার স্টেশনে যাবো, তার আগে পথে ব্যাঙ্কে নেমে তোমার চেক্‌খানা নিলেই চলবে। তুমি ঠিক সময়ে এসো বাবা।

সুচরিতার সঙ্গে মণিমোহন আর হেনা এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। অপরিমেয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একাগ্র উল্লাস মুখে চোখে মেখে অশোক হাসিমুখে নেমে চ'লে গেল। কী দ্রুত তা'র গতি, কী স্বচ্ছন্দ তার ভঙ্গী—আজকে সে রাজা, সে নগরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক। দুঃখের নাটকের শেষ দৃশ্যে যেন অপ্রত্যাশিত মিলন ঘটেছে,—হেনার সুগন্ধে সে যেন বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। চাকরিতে ঢোকামাত্র সর্বাগ্রে হেনারই কাছে সে বিবাহের প্রস্তাব করবে। অধীর হৃদয় যেন আজকে আর কোনোমতে শান্ত হ'তে চাইছে না।

পথের লোক-জটলা আর যানবাহনের মাঝখানে নেমে সে একবার থমকে দাঁড়ালো। তা'র নিজের খাওয়া হলো বটে, কিন্তু আজ তিন দিন হোলো রেণুর রান্না নেই! আজকের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে একথা কিছুতেই ভুললে চলবে না, উপবাসিনী ব'সে রয়েছে পথের দিকে চেয়ে। আজকের শুভ সংবাদ তার কাছে বড় নয়, এক মুষ্টি অন্নের জন্য রেণু হয়ত লালায়িত হয়ে রয়েছে।

কয়েক পা গিয়ে সে আবার ফিরে এলো। বাড়ির লোকের অলক্ষ্যে ফটকের মধ্যে ঢুকে আস্তে আস্তে একটা ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর অনেকক্ষণ ইতস্তত ক'রে, অনেক সঙ্কোচ আর চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে ডাকলো, ড্রাইভার সাহেব?

সেই পরিচিত লোকটি বেরিয়ে এলো—কে, অশোকবাবু, কি বলুন ত?

অশোক হাসিমুখে বললে, না, বিশেষ কিছু না। একটু অসুবিধেয় পড়েছি। একটা টাকা আছে আপনার কাছে?

দাঁড়ান্, আমি দিদির কাছ থেকে—

না না,—অশোক বাধা দিয়ে বললে, এই সামান্যের জন্যে আর ভেতরে যেতে হবে না। যদি আপনার কাছে না থাকে ত,—থাক্, ও আমি চালিয়ে নেবো।

ড্রাইভার বললে, যাবেন না বাবু, আমার কাছেই আছে, এনে দিচ্ছি ঘর থেকে—

ভিতরে গিয়ে একটা টাকা এনে সে অশোকের হাতে দিল। অশোক বললে, অনেক ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে দেখা ত হবেই, আমি শিগগিরই ফেরত দেবো।

আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি ব্যস্ত হবেন না। যখন সুবিধে হয়—

অশোক চক্ষের নিমেষে বড়রাস্তার জনারণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেলেঘাটার বাসায় সে যখন চাল-ডাল ইত্যাদি দুই হাতে নিয়ে এসে পৌঁছলো, রাত তখন নটা বাজে। অনেক পরিশ্রমে তা'র নিজেরও এতক্ষণে ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। এখন থেকে কার্পণ্য না করলেও চলবে। দশ বিশ টাকাও সে যদি কোথাও ধার করে, নাকের ডগার ওপর শোধ ক'রে দেবে। এ ক'দিন একটু ভালো খাওয়া না হ'লে—অনেক পরিশ্রম আসছে—সে পেরে উঠবে না। বাবার দরুন টাকাটা হাতে এলে প্রথমে কিছু বিছানা, শীতবস্ত্র, এবং দুচা'র খানা ধুতি আর শাড়ি কেনা দরকার। একদিন সে পেট ভ'রে হোটেলে খাবে। একজোড়া জুতো চাই। অবশ্য সকলের আগে এই অভিশপ্ত নোংরা বাসাটা না ছাড়লে আর কোনোপ্রকারেই ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো যায় না।

জিনিসপত্র দুই হাতে নিয়ে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দা পেরিয়ে আসতেই রেণু আর ক্ষ্যান্তর মা'র প্রবল তর্ক-বিতর্ক তা'র কানে এলো। কিন্তু তার গলার সাড়া পেয়ে সহসা দুজনেই চুপ। অশোক এগিয়ে এসে হাসিমুখে বললে, কি গো ক্ষ্যান্তর মা, রাম-রাবণের লড়াই কেন তোমাদের?

ক্ষ্যান্তর মা সহসা একটু থতিয়ে বললে, তা এই ত্যাখো না দাদাবাবু, মেজাজ খারাপ হলে আপনার লোককেও পর মনে হয়।

তা বটে, ঠিকই বলেছ।—রেণুর বুঝি খুব ক্ষিদে পেয়েছে আজ? বেশ ত, আলোটা জ্বাল্ দেখি? এই নে দেশালাই।—তাড়াতাড়ি আজ রান্নাবাড়া কর। এর পর অনেক কথা আছে।—পুনরায় বললে, কিছু মনে ক'রো না, ক্ষ্যান্তর মা। কপাল মন্দ হ'লে এসব হয়েই থাকে।

ব'লে অশোক নিজেই ঘরের মেঝেতে জিনিসপত্রগুলি নামিয়ে নতুন একটা দেশালাই পকেট থেকে বা'র করে দিল।

রেণু আলো জ্বাললো। তার দুই চোখে অশ্রুর ফোঁটা!

ক্ষ্যান্তর মা বললে, তা ত বটেই দাদাবাবু, নইলে ঘরে ডেকে এনে আজ দিদিমণিই বা আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে কেন বলুন? আমি বলি, ঝগড়াঝাটির কি দরকার, এসব ত আকছার ঘটেই থাকে। তাই ব'লে উপায় কি আর একটা নেই?—আচ্ছা, রাগ ক'রো না দিদিমণি, শান্ত হ'য়ে দাদাবাবুকে রেঁধে-বেড়ে দাও, নিজেও বাসিমুখে একটু জল দিয়ো বাছা। আমি এখন চললুম, কাল আবার আসবো।

বলতে বলতে ক্ষ্যান্তর মা বারান্দা পেরিয়ে নিচে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অশোক উৎসাহিত হয়ে বললে, হয়েছে, আর রাগ করতে হবে না। দেখছিস, তোর জন্যে আজ একটা কেমন ফুলকপি এনেছি রেণু? ওরই কিন্তু দাম দু'আনা রে।

রেণু নিঃশব্দে রান্নার আয়োজন করতে লাগলো। অশোক সেইদিকে তাকিয়ে একবার মনে মনে হাসলো—রেণুর রাগ পড়বে আগামী উনিশ তারিখে হাজার টাকার চেক্‌খানা পেয়ে!

পরদিন ঠিক বেলা সাড়ে দশটায় অশোক এসে হাজির। আজ তার চেহারা কিছু ভব্যযুক্ত। স্নানকরা চক্‌চকে মাথা, চুল আঁচড়ানো। কিছুকাল থেকে গোঁফদাড়ি কামাচ্ছে সে নিয়মিত। জামা-কাপড় কিছু ফর্সা, পায়ের জুতোটায় শুশ্রূষার দাগ রয়েছে। স্বাস্থ্যটা তার ভালো; কেবল ঝড়ে ঝাপটায় একটু মলিন হয় মাত্র। কিন্তু সেবাযত্ন পেলেই আবার ভদ্র অবস্থায় ফিরে আসে।

ওরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। তবে মেয়েদের সাজগোছ করতে সময় লাগে। অতঃপর বাড়ি থেকে বেরোতে প্রায় এগারোটা বাজলো।

মোটরখানা বড়। ড্রাইভারের পাশে মণিমোহন আর অশোক বসলো। পিছন দিকে বসলেন হরিমোহন, সুচরিতা ও হেনা। আজ কমলা রঙের শাড়ি

পরেছে হেনা, সোনালী জরির পাড়। গায়ে ব্রোকেডের জামা। কপালে তেল-খয়ের আর চন্দনের কোঁটা, চোখে কাজলের ঈষৎ রেখা টানা। হেমন্তের হাওয়ায় শুষ্ক এলো খোঁপার মঞ্জরী কপালের কাছে ঝালরের মত ঝুলছে।

পুলকিত অশোক একবার সেদিকে তাকিয়ে অনর্থক অনর্গল মণিমোহনের সঙ্গে গল্প ক'রে যেতে লাগলো। মোটর চলেছে।

নতুন রাস্তা পেরিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীটের মধ্যে ঢুকে এক ব্যাঙ্কের কাছে এসে গাড়ী থামলো। ওরা গাড়ীতেই রইলো, কেবল অশোক আর হরিমোহন নেমে ভিতরে গেলেন। তাঁ'র মতো লোক নিতান্তই পরোপকারের জন্য এতটা ক্লেশ স্বীকার করবেন, ধনীলোকের কুষ্ঠীতে এটা অবশ্য অভিনব। কিন্তু অপ্রত্যাশিত যা কিছু তাই তা'র জীবনে ঘটে চলেছে, সুতরাং সেদিক থেকে অশোকের আর কিছু বলবার নেই। হরিমোহন নিজেরই জামিনে অশোককে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষের কাছে দাঁড় করিয়ে আজ এতকাল পরে হাজার টাকার চেকখানা আদায় ক'রে দিলেন। চেকখানা ক্রশ করা—হঠাৎ হারিয়ে গেলে ভয়ের কারণ কম। আগামী উনিশ তারিখে তাঁর ব্যাঙ্কে জমা দিয়েও অশোককে টাকা দিতে পারবেন।

ফিরে এসে গাড়ীতে ওঠার আগে অশোকের সঙ্গে হেনার একবার চোখাচোখি হোলো। কালো চোখের ভিতর দিয়ে সহসা শ্রাবণরাত্রির বিদ্যুদ্দাম ছুটে চ'লে গেল, এবং দুই কানে হীরার দুল দুটো একবার ঝলসে উঠলো। আজ আপন সর্বাঙ্গে সে যেন অশোকের জন্য চিতাশয্যা রচনা করেছে। অশোক হাসিমুখে আবার গাড়ীতে উঠে এসে মণিমোহনের পাশে বসলো। গাড়ী চললো হাওড়া স্টেশনের দিকে। বড় বাজারের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে মোটর যখন সবেমাত্র হাওড়া পুলের উপরে এসেছে, তখন বারোটা বাজতে আর পনেরো মিনিট বাকি। সময় অতি সংক্ষেপ। হরিমোহন একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, একটু হাঁকিয়ে চলো হে, গাড়ী বোধ-হয় এসে পড়লো। অন্তত মিনিট পাঁচেক আগে আমাদের আসা উচিত ছিল।

অশোক একটু লজ্জিত হোলো। তারই জন্যে ব্যাঙ্কে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে।

স্টেশনে গিয়ে কোনমতে পাঁচখানা প্ল্যাট্‌ফরম টিকিট কিনে তাঁরা যখন প্ল্যাট্‌ফরমে এলেন তখন বম্বে মেল সবেমাত্র স্টেশনে ঢুকেছে। কুলিরা পাথরের দাগ গুণে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

মেল-এ কে আসছে এ-কথা অশোক বুঝতেও পারে নি, জিজ্ঞাসাও করে নি। কিন্তু ফিরে দেখলো হেনা তার অপটু পা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে এই শীতের দিনেও যেন ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। অশোক সমবেদনায় স্নেহে তা'র দিকে একবার তাকালো। কিন্তু হেনার দৃষ্টি ছিল তখন মেল-এর প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে।

গাড়ী থামলো। ফার্স্ট ক্লাস থেকে টুপি মাথায় দিয়ে নেমে এলেন এক তরুণ সাহেব। কেবল সুশ্রী নয়, অবাঙালী-সুলভ ধবধবে গায়ের রং, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। মণিমোহন ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরলো। খাঁটি বাঙালীর মতো হাত তুলে সাহেব সকলকে নমস্কার করলেন। হরিমোহন বললেন, তোমার বাবা এলাহাবাদ কোর্টে বিশেষ কাজে আটকে গেছেন। সম্ভবত কাল তিনি এসে পেঁছিবেন।

সাহেব বললেন, আমি কি তাহ'লে হোটেলে উঠবো ?

সুচরিতা বললেন, তুমি তোমার বালীগঞ্জের বাড়িতেই উঠবে রণেন,— আমরা ওখানে সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।—হেনার খবর পেয়েছিলে ত ? ইংরেজীতে অনার্স পেয়ে বি-এ পাস করেছে! এখন এম-এ পড়ছে।

হেনার সঙ্গে সাহেবের সহাস্য দৃষ্টি-বিনিময় হোলো।

হরিমোহন ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে এই ছেলেটির পরিচয় করিয়ে দিই। একজন গ্রাজুয়েট, খুব এন্টার-প্রাইজিং। নাম অশোক ভট্টাচার্য। আর এঁর নাম রণেন্দ্র ব্যানার্জি, নতুন আই-সি-এস হয়ে এলো বিলেত থেকে। বিহারে পোসটেড্‌।

দুজনে নমস্কার-বিনিময় হোলো। কিন্তু অশোকের দরিদ্র বেশভূষার দিকে সাহেব একবার করুণার্দ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

রণেন্দ্রর সঙ্গে একজন বেয়ারা ছিল তকমা আঁটা। সে জিনিসপত্র গুছিয়ে কুলির মাথায় চাপাতে লাগলো।

আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-কুটুম্বাদির কুশল প্রশ্নোত্তর চলতে লাগলো।

সাহেবের মুখে বাঙলা ভাষাটা কেমন যেন আড়ষ্ট ও বেমানান মনে হচ্ছে। অপরাধ কিছু নেই, কারণ সন্ত বিলাত-ফেরতার হাওয়ায় তখনও ইংরেজী পালিশের গন্ধটা সুস্পষ্ট; বাঙলাটা রপ্ত হ'তে কিছুদিন সময় লাগবে। অশোকের সঙ্গে একটুখানি ব্যবধান রেখে ওরা যেন কয়েক পা সরে দাঁড়িয়ে অন্তরঙ্গ আলাপ করতে লাগলো। অশোক ভাবলো, মাঝপথ থেকে আগেই তা'র চলে যাওয়া উচিত ছিল, গায়ে প'ড়ে এতদূর আসা তার উচিত হয় নি। এদের কাছে সম্ভ্রম রক্ষা করতে হ'লে আত্মমর্যাদার মূল্যও জানা দরকার।

জিনিসপত্র কম নয়, এবং লোকও একজন বাড়লো। সুতরাং ট্যাক্‌সি একখানা করা দরকার। স্থির হোলো, স্টেশন থেকে সোজা সবাই যাবেন বালীগঞ্জের বাড়িতে। হরিমোহনের নিজের মোটরে যাবে কেবলমাত্র দুজন— রণেন্দ্র আর হেনা, এবং মণিমোহন ও অশোককে নিয়ে হরিমোহন সস্ত্রীক ট্যাক্‌সিতে যাবেন।

বেয়ারা একখানা ট্যাক্‌সি ডেকে নিল। সেই ফাঁকে মণিমোহন আহ্লাদে আটখানা হয়ে একবারটি অশোকের কাছে এলো। বললে, মিস্টার ব্যানার্জি একেবারে সাহেব বনে গেছেন, না অশোকবাবু?

অশোক বললে, সম্ভব। উনি বুঝি তোমাদের আত্মীয় হন, মণিমোহন?

মণিমোহন হেসেই অস্থির। বললে, না, না,—আত্মীয় হবেন কেন? বাবার বন্ধু আশুবাবু,—তাঁর ছেলে।

ও, বন্ধুপুত্র!

হ্যাঁ, বাবা ওঁকে সমস্ত খরচপত্র দিয়ে সিভিল সার্ভিস পড়তে পাঠিয়েছিলেন। আপনি শোনেন নি আগে?

অন্যমনস্ক অশোক বললে, না।

মণিমোহন বললে, ওঃ দেখছেন, দিদির কী আনন্দ! আমাদের দিকে আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। জানেন অশোকবাবু—দিদির সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জির এই সামনের জানুয়ারীতে বিয়ে? সত্যি বলছি, দিদির বিয়ের সব ঠিক।

আর শুনুন ?—ব'লে সে মুখের কাছে মুখ এনে পুনরায় বললে, দিদি একটু খোঁড়া ব'লে উনি বিয়ে করতে চাননি—তাই বাবা ওঁকে টাকা দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন।

অশোক সাড়া দিল না, কেবল পিছন থেকে খঞ্জ তরুণীর ভাঙা ভাঙা পদক্ষেপ লক্ষ্য করতে লাগলো।

ট্যাক্‌সিতে ওঠবার আগে হাসিমুখে হেনা একবার হাত বাড়িয়ে অশোককে ডাকলো,—রাজরাণী যেমন ডাকে পথের কাঙালকে, যেমন ডাকে পথের কুকুরকে। অশোক কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হেনা সহসা হাতের মুটো থেকে দুটো টাকা নিয়ে অলক্ষ্যে অশোকের আড়ষ্ট একখানা হাতে গুঁজে দিয়ে দিল। বললে, বালীগঞ্জের বাড়িতে আপনার গিয়ে কাজ নেই। এখান থেকেই গাড়ী ক'রে আপনি বাড়ি চলে যান। কয়েকদিন আমরা ব্যস্ত থাকবো, এর পর আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে! এই ব'লে গাড়ীতে উঠে সে সাহেবের পাশে গিয়ে বসলো।

হরিমোহনের মোটর আগে আগে, হেনা আর রণেন্দ্রর মোটর পিছনে পিছনে। নির্বোধ, নির্লিপ্ত, নিরর্থক চোখে অশোক মোটরের ধুলাপথের দিকে চেয়ে রইলো।

সাত

অশোক দুদিন ঘরে ফেরে নি।

কেন ফেরে নি, প্রশ্ন করলে সে নিরুত্তর। দুটো দীর্ঘ দিন সে কাটালো ঘরে না ফিরে। সে খেলো কিনা, আশ্রয় পেলো কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। এত বড় বিরাট শহরে একটিমাত্র মানুষের কি আহার ও বাসস্থান নেই? ভিখারী, পাগল, দাগী, সন্ন্যাসী, কুকুর—এদের কেমন ক'রে চলে?

ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়লের মাঠে একটা বেলা বেশ কাটে। চিড়িয়াখানার পাঁচিলের পাশে পাশে জন্তু-জানোয়ারের ডাক শুনেও সময় কাটানো যায়। গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলে কত নৌকা আর স্টীমার। আছে লালদীঘির পাড়া, চৌরঙ্গীর পথ, আছে সিনেমার বিজ্ঞাপন। নতুন রাস্তা

দিয়ে চলো, প্রাসাদের পর প্রাসাদ। তাদের পাথরের নিচে কত ব্যর্থ অশ্রুর অশ্রুত ইতিহাস, কত নরকঙ্কালের কাহিনী, কত দীপ নিভে যাওয়ার কথা।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে একটির পর একটি ট্রাম গোনো, মোটরের পিছনের নম্বর প'ড়ে যাও, প্রতি মানুষের মুখের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করো, ভিখারীর ভিক্ষার কৌশল শেখো,—দীর্ঘ সময় কেটে যাবে অজ্ঞাতে। কত রাস্তা গেল কতদিকে, কত লোক কাজ সেরে চলেছে ঘরের পথে, কত চূর্ণ হাসি আর টুকরো কথা ভিড়ের মধ্যে, কত উচ্চাভিলাষী আর দুরাশীর দ্রুত আনা-গোনা দুস্তর ভাগ্যের অন্বেষণে,—কেবল সেই জনতার মাঝখানে একটিমাত্র পথিকের কোনো কাজ নেই, শুধু তার অন্যমনস্ক নিরর্থক চলা পথে পথে!

দুটো দীর্ঘদিন অশোকের কাটলো এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে, এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। কলকাতায় কি কিছু দেখবার নেই? যা নতুন, যা ভৌতিক, যা বিস্ময় আনে, যা অলৌকিক যাদু? এমন কি কেউ নেই, যে তাকে একটা প্রকাণ্ড ভেল্কী দেখিয়ে তা'র আত্মবিস্মৃতি ঘটাতে পারে? এমন তান্ত্রিক কি নেই, যার মন্ত্রে মানুষ হঠাৎ পাখী হয়ে উড়ে চ'লে যায়, কিম্বা চোখের পলকে সমস্ত প্রাসাদগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে?

দুটো দীর্ঘ শীতের রাত কী ক'রে কাটে—এটা হেনার সমাজের লোকের জানা নেই। ওরা নেমে আসে না নিচের দিকে। ওরা বড়, ওরা মহৎ, ওরা পরোপকারী। ওরা কলকাতার পার্কে সান্ধ্য-ভ্রমণে আসে, আসে না রাত কাটাতে, জানে না রাত বারোটায় পার্ক-রক্ষীরা কেমন ক'রে আশ্রিতদেরকে কুকুরের মতো তাড়ায়। ওরা থাকে অট্টালিকায়, জানে না সেই অট্টালিকার বহির্ভাগের সর্বাপেক্ষা নোংরা কানাচে বন্য জন্তুর মতো ভিখারীরা কেমন ক'রে আশ্রয় নেয়। ধন-দৌলৎ, যশ-প্রতিষ্ঠার জন্য যে-ঈশ্বরের নিকট ওরা কৃতজ্ঞ, ওরা জানে না ওদের সেই ঈশ্বর কী নিষ্ঠুর আঘাতে দরিদ্রের বুক ভেঙে দেয়।

দুটো দীর্ঘ রাতের কাহিনী থাক্ সকলের অজানা। কিন্তু অশোককে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। বারম্বার আঘাতে সে ভেঙেছে, কিন্তু চূর্ণ ত হয় নি। মার খেয়ে ধরাশায়ী হওয়া, আবার নতুন শক্তিতে উঠে দাঁড়ানো,—এই ত তা'র কাহিনী। বড় আঘাত যে সহ্য করে, বড় প্রতিশ্রুতি ত তারই

মধ্যে নিহিত! স্নেহের আশ্রয়কে সে প্রশ্রয় বলে মনে করেছিল, ভাল লাগাকে ভালোবাসা ব'লে ভুল করেছিল,—নির্বুদ্ধিতা ত তারই! সংসারে বহু ভালোবাসা ব্যর্থ হয়, বহু প্রেম অপমানিত হ'য়ে ধুলোয় লুটোয়, বহু হৃদয় পাথরে মাথা ঠুকে মরে,—কিন্তু কেউ ত পথের ধারে এমন ক'রে কাঁদতে ব'সে যায় নি! এ পৃথিবীতে জন্মেছিল সে অর্বাচীন হয়ে, দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতাই তা'কে মানুষ ক'রে তুলেছে। পাকা সোনার তাল কাজে লাগে না, আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ির আঘাত করলে তবেই সে-সোনা হয়ে ওঠে অলঙ্কার। ওরে অভিমানী, উঠে দাঁড়া, হেসে ওঠ, যেমন পৃথিবীর সব বিদুষকরা বিষাক্ত হাসি হেসে গেছে ঈশ্বরের এই পরিহাসিক সৃষ্টির দিকে চেয়ে। ওরে লুব্ধ কাঙাল, শাকের ক্ষেত দেখে মোহগ্রস্ত হয়েছিলি, এবার হেসে চলে যা।

তৃতীয় দিনের প্রায় দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে এক সময় এক গলি পথ থেকে বেরিয়ে অশোক হাঁটতে আরম্ভ করলো। শীতের তীব্র হাওয়ায় রাত্রি যেন আড়ষ্ট। পা দুখানা শিথিল, অনিচ্ছুক অসতর্ক। পথঘাট তখন জনবিরল। কতদূরে সে চললো হেঁটে হেঁটে; কত পথে কত বাঁক নিল। যেন সে সকল ব্যর্থতাকে ডিঙিয়ে চলেছে, মৃত্যুকে মাড়িয়ে চলেছে।

অবশেষে সরু গলি পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকে সে যখন উপরতলায় তা'র কোণের ঘরে এসে ঢুকলো, তখন চারিদিকে নিঃসাড় অন্ধকার। কেবল ভিতরে কেরোসিনের আলোটা জ্বলছে অতি ক্ষীণ শিখায়। সেইদিকে নিমেষ-নিহত চক্ষে চেয়ে রেণু পাথরের মূর্তির মতো জেগে ব'সে রয়েছে—। আচ্ছন্ন, অনড়, অসাড় মৃত্যুর মতো।

পায়ের শব্দে রেণু চমকে উঠে তাকালো। উঠে দাঁড়িয়ে আর্তকণ্ঠে সে বললে, দাদা?

কি বল্?

তিন দিন রইলে বাড়ির বাইরে? কোথা ছিলে?

যেন প্রেতিনীর নাসাকণ্ঠ—এমনি রুগ্ন এমনি ভগ্ন। কিন্তু অনেক শুনেছে অশোক, অনেক সহ্য তাকে করতে হয়েছে। আজ সে একটু বিশ্রাম চায়, একটু নির্বিঘ্নে সে থাকতে চায় একা,—বড় ক্লান্ত সে। একটু সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে সে একটু জড়িত কণ্ঠে বললে, রেঁধেছিস আজকে?

না,—রেণু বললে, আজ কিছু ছিল না তাই—

ও, সেদিনকার টাকাটা বুঝি সব খেয়েছিস ? ঘরে আছে কিছু ?

রেণু একটু ভীত দৃষ্টিতে তাকালো দাদার মুখের দিকে। তারপর বললে, আর ত কিছু নেই, পান্তাভাত আছে চারটি, তাই দিচ্ছি। তুমি হাত ধুয়ে নাও দেখি ?

বিরক্ত হয়ে অশোক বললে, পান্তা ? এই শীতে ? অসময়ে দু'টি খেতে দেবার সাধ্য তোর নেই, তুই এমনি অপদার্থ ? পান্তা, পান্তা খায় লোকে এই ঠাণ্ডায় ? অপমানে মাথা হেঁট করে আছি তোরই জন্যে, এবার তুই আমাকে মারতে চাস ? যাক্, দে, পান্তাই দে।

হাসলো একটু রেণু, সেই হাসি ওই আয়ুহীন প্রদীপের আলোয় ঠিক দেখা গেল না। তারপর কাছে এসে বললে, দিচ্ছি ভাত, কিন্তু এই বুঝি তোমার বিয়ে ? তিনদিন পরে বাড়ি এলে নেশা ক'রে ? নেশা করো তুমি আজকাল, দাদা ? তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল !

আবার সেই নাসাকণ্ঠী প্রেতিনীর আর্তস্বর। কিন্তু অশোক জবাব দিল না, কেবল তন্দ্রাজড়িত চক্ষে হাতখানা ধুয়ে এসে আলোটার কাছে বসলো। পুরুষ যে কী বেদনায় মাদকদ্রব্যে মস্তিষ্ককে বিকল ক'রে দেয়, শয়তানী নারীরা তা'র কী জানে ?

ক্ষুধাতুর মুখের কাছে পান্তাভাত আর কি যেন তরকারী এনে রেণু রেখেছিল। আলোটা তখন জ্বলছে ঠিক থালাটার উপর দিকে জানলার গোড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তটি, যে মুহূর্তে নিয়তির কটাক্ষে ঘটে যায় প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প। হেঁট হয়ে জলের গেলাস, আর কলাইয়ের থালায় ভাত দিয়ে রেণু যখন উঠে দাঁড়াবে, সেই সময়ে হঠাৎ অসাবধানে তা'র আঁচলটা লেগে কেরোসিনের ডিবেটা উল্‌টিয়ে প'ড়ে গেল ভাতের থালার উপরে। পান্তাভাত, তরকারী আর কেরোসিন তেলে থালাটা একেবারে একাকার হয়ে গেল।

তারস্বরে অশোক ধমক দিল, হতভাগী, করলি কি ?

রেণু স্তব্ধ।

সহসা উন্মত্ত হয়ে উঠলো অশোক। সহ্যের সীমা তার অতিক্রম করেছে। কিন্তু কোনো অভাব অনটন আর দারিদ্র্যের মধ্যে সে যা কল্পনা করে নি, তার

পক্ষে একান্ত যা অস্বাভাবিক, একান্তভাবে অপমানজনক,—আজ রাত্রির মস্তিষ্কবিকারের ঝোঁকে তারই জন্যে তা'র হাত নিশপিশ ক'রে উঠলো। সহসা জলের গেলাসটা তুলে নিয়ে উঠে প্রচণ্ডবেগে সে ঠনাৎ ক'রে রেণুর কপালে আঘাত করলো। বললে, লক্ষ্মীছাড়ি, আবার চুপ ক'রে আছিস? দোষ ক'রে আবার ন্যাকামি?—বলতে বলতে গেলাসটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে অন্ধকারে সে রেণুর চুলের গোছা মুঠোয় ধ'রে বীভৎস দস্যুপণা করলো, যা ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের সর্বপ্রকার নীতির বহির্ভূত।

বললে, তোর জন্যে আমার স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। আমার সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্যে তুই দায়ী,—তুই সেই একই শয়তানীর জাত, তোর নিশ্বাসে আমার জীবনে ঘুণ ধ'রে গেছে—

এই বলতে বলতে কিল, চড়, চাপড় ও শেষ অবধি লাথি মেরে অশোক নিজেই হাঁপাতে লাগলো।

রেণু মুখের এতটুকু শব্দ করলো না, একটু নড়লো না। নীরবে দাঁড়িয়ে আজ সমস্ত দৈহিক লাঞ্ছনা সহ্য করলো। অন্ধকারে কেউ কা'রো মুখ দেখতে পেল না, দুজনে দুজনকে দেখলে হয়ত শিউরে উঠতো।

এক সময়ে সে অকম্পিত কণ্ঠে বললে, রাগ পড়েছে দাদা?

না। তুই বেরো, বেরো ঘর থেকে, যেখানে খুশি দূর হয়ে যা।—এই ব'লে অশোক আন্দাজে তা'র গলাটা চেপে ধ'রে ঘর থেকে হিঁচড়ে টেনে বা'র ক'রে দিল।

বাইরে থেকে রেণু বললে, কিন্তু আমি গেলে তোমার চলবে?

বিকৃত মুখে অশোক বললে, চলবে, তুই দূর হয়ে যা।

রেণু একবার থমকে দাঁড়ালো। ঢোক গিলে বললে, বেশ, কিন্তু এই রাতে তোমার সহোদর ছোট বোন আমি একা কোথায় যাবো, তা ত কই বললে না দাদা? একবার ত জিজ্ঞেস করলে না, রেণু আজ তোর খাওয়া হয়েছে কিনা, কাল থেকে তোর জ্বর হয়েছে কিনা?

অশো[illegible]ড়া দিল না, কেবল ঘরের ভিতরে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

রে[illegible]থা বললে না, কেবল নিশ্বাস ফেলে এক সময়ে বারান্দা পেরি[illegible]ড়ি দিয়ে নেমে সে নিচে চ'লে গেল। সদর খোলাই ছিল।

দরজা পেরিয়ে গলিতে নেমে স্খলিত জড়িত পায়ে প্রহার-জর্জরিত দেহে সে বড়রাস্তার উপরে এসে একটিবার দাঁড়ালো। সর্বাঙ্গে বেদনা, সর্বশরীরে যন্ত্রণা —যন্ত্রণা ভিতরে বাহিরে আকাশে অন্ধকারে—যন্ত্রণা সমগ্র জীবনে। তবু কোনোদিন সে কাঁদেনি, আজো তার চোখে কান্না ছিল না—অথচ দুই শীর্ণ গাল বেয়ে তা'র অশ্রু নামলো কেমন ক'রে? আঁচল তুলে চোখ মুছতে গিয়ে অন্ধকারেও সে লক্ষ্য করলো, না, অশ্রু নয়, কপালের রক্তের ধারা নেমে এসেছে গাল বেয়ে। অশ্রু নয়, এই তা'র বড় সান্ত্বনা।

জনহীন দুইদিকের পথ। শীতের নিস্তব্ধ রাত্রি, সাঁ সাঁ করছে চারিদিকে: মৃত্যুর মতো অসাড়। বাঁদিকে কয়েক পা বাড়িয়ে কিছুদূর অবধি অগ্রসর হয়ে রেণু হঠাৎ থামলো। কোথায় যাবে সে? কোথায় তা'র স্থান? ভদ্র মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মেছে, হাঁটতে ত সে জানে না। পরের অন্নে আর পরের আশ্রয়ে তা'র পরমায়ু, মুখ বুজে মার খাবার জন্যই তা'র জীবন ধারণ, অপমান আর উৎপীড়ন সহ্য ক'রে থাকাই তার নারীধর্ম,—নিজের পায়ে হাঁটতে গিয়ে বিপ্লব বাধাবে সে কোন্ সাহসে? কেমন ক'রে জাগে সমাজ-বিপ্লব, কেমন ক'রে জ্বলে ঘরে ঘরে আগুন, কোন্ মন্ত্রে পাগলিনী রুদ্রাণীর বুকের রক্তে নেচে ওঠে সংহার-পিপাসা—সে তা'র কী জানে! সে যে নগণ্য এক বাঙালীর নিরুপায় মেয়ে!

রেণু আবার ফিরে এলো ভীরু দুই ঝাপসা চোখে পথ চিনে চিনে। বাড়ির ভিতরে পুনরায় নিঃশব্দে ঢুকে ক্লান্ত শরীরে সোজা উপরে উঠে এলো। বারান্দা পেরিয়ে অন্ধকারে ঘরে ঢুকে দেশালাইটা খুঁজে একটা কাঠি জ্বালালো। দেখলো, অশোক ঘরে নেই, ইতিমধ্যে কখন সে বেরিয়ে চ'লে গেছে। আজকে রাত্রে সে আর ফিরবে না, রেণু জানে। দেখতে দেখতে দেশালাইয়ের কাঠিটা নিবে গেল। একা রইলো রেণু!

অশোক সে-রাত্রে বেশিদূরে যেতে পারে নি। একে দি[illegible]র অসীম ক্লান্তি, তা'র উপরে মস্তিষ্ক বিকারের প্রবল উত্তেজনা—স্তু[illegible]ঘাটার নতন পুলের কাছে এসে শান-বাঁধানো পেটির ধারে সে শ্রান্ত[illegible]ব'সে

পড়লো। আজ রাত্রেও সে তা'র ঘরে ফিরবে না। ভদ্র সন্তান হয়ে সে যে কদর্য দৃশ্যের অবতারণা ক'রে এসেছে, সেই বীভৎস অধঃপতনের চেহারা স্মরণ ক'রে আতঙ্কিত মনে সে চুপ ক'রে ব'সে রইল। রাত্রির অবাস্তব পটভূমিকায় এই ঘটনা ঘটে গেল বটে, কিন্তু দিনের আলোয় জনতার মাঝখানে সে মুখ তুলে তাকাবে কেমন ক'রে? কোন্ মুখে সে গিয়ে দাঁড়াবে রেণুর কাছে? রেণু কি হাসিমুখে ক্ষমা করবে কোনোদিন?

ঘুমে তা'র চোখ বুজে এলো। কিন্তু সকল কথা ভাববার মতো দৈহিক অবস্থা তা'র আর ছিল না। জামা-কাপড় জড়িয়ে পুঁটুলির মতো সে সেখানেই কাত হয়ে পড়লো। শীতের বাতাস তা'র উপর দিয়ে বইতে লাগলো।

ঘুম ভাঙলো তা'র সকালে, গায়ে রোদ এসে পড়েছে। শীতে আড়ষ্ট শরীর, হাত-পা তুহিনশীতল। মধুর শীতের রৌদ্রে পথের জনকোলাহলের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ সে ব'সে রইলো! গতরাত্রির অবসাদ আর উত্তেজনা কিছু নেই—তা'র হৃদয়-দিগন্তে যেন এক প্রকার প্রশান্ত আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে। চিত্তের মালিন্য মুছে গেছে, মানুষের উপর আর আক্রোশ নেই, জীবনের বিরুদ্ধে আর অভিযোগ নেই। সহজ আনন্দে এবার গিয়ে সে রেণুর কাছে ক্ষমা চাইবে। বলবে, রেণু, মানুষ কখনো ছোট নয়। যত নষ্টই সে হোক, সব জঞ্জাল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একসময় সে উঠে দাঁড়ায়, সেই তা'র মনুষ্যত্ব। দারিদ্র্য পাপ, দারিদ্র্যই মানুষকে টেনে নিচে নামায়।

হাজার টাকার চেকখানা তার পকেটেই রয়েছে, এটা আজ ভাঙাবার দিন। টাকা এনে সে রেণুরই হাতে দেবে। আগামী মাসের পয়লা থেকে তা'র চাকরি—সে কথাও রেণুকে জানাবে। গিয়ে বলবে, উঠে দাঁড়া রেণু, ছেঁড়া মাদুর আর ছেঁড়া কাপড় আর দরিদ্র ঘরকন্নার জঞ্জাল, সব পিছনে পড়ে থাক্—চল্ আমরা চ'লে যাই, যেদিকে জীবন সুন্দর, যেদিকে স্বাস্থ্য, যেদিকে বাঁচার আনন্দ। তুই আর আমি দু'জনে গ'ড়ে তুলবো নতুন সমাজ, নতুন আদর্শ, নতুন বিপ্লবের আনন্দ। আমরা দুটি ভাই-বোন, আমাদের একই মাতৃহৃদয়, একই মাতৃ[illegible] তোর আর আমার পিছনে রয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভাই আর বোন। তাদের সকলের সঙ্গে চল্ আমরা এগিয়ে যাই, রেণু। সময় আর নে[illegible]ই, উঠে দাঁড়া অনন্ত উৎসাহে আর আনন্দে।

অশোকের চক্ষু দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

শীতের বেলা, এরই মধ্যে সম্ভবত দশটা বাজে। অশোক গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বাসার দিকে চললো। বাসা বেশি দূরে নয়। কিন্তু কাছাকাছি এসে সে একবার থমকে দাঁড়ালো। দেখলো সেই গানের আড্ডার ধারে গলির মুখে রাস্তার লোকে লোকারণ্য।

ভিড় ঠেলে গলিতে ঢুকে বাড়ির দরজার কাছে এসে দেখা গেল, কয়েকটি লালপাগড়ি পুলিশের লোক। কিন্তু তাকে দেখেই সবাই হৈ চৈ ক'রে উঠলো। একজন পাহারাওয়ালা তাকে নিয়ে উপরে উঠে যেতেই গিন্নী হাউ মাউ ক'রে উঠলেন,—ও বাবা, আমার বাড়িতে একি সবনেশে কাণ্ড, বাবা? এমন কালসাপকে আমি ঘরে জায়গা দিয়েছিলুম?

ছোট দারোগা অশোককে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকলো। ঘটনাটা খুবই সাধারণ! অর্ধনগ্ন রেণুর দেহটা ঘরের কড়িকাঠে কাপড়ের ফাঁস বেঁধে তখনো ঝুলছে। অশোক চেয়ে দেখলো, আধখানা কাপড় কোনমতে গায়ে জড়িয়েছে, বাকি আধখানা পাকিয়ে সে দড়ি বানিয়েছিল। রেণুর কপালের উপরে তারই দেওয়া ক্ষতচিহ্নে তখনো রক্তের দাগ শুকিয়ে রয়েছে। মুখের ভিতর থেকে জিবটা বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু সেই মুখ বিকৃত নয়, যেন পৃথিবীর সবাইকে সে সস্নেহে মার্জনা ক'রে গেছে। ঘরখানা সে অপরিচ্ছন্ন রেখে যায় নি, পাছে অশোকের অসুবিধা হয়। আলোটা তখনো টিপ টিপ ক'রে জ্বলছে।

গিন্নী বললেন, আদ্ধেক রাত্তিরে গিয়ে আমার কাছে কেরোসিন তেল একটু চেয়ে এনেছিল, বাবা।

দারোগা বললেন, আজ ভোরে গলায় দড়ি দিয়েছে, লাস এখনো তাজা। বোধ হয় জানলা দিয়ে উঠে কড়িকাঠে ফাঁস লাগায়। প্রথম চেষ্টায় প'ড়ে গিয়ে কপাল কেটে যায়, মনে হচ্ছে। এই চিঠিটা উনি বেঁধে রেখেছিলেন নিজের পায়ে।—ব'লে তিনি একটুকরো কাগজ দিলেন অশোকের হাতে। তা'তে পেন্সিলে লেখা: আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করলুম, এই মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। দাদাকে প্রণাম।—রেণু।

গিন্নী বললেন, আদ্ধেক রাত্তিরে তেল চেয়ে আনলো! কে জানতো বাবা, সব্বনাশি এই কাজ করবে? সকাল আটটা বেজে যায়, দেখছি আজ রেণুর সাড়া-শব্দ নেই। ওপরে এসে দেখি এই কাণ্ড, বাবা। ক্যান্তর মাকে খবর দিলুম, সে আসছি ব'লে কোথায় চ'লে গেল। ও-বাড়ির সেই গেরস্থরাও নেই, ছেলে আর বউকে নিয়ে বাবুটি তিন দিন আগে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেছে। আমি বাবা আর কি করি, রাস্তায় গিয়ে চেঁচামেচি করতে লাগলুম। আহা, মেয়ে ছিল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, বাবা।

দোলায়মান মৃতদেহের দিকে চেয়ে অশোক চিন্তিতভাবে বললে, কিন্তু গলায় দড়ি দেওয়া রেণু শিখলো কেমন ক'রে? এসব আগে ত কখনো সে দেখেনি? জানলায় উঠে গেরোটা কেমন ক'রে বাঁধলো,—আশ্চর্য!

দারোগা তা'র কঠিন নির্বিকার ও নিরুদ্বেগ মুখের দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন, বাঁচাটা কঠিন, কিন্তু মরাটা খুব সহজ, অশোকবাবু।

বাঁচাটা কঠিন, সন্দেহ নেই। কারণ মৃত্যুর চেয়ে বাঁচার যন্ত্রণা অনেক তীব্র, সবাই জানে। তবু, অশোক ভাবলো, সর্বব্যাপী বিপ্লবের প্লাবন এনে যদি এই বাঁচার যন্ত্রণাকে লাঘব করা যেতো! মনুষ্যত্বকে তা'র মহৎ গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মানুষের সহজ অধিকারকে স্বীকার ক'রে নেবার জন্য সব দেশেই যেমন কালে কালে চলিত জীবন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটেছে, অশোক চেয়ে দেখলো, এদেশে তা'র আভাস কই? রেণু বাঁচলো না, রেণুকে বাঁচানো গেল না,—কিন্তু তা'র শেষ নিশ্বাসে এমন বিষ কি ছিল না, যাতে ঘরে ঘরে মানুষের প্রত্যহের জীবনযাত্রাকে বিষাক্ত ক'রে তোলে?

নতুন পদ্ধতিতে অশোক তা'র জীবন আরম্ভ করবে, কারণ জীবন গতিশীল। কিন্তু আরম্ভ হবে কোন্ মন্ত্র নিয়ে? রেণুর মৃত দেহের বুকে কান পেতে কোন্ বাণী সে শুনতে পেয়েছিল?

ময়না তদন্তের পরে করোণার কোর্টে একবার তাকে হাজিরা দিতে হয়েছিল বৈকি। পুলিশের তদন্তে ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেছে, কুমারী নারীর পক্ষে যা একান্তভাবে নৈতিক অপরাধ, যা আত্মহত্যার পাপ অপেক্ষাও ভীষণতর, কোনো যুগের কোনো সমাজের কোনো নীতিই কুমারীর যে অপরাধকে মার্জনা করে নি, রেণুর দেহের মধ্যে সেই অপরাধ বাসা বেঁধেছিল!

এ তা'র কল্পনার অতীত। ক্ষ্যান্তর মা'র চক্রান্ত অথবা মধ্যস্থতা সে বুঝতে পারে নি, দয়ালু প্রতিবেশীর অধ্যবসায়ও তা'র অজানা র'য়ে গেল।

কিন্তু এমন ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, তবে তা'তে অশোকের বিস্ময় যদি বা আছে, অপমান লজ্জা অথবা ধিক্কার নেই। এই কলঙ্কের সংবাদ নিয়ে পৃথিবীর ভদ্রসমাজ চীৎকার করুক, নিন্দা করুক, তা'র ক্ষতিবোধ নেই। কিন্তু রেণু আর তা'র কোটি কোটি দরিদ্র ভাই-বোনেরা, যারা দারিদ্র্যে নতশির, যারা উৎপীড়িত, বঞ্চিত, ব্যর্থ,—এই কলঙ্ক সংবাদে তা'দের চক্ষুও কি শুষ্ক থাকবে?

চলতে চলতে অশোক কেবল সেই কথা ভাবে।

আলো আর আগুন

এক

ট্রেন ছুটিতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্বে একটা স্টেশন ছাড়িয়া আসিয়াছে, ঘণ্টা-খানেকের আগে ডাকগাড়ী আর কোথাও থামিবে না। বেলা পাঁচটায় কলিকাতায় পৌঁছিবে।

শরৎকাল। পথে, প্রান্তরে, দূরদিগন্তে দ্বিপ্রহরের সূর্যকিরণ পালিশ-করা সোনার মতো ঝলমল করিতেছিল। জলা ও বিলগুলিকে বেষ্টন করিয়া কাশফুলের গাছগুলি বাতাসে মাথা দুলাইয়া অভিবাদন জানাইতেছে। মাঝে মাঝে সংকীর্ণ গ্রামের পথ তাল, সুপারি ও খেজুরের জটলার ভিতর দিয়া কোন্ দিকে যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে। কোথাও কোথাও বনময় গ্রাম ছবির মতো শস্যক্ষেত্রের পটে আঁকা।

আকাশ ঘন নীল, তাহারই একান্তে শ্বেতকায় এক বিরাট মেঘখণ্ড দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতেছিল।

ইণ্টার ক্লাসের একখানা ছোট কামরায় মাত্র তিনটি যাত্রী। একটি বর্ষীয়সী গৌরাঙ্গী মহিলা; বয়স প্রায় চল্লিশ হইবে। পরনে রাঙাপাড় একখানা তসরের শাড়ি, হাতে সামান্য অলঙ্কার, গলায় একগাছি সরু হার চিকচিক করিতেছে। চোখ দুটি বড় বড়, মুখখানি প্রসন্ন; বিগত-যৌবন হইলেও প্রশান্ত লাবণ্যে আজিও দীপ্ত। মাথায় সামান্য ঘোমটা, তাহারই পাশ দিয়া রুক্ষ কোঁকড়ানো চুলের গোছা কপাল বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে। জানালার কাছে বসিয়া আছেন, মাথার উপরে এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়াছিল একটি তরুণ যুবক। কুড়ি-একুশ বছরের বেশি নয়। এতক্ষণ গাড়ীর ভিতরে দাপাদাপি করিতেছিল, এইবার স্থির হইয়া বসিয়াছে। একখানা কাগজ আর পেন্‌সিল লইয়া সে কী যেন করিতেছিল।

হঠাৎ মুখ তুলিয়া সে ডাকিল, মা? মা, শুনচ?

মা সাড়া দিলেন না, তেমনি করিয়াই বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে একটি স্নেহের হাসি মাখানো ছিল।

ছেলেটি উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—ও, শুনতে পাওনি বুঝি? মা-অ-আ—এই কালা—

মা মুখ ফিরাইলেন না। কেবল তাঁহার মুখ হইতে একটি হাসির শব্দ বাহির হইয়া আসিল। ছেলেটি তাহার হাতের কাগজের টুক্‌রাটা একবার পরীক্ষা করিল, তারপর পুনরায় চেঁচাইয়া উঠিল, এই পদ্মাবতী-!

মহিলা মুখ ফিরাইলেন। হাসিমুখে কহিলেন, ভারী বেয়াড়া তুমি, বীরু। ও কি, ছবি আঁকা হচ্ছে বুঝি ব'সে ব'সে?

বীরু তাহার কাগজের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, আঃ—ভারী নাড়িয়ে দিচ্ছে গাড়ীটা, ব্লাডি।—তারপর মুখ তুলিয়া পুনরায় বলিল, তোমার চুল কালো নয়, উঁহু!

পদ্মাবতী বলিলেন, আমার চুল শাদা।

না, তাম্‌রার রং। আগুনের আভা।—ধ্যেৎ তেরি, ছবি আঁকা যায় না।—বলিয়া বীরু কাগজখানা ছিঁড়িয়া দিল। বলিল, আমাকে তোমরা অর্বাচীন বলো কেন? প্রতিমার সুখ্যাতি করব, আর মায়ের চেহারাকে ভালো বলব না?

পদ্মাবতী বলিলেন, কী নোংরা করেচিস কাপড়-চোপড়? চায়ের দাগ, তরকারীর দাগ, বাসি দুধের গন্ধ, কয়লার গুঁড়ো—একেবারে কিম্ভূত কিমাকার! একটু যদি পরিষ্কার থাকতে পারে! হাওড়ায় গিয়ে নামলে লোকে হাসাহাসি করবে, দেখো।

বীরু উঠিয়া পড়িল। কহিল, ছবি আঁকতে দিলে না, গাড়ীটা ঢেউ খেলিয়ে দিচ্ছে। আঃ কী দিন,—দাও গালাগাল, একটু কবিত্ব আমি করবই—আমি যে কবি! অদ্ভুত রং আকাশে, শিউরে উঠছে রোদ। ওর নাম কি মা? জলা, না বিল? চমৎকার, সূর্যকিরণ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে জলে!—এই বলিয়া সে চলন্ত ট্রেনের কাম্‌রায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পদ্মাবতী অনেক পাগলামি শুনিয়াছেন, অনেক সহ্য করিয়াছেন। উত্তর

দিবার মতো, কথা বলিবার মতো কিছু নাই। পুত্র তাঁহার দুরন্ত, শাসন সে মানে না, আপন প্রাণচাঞ্চল্যে সে অধীর।

হঠাৎ এক সময় ওদিককার বেঞ্চ হইতে চীৎকারের শব্দ শুনিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার চাকর চন্দর সকাল হইতে সেই যে পড়িয়া-পড়িয়া ঘুমাইতেছে, এখনও পর্যন্ত উঠে নাই। বীরু তাহার কানে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া দিয়াছে। পদ্মাবতী কহিলেন, লাগে নি ত চন্দর ?

চন্দর কহিল, লাগে নি মা, চম্‌কে উঠেছি।

এমন অস্থির ছেলে আমি দেখি নি। ওর জ্ঞান নেই যে ওর কুড়ি বছর বয়স পার হয়ে গেছে। বলিয়া পদ্মাবতী পুনরায় পা গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন।

চন্দর জাগিল, আর একটি প্রাণীকেও জাগাইতে বাকি ছিল। বীরু হেঁট হইয়া এইবার তাহাকে বেঞ্চের তলা হইতে বাহির করিয়া কোলে তুলিল। তাহার নাম পপি। ছোটবেলা হইতে বীরুর কাছে মানুষ হইয়াছে। গায়ে একরাশি পাটকিলে রংয়ের লোম। চোখ দুইটা কটা, নাকটি কালো, পায়ের আঙুলগুলিতে শাদা-শাদা দাগ। বিলাত হইতে সে আসিয়াছে কিনা কে জানে, কিন্তু তাহাকে বলে বিলাতী কুকুর।

বীরু তাহার গলা জড়াইয়া খানিকক্ষণ আদর করিল। কুকুরটাও সম্মতি দিতেছিল।

এক সময় তাহাকে ছাড়িয়া সে পদ্মাবতীর কাছে আসিয়া বসিল। তারপর তাঁহার দুই পা ধরিয়া কহিল, মা ? আচ্ছা, বি-এ পড়া ছেলের আদুরেপনায় তোমার গা জ্বলে, না ?

মা মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিলেন, তাই বুঝি এলে জ্বালাতে ?

না। বীরু কহিল, আমাকে কিন্তু বলতে হবে একটা কথা। তোমার মাথায় সিঁদুর, পরনে শাড়ি, কিন্তু তোমার স্বামী কোথায় ? মানে, আমার বাবা ?

পদ্মাবতী কিয়ৎক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার স্নেহের হাসি যেন সন্ধ্যার আকাশের শেষ সূর্য-রশ্মির মতো মিলাইয়া গেল। এমন আকস্মিক প্রশ্নের কী উত্তর তিনি দিবেন ? অজ্ঞান সন্তান, হয়ত আরো কিছু অসুবিধাজনক প্রশ্ন করিয়া বসিবে। তাঁহার দুইটা বড় বড় কালো চোখ যেন

ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্ম; তারপরেই তিনি বীরুকে কাছে টানিয়া লইলেন, বলিলেন—আছেন তিনি, তাঁকে কি তোর দেখতে ইচ্ছা করে?

জানালার বাহিরে গাছপালা, মাঠ-ঘাট যেন পিছনদিকে ছুটিয়া যাইতেছে। তাহাদের দিকে তাকাইয়া বীরু অনেকক্ষণ কি-যেন চিন্তা করিল, তারপর কহিল—আচ্ছা, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন মা? মানে, আমার বাবা?

মায়ের মুখ মুহূর্তে যেন আত্মগৌরবে জ্বলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করিয়া পুত্রের পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন—থাক্ বীরু, ও-কথা আলোচনা করতে নেই।

বীরু কহিল, স্বাস্থ্য বুঝি তাঁর খুব ভালো?

পদ্মাবতী পুত্রের দিকে তাকাইলেন। মাত্র কুড়ি বৎসর পার হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ বালকের মতো বীরুর বলিষ্ঠ ও সুন্দর শরীর, পেশীবহুল গঠন, উন্নত দীর্ঘ দেহ। এমন সন্তান যাঁহার তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রশ্ন? তিনি হাসিতে লাগিলেন। কী বলিয়া তিনি সেই চেহারার বর্ণনা করিবেন!

বীরু পুনরায় প্রশ্ন করিল, তিনি গোঁফ-দাড়ি রাখেন, না কামান্?

পদ্মাবতী কহিলেন, তখন গোঁফ ছিল তাঁর। বীরু, এবার অন্য কথা বলো বাবা?

বীরু অন্য কথা বলিল না, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল। আজ ইহা নূতন নয়। এক বছর, দুই বছর যায়—অকস্মাৎ বীরু এক-একদিন এমনি প্রশ্ন করিয়া বসে। মায়ের মুখে উত্তর আসে না, মনটা যেন আঘাতে আন্দোলিত হইতে থাকে। এমনি করিয়াই প্রায় আঠারোটি বৎসর গিয়াছে।

বীরু তাঁহার কাছ হইতে এইবার উঠিয়া গেল, তারপর কামরার ভিতর কিয়ৎক্ষণ পায়চারি করিতে করিতে এক সময় কহিল, আমার কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করে না!

কেন রে?—পদ্মাবতী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।

বীরু মায়ের মুখের দিকে তাকাইল। এই প্রসন্ন মাতৃমূর্তির ভিতরে কোথায় যেন একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা গভীর অন্তরের ভিতরে জমিয়া আছে, অল্প বয়স হইলেও বীরু তাহা অনুভব করিতে পারে। বেদনার ইতিহাসটা সে

জানে না, তাহার চেহারাটাও বীরুর নিকট স্পষ্ট নয়, কিন্তু ইহাকেই ঘিরিয়া কোথায় যেন একটা অন্যায় ঘটনা জমা আছে, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া এই কথাটাই সে যেন জানিয়া রাখিয়াছিল।

সে আমি জানিনে।—বলিয়া বীরু মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। গাড়ীর ভিতরে আর তাহার ভাল লাগিতেছে না।

হাওড়া স্টেশনে গাড়ী আসিয়া পৌছিল। ট্রেনের গতি থাকিতে থাকিতেই বীরু প্ল্যাট্‌ফরমের উপর নামিয়া পড়িল। চন্দর গাড়ী হইতে নামিয়া কুলি ডাকিয়া লইল।

বীরু কহিল, আমি এখন বাড়ি যাবো না মা।

পদ্মাবতী কহিলেন, জামা কাপড় অমন নোংরা, ওই নিয়ে কোথায় যাবি? লোকে যে ঘেন্না করবে!

ঘেন্না করবে?—বীরু হাসিয়া পুনরায় কহিল, ঘেন্না করবে এমন মানুষের কাছে যাবো কেন?—এই বলিয়া পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া মায়ের হাতে কিছু টাকা দিল।

জিনিসপত্র অনেক। একমাসের জন্য তাঁহারা বাহিরে ছিলেন, সুতরাং লগেজের সংখ্যা মাত্রা ডিঙাইয়া গিয়াছে। চার-পাঁচটা কুলির মাথায় মালপত্র চাপাইয়া তাঁহারা সকলে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দুইখানা ট্যাক্সি মোতায়েন করিলেন। কুকুরটা তাহার কাঁধে চড়িয়া আসিতেছিল, এইবার বীরু তাহাকে চন্দরের পাশে তুলিয়া দিল।

তবু তোমাকে ওই নোংরা কাপড় প'রে যেখানে সেখানে যেতে হবে, কেমন বীরু?—পদ্মাবতী রাগ করিয়া কহিলেন।

বীরু কহিল, তোমার পায়ে পড়ি মা, লক্ষ্মীটি। এখুনি না গেলেই চলবে না, ভীষণ জরুরী। এক মিনিট এদিক-ওদিক হলেই…বুঝলে, পৃথিবী ওলোট-পালোট, সৃষ্টি যাবে রসাতলে।—বলিতে বলিতে হাসিয়া সে পলাইয়া গেল।

পদ্মাবতীর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তিনি ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন, ভবানীপুর, ল্যান্সডাউন্ রোড।

বীরু একবার দাঁড়াইল। সম্মুখে হাওড়ার পুল, ডানদিকে গঙ্গা, ওপারে কতকগুলা চিমনি ও বড় বড় বাড়ি দেখা যাইতেছে, মানুষের ঘন জটলায় সমস্তটা জটিল; ইহাদেরই ভিতর একবার থামিয়া সে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া একবার হাসিল। অনেকদিন পরে কলিকাতায় সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এ যে কত বড় রোমাঞ্চকর আনন্দ তাহা কেবল সেই জানে। সমস্তটা মিলিয়া তাহাকে যেন অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানাইতেছে।

একখানা ট্যাক্সি পার হইতেছিল, হাত দিয়া তাহাকে থামাইয়া বীরু চড়িয়া বসিল, তারপর কহিল, পার্ক সার্কাস চলো।

মোটর ছুটিল!

কেমন করিয়া পথ পার হইল কে জানে। সে যেন একটা অদ্ভুত প্রাণের তাড়ায় ছুটিয়াছে, আর কোনোদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। পিছনের কুশনে ঠেসান দিল না, উদ্বিগ্ন হইয়া সোজা বসিয়া রহিল। ঝাঁপা ঝাঁপা কালো চুলের গোছা বাতাসে দুলিতেছে; ট্রেনের ধকলে চেহারাটা কিছু মলিন। প্রাণ-শক্তি তাহার প্রচুর, বয়সের তারুণ্যটা আরো বেশি, সুতরাং পরিচ্ছদের পারিপাট্যের দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বয়সের সহিত আগে পরিচ্ছদের প্রশ্ন। মনে মনে বলিল, কর্তব্যটা প'ড়ে রইল, মায়ের চেয়ে বড় হোলো মায়া!

পশ্চিম দিকে সূর্য নামিয়াছে। বেলাটা গোধূলি। এখনও সন্ধ্যার আলো জ্বলে নাই। পূর্বদিকে মেঘ করিয়াছে, বৃষ্টি আসিতে পারে। এমন সময় গাড়ী থামাইয়া পার্ক সার্কাসের একটা রাস্তায় বীরু নামিয়া পড়িল। মীটার দেখিয়া ভাড়া দিল, বকশিশ দিল।

পথের ওপারে হালফ্যাশনের একখানা বাগান-বাড়ি। ফটকের উপর মালতীর ঝাড়, পাঁচিলের পাশে একটা শিউলী গাছ—তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। ঢুকিবার পথে চাপরাশি বসিয়াছিল, বীরু তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। সম্মুখেই আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত বৈঠকখানা। সেখানে রুচির চেয়ে বস্তু-বৈচিত্র্যের প্রাধান্য। বিলাতী, জাপানী, চীনা, জার্মানী, ফরাসী, মার্কিনী—নানা দেশের সৌখীন আসবাবের বাহুল্যে ঘরখানা যাদুঘরে পরিণত হইয়াছে, ইহার নিজস্ব কোনো পরিচয় নাই। বোধ করি হাল আমলের অভিজাত।

জনতিনেক ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বিশেষ একজনের দিকে চাহিয়া বীরু প্রশ্ন করিল, রাণু কোথায় ?

ভদ্রলোক উষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, কী দরকার তাকে ?

ওঃ সে খুব জরুরী। রাণু নেই ?

ভদ্রলোক উঠিয়া আসিলেন, কহিলেন, আবার এসেছ ? তোমাকে না মানা করা হয়েছিল এখানে আসতে ? ভারী ইতর ত !

এতক্ষণে বীরুর মনে পড়িয়া গেল, সত্যই এখানে আসিতে তাহাকে অনেকবার নিষেধ করা হইয়াছিল, কিন্তু উত্তেজনা ও আগ্রহে কথাটা কিছুতেই তাহার মনে থাকে না। বয়সের সহিত আসে বিবেচনা, সে-বয়স তাহার এখনও হয় নাই। বলিল, মানা করেছেন, কিন্তু আমার যে দরকার !

অন্য দুইটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন কহিলেন, দরকার ? তোমার মাথা খারাপ নাকি হে ?

বীরু তাঁহাদের দিকে চাহিল না। কেবল রাণুর বাবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দেখা করতে দেবেন না ?

ভদ্রলোক তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, তুমি জানো যে তোমাকে আমি জব্দ ক'রে দিতে পারি ?

বীরু উত্তরে হাসিল, হাসিয়া কহিল, বোধ হয় পারেন না। কী করেছি আপনার ? রাণুকে দেখতে এসেছি, একটা কথা বলেই চ'লে যাবো। দয়া ক'রে একবার ডেকে দিন্।

অন্য ভদ্রলোক দুইটি এইবার উঠিয়া আসিলেন। কহিলেন, এঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার কেমন ক'রে আলাপ হোলো ?

কেমন ক'রে ?—বীরু হাসিমুখে বলিল, ওঃ, সে ভারী মজার ! গতবছরে নৈনীতালে আলাপ হয়। সেখানে একটা লেক আছে, রাণু পা পিছলে, বুঝলেন না, তার ধারে গড়িয়ে পড়ে। আমি ছিলুম ত সেখানে ?—আর কি— তুললুম হাত ধ'রে—romantic, thrilling experience. কী যে ভালো লাগল ! জানেন আপনারা, রাণু কী intelligent, কী accomplished ?

তাঁহারা ইহার স্পর্ধায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বীরু বলিয়া চলিল, অদ্ভুত মেয়ে, তাকে ঘিরে কেমন একটা আশ্চর্য রহস্য ঘুরে বেড়ায়।—

কেমন দেখতে? কবিত্বটুকু ক্ষমা করবেন।—বলিয়া সে নিজের আনন্দে অন্ধের মতো হাসিতে লাগিল, লাবণ্য-লতা! 'শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল অপরূপ মুখ।'

রাণুর বাবা দাঁড়াইয়া রাগে কাঁপিতেছিলেন। প্রথম ভদ্রলোক কহিলেন, তুমি কবিতা লেখো নাকি?

লিখি। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি। বাড়িতে পড়ি।

আর কি করো?

আর? রাণুর চিঠির উত্তর দিই, তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলি। তাকে স্বপ্ন দেখি।

কি বললে?—বলিয়া রাণুর বাবা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।—চাবুক—চাবুক মেরে তোমার পাগলামি সারিয়ে দিতে পারি, জানো? বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

কেন? বলিয়া বীরু দাঁড়াইল; পুনরায় কহিল, কি করলুম আমি? আপনার মেয়েকে ভালবাসি, আপনি ত খুশি হবেন—তাতে ত আপনার আনন্দ, মিষ্টার লাহিড়ী!

আনন্দ? শোনো মিষ্টার পাল, what the rascal is talking about!

এমন সময় শরৎকালের মেঘ হইতে বিনা নোটিশে চড়বড় করিয়া বৃষ্টি আসিল। বীরু দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মাথায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সে গ্রাহ্য করিল না।

মিষ্টার পাল কহিলেন, Let us see how far he goes. হ্যাঁ, কী বলছিলে? ওঁর আনন্দ হবে কি জন্যে?

বীরু কহিল, নিশ্চয় আপনার আনন্দ হবে। রাণু যখন ছোট্ট ছিল, বলুন ত, সবাই তাকে আদর করলে খুশি হতেন না? আজো আপনাকে খুশি হতে হবে, I love her, I am the lover! দয়া ক'রে একবার তাকে খবর দিন্।

রাণু তোমাকে চিঠি লেখে?—মিষ্টার পাল অনুসন্ধিৎসুভাবে প্রশ্ন করিলেন।

মিছে কথা।—মিষ্টার লাহিড়ী উগ্রকণ্ঠে কহিলেন, মিছে কথা, আমার মেয়ে এমন কাজ করতেই পারে না।

বীরু কহিল, পারে না? আপনি তাকে কতটুকু জানেন? আপনার চেয়ে তার বুদ্ধি! চমৎকার চিঠি, চিঠির মধ্যে আগুনের রস—আঃ আশ্চর্য তার ভাষা, আশ্চর্য তার মন। তার চিঠি আমার কাছে থাকলে দেখাতুম আপনাদের। তাকে ডাকুন, আমি বলব তার সামনে।

তোমার মতন বোকা আমরা দেখি নি।—ব্যানার্জি ফস করিয়া কহিলেন।

বোকা আমি? কে বললে? ভালোবাসলে বোকা হয়? You love your ladies and are you all fools? মিষ্টার লাহিড়ী, আপনি কি বোকা?

মিষ্টার লাহিড়ীর চোখের ভিতর দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। বীরু পুনরায় কহিল, রাণু বলেছে আপনার কথা। কোর্ট্‌ থেকে বেরিয়ে মোটর নিয়ে আপনি কোথায় যান্‌, মিষ্টার লাহিড়ী?

মিষ্টার লাহিড়ী বিপন্ন হইয়া বন্ধু দুইজনের দিকে তাকাইলেন; তারপর হঠাৎ রাগে অন্ধ হইয়া তিনি কি-যেন করিতে যাইতেছিলেন, বন্ধুরা তাঁহাকে বাধা দিলেন। তার পর মিষ্টার ব্যানার্জি কহিলেন, পাকাপাকা কথা! তুমি তার কী জানো হে?

বীরু হাসিয়া কহিল, উনি যান্‌ বালীগঞ্জে, একটি বিধবা ভদ্রমহিলার ওখানে গিয়ে রোজ চা খান্‌! রাণুর মা মারা যাওয়ার পর—

ব্যানার্জি ও পাল মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। লাহিড়ী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। স্কাউন্‌ড্রেল্‌! জানেন মিষ্টার পাল, ওর রক্তের মধ্যে বিষ আছে, আমি জানি ওর মায়ের স্ক্যাণ্ডাল্‌—

বীরু কহিল, কী জানেন?

লাহিড়ী কহিলেন, তোমার বাবা কোথায়? তোমার মা একলা থাকে কেন? জানিনে কিছু?

বীরু কহিল, তারপর? বলুন ত কি জানেন?

তারপর তোমার মাথা!—লাহিড়ী গর্জন করিলেন।

কিছুই জানেন না তা'হলে!—বীরু কহিল, আমিও যতটুকু জানি, আপনিও

ততটুকু। মা থাকেন একলা, কেন তা জানিনে। জিজ্ঞেস করেছি, মা হাসেন! সত্যি বলছি, বাবাকে আমি কখনো দেখিনি; শুনেছি তাঁর কথা। Oh, how beautiful my mother is! তাঁকে আপনারা দেখেন নি! রাণুর মতন মুখ, রাণুর মতন রূপ!—বৃষ্টিতে তাহার সর্বশরীর ভিজিয়া জল পড়িতেছিল।

মিষ্টার পাল কহিলেন, পাগল!

ব্যানার্জি কহিলেন, ছাগল!

লাহিড়ী কহিলেন, তুমি বেরিয়ে যাবে কিনা? এই চাপরাসী—

হুজুর।—বলিয়া চাপরাসী আসিল।

বীরু কহিল—আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি। কিন্তু দয়া ক'রে একটিবার—একটিবার রাণুকে খবর দিন। খবর পেলেই সে ছুটে আসবে। I entreat—

চাপরাশী?

তবে থাক্, এত যখন আপত্তি তখন এই যে, যাচ্ছি চ'লে। আচ্ছা, নমস্কার। বলবেন কিন্তু তাকে যে আমি এসেছিলুম। বলবেন, কাল দুপুরবেলা বাড়ি থাকতে, আমি ফোন্ করব।—এই বলিয়া বীরু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৃষ্টি আর নাই, আকাশে শুক্ল সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছে। তাহার সহিত আসিয়াছে উজ্জ্বল তরকার দল। এমন সময় পার্ক সার্কাসের বাগান-বাড়িতে একখানা ভাড়াটে ফীটন্ আসিয়া দাঁড়াইল।

একাকীনি গাড়ীতে বসিয়াছিল রাণু, গাড়ী থামিতেই একটা বেতের ঝুলি লইয়া সে ভিতরে ঢুকিল। বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন মিষ্টার লাহিড়ী ও একটি সৌম্য-দর্শন যুবক। ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর বয়স, য়্যাড্ভোকেট্ হইয়া সবেমাত্র হাইকোর্টে নামিয়াছে। নাম সুশান্ত রায়। তাহার বাবা রংপুরের জমিদার, কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে প্রকাণ্ড অট্টালিকা। যুবকটির আচার-আচরণে কোনো দোষ-ত্রুটি নাই, স্বভাব মধুর। ব্যারিষ্টার লাহিড়ী তাহাকে বার-লাইব্রেরীতে আবিষ্কার করেন। ইহার ভিতরে কিছু গোপন অভিসন্ধিও ছিল। সুশান্তর পসার জমিয়াছে মন্দ নয়। সে ধুতি পরে না, প্রায়ই ট্রাউজার পরিয়া থাকে। পোশাক-পরিচ্ছদে ত্রুটি ধরা পড়ে না।

কি যেন একটা আলোচনা চলিতেছিল, রাণু আসিতেই তাহা থামাইয়া লাহিড়ী কহিলেন, এত দেরি হোলো যে রাণু? আমরা বসে আছি মা তোমার জন্য।

রাণু কহিল, মার্কেটে গিয়েছিলুম বাবা, এইগুলো কিনে আনতে হোলো। এই যে, আপনি কখন্ এলেন?

সুশান্ত কহিল, মিনিট পনেরো হোলো। কাল আসতে পারি নি, বাড়িতে জনকয়েক আত্মীয়স্বজন এলেন—।

রাণু কহিল, দোষ হয় নি, কাল আপনার আসবার কথা ছিল না।

সুশান্ত লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। প্রতিদিন না আসিলে অন্যায় হইবে, এমন কল্পনা করা সত্যই ভুল হইয়াছে।

লাহিড়ী কহিলেন, আজো ওর তাড়া ছিল, তবু আমি বসিয়ে রেখেছি তুমি না আসা পর্যন্ত। এতক্ষণ সেই ছোক্‌রার কথা বলছিলুম—

রাণু প্রশ্ন করিল, কোন্ ছোক্‌রা বাবা?

তাঁহার হইয়া সুশান্ত জবাব দিল, কহিল, তা'র নাম বীরু, আজ একটু আগে এসেছিল সে এখানে।

বেতের ঝুলিটা হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছিল, রাণু সেটাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া সংযত কণ্ঠে কহিল, এসেছিল নাকি? আপনার অপমানের পরেও আবার—?

লাহিড়ী কহিলেন, এমন বোকা দেখি নি! ছেলেমানুষ কিনা, তার ওপর আবার লেখাপড়া শেখে নি! যা হয়ে থাকে। সে যে কী বললে, আর না বললে, কিছুই বুঝতে পারি নি। আমার বন্ধুরা ছিলেন, তাঁরা ত হেসেই খুন! শেষকালে দেখি ধমক খেয়ে ল্যাজ তুলে পালিয়ে গেল। বলিয়া লাহিড়ী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পুনরায় কহিলেন, ছোঁড়া ভয় পেয়েছে, আর কোনদিন আসবে না তোমাকে বিরক্ত করতে। বুঝলে সুশান্ত, রাণুর আচার-আচরণ একটু নরম কিনা, মাঝে মাঝে অমন এক-আধজন ভক্ত যে কোথা থেকে ছুটকে আসে—silly school-boys!

রাণু কি যেন একটা উত্তর দিতে গেল, কিন্তু তাহার ঠোঁট দুটিই কেবল কাঁপিল, কথা বাহির হইল না। বেতের ঝুলিটা হাতে লইয়া সে বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। তাহার মুখের চেহারা কেহ দেখিল না।

লাহিড়ীর কেমন যেন একটা সন্দেহ হইল। রাণুর চলিয়া যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, মেয়েটি আমার খুব মুডি, বুঝলে সুশান্ত? ঠিক মায়ের মতন, ফুলের সঙ্গে কাঁটা জড়ানো। ওরে রামশরণ—

ভিতর হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। লাহিড়ী বলিলেন, গাড়ীখানা গ্যারেজে দিয়ে গেল কিনা একবার দেখে আয়।

রামশরণ কহিল, দিয়ে গেছে হুজুর।

দিয়ে গেছে? যাক্ বাঁচলুম। তবে ত সুশান্ত তোমাদের সুবিধেই হলো! লাহিড়ী হাতঘড়ির দিকে তাকাইয়া পুনরায় কহিলেন, এখন আটটা। সাড়ে ন'টার মধ্যে একটা ড্রাইভ্ দিয়ে আসতে পারবে! ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম রাস্তাটায় যেয়ো, বেশ গঙ্গার হাওয়া; রাণুর আবার একটু-আধটু মাথা ধরা আছে কিনা—

সুশান্ত সবিনয়ে কহিল, উনি এইমাত্র এলেন, আবার কি যাওয়া সম্ভব হবে? আমি বলি আজ থাক্‌গে—

হা-হা-হা-হা করিয়া মিষ্টার লাহিড়ী হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, My dear young advocate, you have yet to learn something more of psychology! বেড়াতে পেলে কি মেয়েরা আর কিছু চায়? ঘরের মধ্যে যে ওদের বাসা, তাই ওরা চায় ছুটি! দাঁড়াও, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে তাড়াতাড়ি!—এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে ভিতরে উঠিয়া গেলেন।

সুশান্ত বিপন্ন হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। সমস্ত ব্যাপারটার ভিতরে সে যেন স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

ভিতরে গিয়া লাহিড়ী পুনরায় উচ্চকণ্ঠে হাসিলেন, কহিলেন—যা ভেবেছি তাই, অন্নপূর্ণার আসন ঠিক রান্নাঘরে। আশ্চর্য, এতক্ষণ পর্যন্ত আমার একেবারেই মনে হয়নি যে, সুশান্তকে চা অফার করতে হবে। Oh, the young, and only the young who rules; and we old, we are the old fools! কোথায় চললে মা?

রাণু সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কহিল, কাপড় ছাড়তে যাচ্ছি বাবা।

লাহিড়ী তাহার অনুসরণ করিলেন। কহিলেন, সুশান্তকে তুমিই চা দেবে ত মা?

হঠাৎ রাণু ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কেন বাবা?

তুমি যে নিজে চায়ের হুকুম দিলে!—বলিয়া লাহিড়ীও উপরের সিঁড়িতে উঠিয়া আসিলেন।

রাণু কহিল—বাবা, ওটা সৌজন্য, বাধ্যবাধকতা নয়। চা আমি দেবো কেন, দেবে রামশরণ!—এই বলিয়া সে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

পিতা প্রমাদ গণিয়া কন্যার সহিত ঘরের ভিতরে আসিলেন। রাণু সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল। লাহিড়ী কহিলেন, কিন্তু মা, সুশান্তর কাছে আমাকে লজ্জিত হ'তে হবে!

বেতের ঝুলিটা ছুড়িয়া একটা কুশনের উপর ফেলিয়া রাণু কহিল, একে কী বলে? বাগান-বাড়ির বৈঠকখানায় এসে উঠলেন সুশান্ত রায়, আপনি বলছেন আমাকে নিজের হাতে চা দিতে; তিনি চা খেয়ে করবেন সুখ্যাতি, আর আপনি দেবেন আমার বিজ্ঞাপন। কী বলে একে বাবা?

তোমার মেজাজ আজ ভালো নেই রাণু।

রাণু কহিল, তার পরে আমি যাবো গঙ্গার হাওয়া খেতে, এত রাতে সুশান্তবাবু আমাকে নিয়ে যাবেন ড্রাইভ্ ক'রে। কেন, আমার এ-ঘরে হাওয়া নেই? কী এর নাম? কী এর নাম? আভিজাত্য?—শেষের কথাটায় সে যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

লাহিড়ীর মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। কহিলেন, তবে আমি সুশান্তকে কি বলব?

ফিরে যেতে বলুন। বলুন আমার মাথা ধরেছে।—

লাহিড়ী চলিয়া গেলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মিলাইয়া যাইবার পর রাণু জামাটা খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর মুহূর্ত মাত্র—আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইতেই পিছন দিকে একটা মানুষের ছায়া পড়িল।

বিস্ময়ের অস্ফুট একটা বিদীর্ণ আওয়াজ রাণুর মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎগতিতে মুখ ফিরাইয়া সে বলিয়া উঠিল, বীরু, কখন্ এলে তুমি? এলে কোথা দিয়ে?

চুপ—বলিয়া বীরু তাহাকে থামাইল, তারপর অগ্রসর হইয়া সে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। ছিট্‌কানি লাগাইল।

রাণু শিহরিয়া কহিল, আলমারির পাশে লুকিয়ে ছিলে? এ কি, জামা-কাপড় ভিজে, মাথায় জল—বীরু, কেমন ক'রে এলে?

বীরু চাপা গলায় হাসিয়া কহিল, নায়ক যেমন ক'রে আসে নায়িকার ঘরে। Dream!

তোমাকে নাকি ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল?

হ্যাঁ, সদর দরজায় আর পথ নেই। বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠলুম, তারপর লুকিয়ে উঠেছি দোতলায়—

রাণু উদভ্রান্ত হইয়া এদিক-ওদিক চাহিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া রেডিয়োর প্লাগটা লইয়া সুইচ্-বোর্ডে সংযোগ করিয়া দিল। রেডিয়োতে কথা ও গান চলিতে লাগিল।

উৎকর্ণ, সন্ত্রস্ত দুইটি ছেলেমেয়ে। এখনই কেহ দরজা ঠেলিয়া ডাকিতে পারে। নিচে লাহিড়ী ও সুশান্ত। চাকর, দারোয়ান ও বেয়ারা—বাড়িতে অন্যান্য লোকজন! রাণু কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

বীরু?

বীরু কহিল, এখনো বাড়ি যাই নি, ট্রেন থেকে নেমেছি বিকেলে। কী আনন্দ হচ্ছে রাণু তোমাকে দেখে!

রাণু দ্রুত গিয়া ঘরের পাশে ড্রেসিংরুমে ঢুকিল, দুই মিনিটের মধ্যে আলমারির ভিতর হইতে তাহার বাবার একটা ঢিলা পায়জামা ও পপ্‌লিন শার্ট্ বাহির করিয়া আনিল। বীরু বিদ্যুৎগতিতে গিয়া রাণুর হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল—পাগল! কিছু দরকার নেই। আরে, এর মধ্যে অনেক শুকিয়ে গেছে। ওটা কি, কী আছে তোমার বেতের ঝুলির মধ্যে?

রাণু হাসিল। কহিল, তোমাকে একটা পার্শেল পাঠাবার জন্যে ওসব এনেছিলুম। রঙিন খাম, শেফার্স্ পেন্, সিলভার ট্রে, স্প্রিঙ্ কলার। আসতে তোমার ট্রেনে কষ্ট হয়নি? আর মা? মা তেমনি শান্ত? তেমনি মিষ্টি? —ছুটিয়া গিয়া সে একবার দরজায় কান পাতিল; তারপর ফিরিয়া আসিল, হাসিয়া কহিল, ডাকাত, দাঁড়াও, তোমাকে একটা উপহার দেবো।

ঝুলিটা ওলোট-পালোট করিয়া রাণু একটা মখমলের কৌটা বাহির

করিল। তাহার ভিতরে ছিল পাথর-বসানো একটি আংটি। আংটিটা সে বীরুর ডান হাতের একটা আঙুলে পরাইয়া দিল।

তোমাকে কী দেবো?

আমাকে? কিছু না।—রাণু তাহার প্রতি চাহিল।

বীরু কহিল, ওদের কি বলেছি জানো? বলেছি, I love her, I am the lover.

রাণু শিহরিয়া উঠিল। তাহার হাত ধরিয়া কহিল, আর কি বলেছ?

বলেছি তোমার চিঠির কথা, তোমার রূপের কথা। বলেছি আমরা ফোনে কথা বলি।

রাণু মুখের একটা শব্দ করিল। তারপর কহিল, কোথায় রাখবো তোমাকে? কে, কে দরজা ঠেলছে? না, কেউ না! বীরু, কী নোংরা তোমার কাপড়-জামা? ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি যাও নি?

বীরু মায়ের কথা মনে করিয়া হাসিল। কহিল, ঘেন্না করবে তুমি, রাণু?

রাণু তাহার দুইটা হাত ধরিল। কহিল, কী শক্ত, কী শক্তি! তোমাকে ঘেন্না করব? আঃ, বীরু, সেই নৈনীতালের লেক্, পাইন-পিপলের পাহাড়, দূরে সূর্যাস্ত—বীরু, কী রূপ তোমার, কী বিরাট তুমি!—সে হাসিয়া হাসিয়া কহিল, শ্বেতপাথরের পুতুল!

রেডিয়োতে কে যেন বক্তৃতা দিতেছিল। সেই কণ্ঠের কোলাহলের ভিতর তাহাদের কথাবার্তা ডুবিয়া যাইতেছে। বীরুর চোখেমুখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নাই, কৌতুকে ও উল্লাসে সে ঘরের ভিতর পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। রাণু স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

বীরু কহিল, আমার মাকে বলে, স্যাণ্ডাল্! সোনার পদ্ম, পদ্মাবতী! বাবার কথা, বাবার কথা ত আমি জানি নে! কে তিনি, কোথায় থাকেন, তুমি জানো রাণু? স্যাণ্ডাল্ মানে কী? কেন আমার মা চুপ ক'রে থাকে? কেন আমি দেখিনি বাবাকে, কেমন লোক তিনি?

রাণু কহিল, তিনি খুব বড়লোক।

বীরু কাছে আসিল। কহিল, কেমন ক'রে জানলে তুমি?

জানলুম তোমার ভেতর দিয়ে! তোমার রূপে, তোমার গুণে। বীরু, তুমি

খুব বড়লোক—খুব—খুব—বলিয়া রাণু তাহাকে আদর করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, বসো তুমি এই কাউচে। দেখি, দেখি তোমাকে, মন ভ'রে দেখি, দেখা যেন না ফুরোয়। আ বীরু, জানো না, কেমন ক'রে দিন কাটছিল! তোমার পায়ের শব্দের দিকে কান পেতে থাকি, প্রাণ পেতে থাকি। চলো বীরু, যাই কোথাও!

কোথায় রাণু?

চলো সেই নৈনীতালে, সেই লেকের ধারে—সেই অরণ্যে—

বীরু উল্লাসে নাচিয়া কহিল, চলো সমুদ্রে, তরঙ্গে তরঙ্গে,—তুমি তপস্বিনী কুমারিকা। ছড়িয়ে দিয়ো কালো চুল সোনার বেলাভূমে—

রাণু ভুলিয়া গেল ঘরের ভিতরকার বিপদ। হাসিয়া অভিনয় করিয়া কহিল—তুমি? তুমি কবি, আমি কবিতা। তুমি মহাযোগী হিমালয়, প্রলয়ঙ্কর শিবশঙ্কর! তোমার জটায় জটায় কালফণা, তোমার নাচের পায়ে পায়ে ভূমিকম্পের দোলা, তোমার বিদ্যুৎকটাক্ষে ভয়াল মহাকালের আসন্ন ভ্রূকুটি—আমার প্রাণের দিগন্ত ছেয়ে নামল তোমার পিঙ্গল জটাজাল। হে রুদ্র, তোমাকে প্রণাম করি।

বীরু তাহার হাত ধরিয়া তুলিল। দুই হাতে তাহাকে দোলাইয়া হাসিয়া কহিল, তোমার এলোচুলের অরণ্যে ছেয়ে গেল মহাযোগীর সর্বাঙ্গ! রাণু, কিছু মানব না, চলব ছুটে, ভাঙবো বাধা—দাও এখন ভিক্ষা অন্নপূর্ণা—

বীরু জানু পাতিয়া বসিল। মুখ তুলিয়া ধরিল।

রাণু হেঁট হইতেছিল, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, কে?

এই আমরা, একবার খোলো ত মা?—মিষ্টার লাহিড়ীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

এই যে খুলি বাবা।

কয়েকটি মুহূর্ত—তার পরেই দরজা খুলিয়া রাণু পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল। লাহিড়ী বলিলেন, ওঃ রেডিয়োর বক্তৃতা! তুমি কি করছিলে মা?

একটু শুয়েছিলুম বাবা।—রাণুর গলা কাঁপিতেছিল।

লাহিড়ী কহিলেন, সুশান্তকে ধ'রে আনলুম তোমার কাছে। এতক্ষণ ওকে বসিয়ে গল্প করেছি, এইবার ও যাবে।

রাণু গায়ে একখানা রেশমী চাদর জড়াইয়াছিল, আলোয় সেখানা জল্‌জল্‌ করিতেছিল। সুশান্তর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়া লাহিড়ী বলিলেন, রেশমটাই তোমাকে বেশি মানায় মা। বেশ, বেশ—হ্যাঁ, বলছিলুম কি, এতই যখন রাত হয়ে গেল, সুশান্ত এখানেই ডিনার খেয়ে যাক্‌। ওকে রাজি করাতে নিয়ে এলুম তোমার দরবারে! কেমন, হয়েছে?

রাণু হাসিয়া কহিল, বেশ করেছেন বাবা, আমিও ভাবছিলুম ওঁকে বলব। রামশরণকে টেব্‌ল সাজাতে বলুন, আমি এখনি আসছি।

আনন্দে গদগদ হইয়া লাহিড়ী কহিলেন, আমরা তবে ওই ডালিমতলার ছাদে একটু পায়চারি করি ততক্ষণ, বেশ চাঁদের আলো হয়েছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবে মা, নইলে—

এই যে বাবা, কাপড় বদলেই আসছি।—বলিয়া রাণু পুনরায় দরজাটা বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে কান পাতিল। লাহিড়ী ও সুশান্তর পায়ের শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল।

ছিটুকানি লাগাইয়া সরিয়া আসিতেই বীরু পুনরায় বাহির হইল। তারপরে এক হাস্যকর কাণ্ড। ধুতির সহিত চাদর ও বেড-কভার পাকাইয়া স্ক্রীনের ও স্কাই-লাইটের দড়ি খুলিয়া কেমন এক অদ্ভুত উপায়ে পলাইবার অবলম্বন তৈরী হইল। জানালার গরাদ নাই, সুতরাং সুবিধা আছে।

কবে দেখা হবে বীরু? কোথায় থাকবে তুমি?

জানিনে, খুঁজে নেবো তোমাকে।—বলিয়া বীরু জানালার বাহিরে কার্ণিশে নামিল। রাণু ঘরের আলো নিবাইয়া দিল। অন্ধকারে হাত বুলাইয়া-বুলাইয়া বীরু হাসিয়া কহিল—যাক্‌, দড়ির দরকার নেই, রেন্‌-পাইপ পেয়েছি।

রাণু আনন্দে দুই হাতে তাহার চুলের গোছা মুঠা করিয়া ধরিল, তারপর হাসিয়া কহিল, কাল তোমার বাড়ির ধার দিয়ে যাবো; যেন কিছু জানিনে। সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে—কেমন?

বীরু কহিল, মিনিট গুনবো!

রাণু কহিল, তখন কী ভিক্ষে চাইছিলে?

বীরু হাসিয়া কহিল—ভিক্ষে? দাও হাতখানা।—বলিয়া রাণুর একখানা হাত টানিয়া তাহার উপর সে শক্ত করিয়া দাঁতের দাগ বসাইল, বলিল, জুলিয়েট্!—তারপর চক্ষের নিমেষে রেন্-পাইপ ধরিয়া নামিয়া গেল।

বাগান পার হইয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সে রাজপথে পড়িয়া ছুটিয়া চলিল, রাণুর উৎসুক মন ভ্রমরীর মতো তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

দুই

লাহিড়ীর বয়স পঁয়তাল্লিশ হইয়াছে। কপালের দুই পাশে চুলের ভিতরে সামান্ত পাক ধরিয়াছে, কিন্তু তেল মাখিয়া স্নান করিলে তাহা আর দেখা যায় না। দাড়িগোঁফ নাই। স্বাস্থ্যটা দোহারা। সুতরাং বয়সটা সহজে ঠাহর করা যায় না।

বিলাতে তাঁহাকে সাত বৎসর থাকিতে হইয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। বিবাহ করিয়া স্ত্রী রাখিয়া বিলাত গেলেন, তাঁহার যাইবার তিন-চার মাস পরেই স্ত্রী একটি কন্তা প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মেয়েটি মামার বাড়িতে মানুষ হইতে লাগিল। মামারা তাহার নাম রাখিলেন রাণু। রাণু বড় হইল।

বিলাতে যে কয়েকজন বাঙালী তাঁহার নানারূপ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বীরকার্যের সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুরঞ্জন মিত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ। শোনা যায়, তখনকার দিনে কন্‌টিনেণ্টের যে কোনো দেশের রসিক সমাজের গোপন সংবাদ রাখিতে সুরঞ্জন মিত্র ও রোহিণী লাহিড়ীর সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। সেটা অনেকের নিকট নিন্দার ছিল, অনেকে তাঁহাদের বাহবাও দিত। কলিকাতায় এই কথাটা অবশেষে রটিতে লাগিল, স্ত্রী মারা গিয়াছেন বলিয়াই দেশে ফিরিতে রোহিণী লাহিড়ীর আর মন নাই। নিন্দুকেরা এ সম্বন্ধে নানা কথা বলে।

সাত বৎসর পরে রোহিণী দেশে ফিরিলেন, কিন্তু আর বিবাহ করিলেন না। রাণু মামার বাড়িতে থাকিয়া মানুষ হইতেছিল, ইত্যবসরে তিনি ভারত

পর্যটনে বাহির হইলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অবশেষে একদিন কলিকাতায় তাঁহাকে আসিতেই হইল, অবস্থা বিবেচনা করিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করা সুরু করিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ও সুবক্তা, অল্পদিনেই তাঁহার পসার জমিয়া উঠিল। পার্ক সার্কাসে জমি কিনিয়া বাগান-বাড়ি ফাঁদিলেন। রাণু আসিয়া স্কুলে ভর্তি হইল।

ব্যারিষ্টার বন্ধুদের আনাগোনা বাড়িল। তাঁহারা প্রায় সকলেই যৌবন-প্রান্তে আসিয়াছেন। বাঙালী অল্প বয়সেই বৃদ্ধ হয়। সম্মুখ ভবিষ্যতে আর কিছু নাই, সুতরাং গত যুগের বিলাত প্রবাসের গল্পগুজব লইয়া ড্রয়িংরুম মশগুল হইয়া উঠিল। সুরঞ্জন মিত্রকে নূতন করিয়া পাওয়া গেল।

সুরঞ্জনের বয়স চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের দিকে হেলিয়াছে। তিনি বাড়ির বড় ছেলে; অনেকগুলি ভাই-বোন। উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে তাঁহারা ছড়াইয়া আছেন। কনিষ্ঠা সহোদরা যিনি, তাঁর নাম মণিপ্রভা; বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, অনেক কাল হইতে কি-যেন কারণে স্বামীর সহিত তাঁহার বনিবনা ছিল না, এবং দৈবক্রমে বছর তিনেক হইল তিনি বিধবা হইয়াছেন। সন্তানাদি কিছুই নাই, কিন্তু তাঁহার মোটা মাসিক আয় আছে। তাঁহার এক বোন-পো তাঁহার নিকট থাকে। ছোকরা এম-এতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ লইয়া আছে।

লাহিড়ীর সহিত কেমন করিয়া মণিপ্রভার পরিচয় হইল, সে অনেক কথা। সুরঞ্জন মাঝখানে ছিলেন। কিছুকাল হইতে এই লইয়া বন্ধুমহলে দুই একটা কথা উঠিয়াছে। সুরঞ্জনকে নানারূপ কৈফিয়ৎ দিয়া ইহাকে এড়াইয়া চলিতে হয়। আজও সেই আলোচনা চলিতেছিল।

লাহিড়ী কহিলেন, সুরঞ্জন একটু লাজুক, চিরকাল অমনি, কেউ অন্যায় বললেও ও সহ্য করে যায়। ভারী শাই!

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, যত জনশ্রুতি আপনাদের কানেই পৌঁছয়। আপনাদের কানগুলোই বড়-বড়।

শাদা জামা, শাদা কাপড়, শাদা সিঁথি, হাতে দুইগাছি চুড়ি—আর কোথাও কিছু নাই! এই পোশাকটা মণিপ্রভার পরিচয় ও বিজ্ঞাপন। ইহাতেই তাঁহাকে মানায়। লাহিড়ী তাঁহার চেহারার উপর ক্ষণকাল চোখ বুলাইয়া

কহিলেন, জনশ্রুতি ঘুরে বেড়ায় কলকাতার শহরে, শহরতলীর পথ পার হয়ে যখন বালীগঞ্জের একটা বিশেষ বাগান-বাড়ির অন্দরমহলে ঢোকে তখন বেচারার জৌলস ধুয়ে যায়।—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

ঘরের ভিতরে একখানা লাইফ সাইজ্‌ আয়না দাঁড়াইয়া আছে, তাহার ভিতর দিয়া নিজের প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া মণিপ্রভা একটু অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন, এর কারণ কি ?

লাহিড়ী কহিলেন, এর কারণ বার-লাইব্রেরীটাই মূর্তিমান জনশ্রুতি, সেখানে যে কি হয় আর কি না হয় তা বলা কঠিন। কালীঘাটের পাঁঠাবলি থেকে অষ্টম এডোয়ার্ডের চরিত্র সমালোচনা -- কিছুই বাদ যায় না। সেখানে কাজের চেয়ে কথা বেশি, কথার চেয়ে বেশি কানাকানি, আর কানাকানিকে ছাপিয়ে যায় কুমন্ত্রণা।

আপনিও ত ওদের মধ্যে একজন, রোহিণীবাবু ?

সেই জন্যেই ত জ্বালা ! কলঙ্কটা রটে যৌবনকালে, তার প্রতিবিধান খুঁজে পাওয়া যায় ; কিন্তু আমার বয়সে—মানে, এই বার্ধক্যে রটে নিন্দা, নিন্দার পিছনে থাকে বিদ্বেষ—এর প্রতিবিধান কিছু নেই মণিপ্রভা।

মণিপ্রভা হাসিলেন, কহিলেন, নিজের সম্বন্ধে আপনার বিনয়ের শেষ নেই। সান্ত্বনা চান ত আমার কাছে ? আমি বলছি আপনার চুল এখনো পাকে নি। দেখতে চান আমার মাথা ? দিনের বেলা আসবেন, লাইম্‌ জুস্‌ মাখবার আগে। ছোটবেলায় জাহির করতুম আমার বয়স অনেক বেশি, এখন বুড়ো হয়ে টয়লেটের আড়ালে লুকিয়ে থাকি ; বয়সটা বলিনে।

রোহিণীবাবু কহিলেন, মেয়েরা কখনো বুড়ো হয় না !

ওটা আপনার বিলেতী মত। এদেশে আজকে ধরে ফুল, কালকে ধরে ফল। এখানে জন্ম-মৃত্যুটা বড় দ্রুত, দেশটা গরম। মেয়েরা বুড়ো হয় না ? কে বললে ? বুড়ো ত মেয়েরাই হয় সহজে ! তাই ত পঁচিশ বছরের পর যাদের খুঁজে পাওয়া যায়, তারা কেবল মাত্র—এই দেখুন না আমার চেহারাটা—

রুজ-মাখা মুখ, লিপ্‌ষ্টিক্‌ ছোঁয়ানো ওষ্ঠাধর—মণিপ্রভা দুই হাত তুলিয়া মাথার চুল ঠিক করিয়া লইলেন। পুনরায় কহিলেন, আপনার বার-লাইব্রেরীর

বন্ধুদের জানাবেন, রাগ আমি করি নি ; তবু ভয়ও করব না তাঁদের। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মেয়েমহলকে আমি চিনি—তারা পুরুষ ভুলিয়ে বেড়ায়, এই ত? এতে অগৌরব নেই। আমাদের কাজ ভোলানো, তাদের কাজ বোকা ব'নে যাওয়া। দুর্ভাগ্যের দল আপনারা—কি পান? বিলেতে কি পেয়েছেন? কি পেয়েছিলেন কন্‌টিনেণ্টে?

রোহিণীবাবু কহিলেন, You are positively excited today, Mrs.—

মণিপ্রভা কহিলেন, রাগ করব? কা'র ওপর? পুরুষকে আর বিশ্বাস করিনে, সে কি আমার অপরাধ? ওরা যা চাইলে দিলুম, আরো কিছু দেবার ছিল, ওরা তার দিকে ফিরে দেখল না। ওদের লুঠ করবার নেশা প্রবল, জানলে না যে, অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা পাওয়াটাই সকলের চেয়ে বড় পাওয়া! রং নিয়ে নাচলে, রস নিয়ে মাতলে না। শস্যের ক্ষেতে এসে ওরা যুদ্ধে নামল, পায়ের তলায় চাপা পড়লো ঐশ্বর্যলক্ষ্মী।

রোহিণীবাবু বলিলেন, আমার প্রতিই ওদের বিদ্বেষ, তোমাকে বিশেষ কিছু বলে নি মণিপ্রভা।

আমাকে কেন বল্‌বে?—মণিপ্রভা কহিলেন, মেয়েকে ওরা বলে নারীরত্ন, কিন্তু মানুষ বলে না। স্বাতন্ত্র্য নেই যে আমাদের, আমরা বস্তু। মৌলালীর মহল্লায় যান্, দেখবেন সেখানে আমাদের নামে একটা বিশেষ শব্দ প্রচলিত। কেন? পুরুষ ভুলিয়ে বেড়াই? রান্না, বাট্‌না, বাসন-মাজা দিয়ে যাদের সতী-সাধ্বী বানিয়ে পুষে রেখেছ, তারা তোমাদের কি বলে?—পতি পরম গুরু! তোমাদের বাইরের জীবনটার সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে? আপিস-ফেরত কোথায় যাও তাস্ খেল্‌তে? পান মুখে দিয়ে কোথা থেকে আসো গান শুনে? জানি, জানি, অনেক জানি ওদের কীর্তি! আমার মেজদাদা বিলেত-ফেরত প্রফেসর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পপুলার ব্যাচিলর'—কন্‌টিনেণ্টে গিয়ে বিশ-পঁচিশটে 'বান্ধবী' জুটিয়ে এসেছেন, কুক্-কোম্পানীর মারফৎ আসে তাড়াতাড়া চিঠি, এখান থেকে গোপনে যায় মণি-অর্ডার। কেন বলুন ত? কোথায় তাঁর বাধ্যবাধকতা? সতী-সাধ্বীর দেশে বাস ক'রে কী মতলবে তিনি ব্যাচিলারি ফলান্? স্ক্যাণ্ডাল্; স্ক্যাণ্ডাল্ পুরুষের। তাদের পাঁজরের

হাড় নিয়ে আমাদের জন্ম, আমাদের রক্ত দূষিত করেছে তারা !

এমন সময় কাহার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া মণিপ্রভা কহিলেন, অজিত নাকি ?

হ্যাঁ মাসীমা।—বলিয়া একটি ছেলে ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই লাহিড়ীকে নমস্কার জানাইল।

মণিপ্রভা কহিলেন, তোর কোনো স্ক্যাণ্ডাল্ আছে রে ?

অজিত হাসিয়া কহিল, কী বলছেন ?

বলছি, ক'খানা চিঠি সপ্তাহে পা'স ?

কা'র চিঠি ?

মণিপ্রভা কহিলেন, এম-এ পাশ ক'রে বুঝলিনে কার চিঠি ? ও, ভাঙতে চাস্‌নে, কেমন ? কোনো মেয়ে ছাত্রী তোদের সঙ্গে রিসার্চ্ করে ?

অজিত কহিল, দু'জন আছেন। তাঁরা—

কো-এডুকেশন্, কেমন ? প্রজাপতির বৈঠকখানা ! তাহ'লে তোর ফুল এখনো ফোটেনি ? সাবধান, প্রথম চিঠিখানা আমাকে দেখাস—আচ্ছা, যা।

অজিত হাসিতে হাসিতে বাড়ির ভিতরে গিয়া ঢুকিল। মাসীর নাটকীয় মেজাজের সহিত অল্পবিস্তর তাহার পরিচয় আছে। লাহিড়ী কেবল কহিলেন, বেচারী !

মণিপ্রভা কহিলেন, বেচারী নয়, ওরা বিংশ শতাব্দীর প্রডাক্‌ট্। ওদের সারল্যটাও গভীর চাতুরীতে ভরা।—গাড়ী আছে ত সঙ্গে ? চলুন, কিছু পেট্রল খরচ ক'রে আসা যাক্।

রোহিণী লাহিড়ী এতক্ষণে কৃতার্থ হইলেন। কহিলেন, চলো !

গাড়ী করিয়া দুইজনে বাহির হইলেন। রোহিণীবাবু নিজেই ড্রাইভ করিতে লাগিলেন। মণিপ্রভা পাশে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পোশাকের ভিতর দিয়া সুগন্ধি দ্রব্যের কেমন একটা মিশ্র মিষ্ট গন্ধ নাকে আসিতেছিল, তরুণ বয়স হইলে লাহিড়ীর তাহাতেই নেশা লাগিত। মণিপ্রভার মাথার চুল দুইদিকের কানের উপর তুলিয়া বাঁধা, তাহাতে লাইম্ জুস্ মাখানো চাকচিক্য। খোঁপার ফ্যাশনটা আধুনিক আমেরিকান্। ইতিমধ্যে একদিন

তিনি সিনেমায় গিয়েছিলেন, সেদিন সেখানে 'প্রাইভেট্ ওয়াইভ্স্' পালা ছিল, তাহাতে নর্মা শিয়ারারের অভিনয় দেখিয়া আসিয়া পরদিন হইতে এমনি করিয়াই তিনি খোঁপা ফিরাইতেছেন। আবার নূতন ফ্যাশন না পাওয়া অবধি এই খোঁপাই চলিবে।

কিছুক্ষণ চলিবার পর মণিপ্রভা বলিলেন, কটা বাজে?

ষ্টিয়ারিং হইতে বাঁ হাত তুলিয়া লাহিড়ী কহিলেন, পৌনে ছ'টা। আমি তোমার কাছে চারটের সময় এসেছি।

কাজ ছিল না আপনার?

কাজ আর কত করব? আর পারিনে, মেয়েটার বিয়ে দিয়েই আমার ছুটি। কিছু ভালো লাগে না।

মণিপ্রভা কহিলেন, এটা আপনার ছলনা, যা ভালো লাগার কথা, তা'তে আপনার অরুচি নেই।

লাহিড়ী কহিলেন, তুমি কী ক'রে জানলে?

জানতে হয় না, দেখতে পাওয়া যায়। আঃ, মাথাটা হঠাৎ ধ'রে উঠেছে কেন কে জানে?

সে কি মাথা ধরেছে?—রোহিণীবাবু মোটরের স্পীড্ কমাইয়া দিলেন। পুনরায় কহিলেন, ভালো না, কিছুতেই ভালো না। মাথাধরাটা ভারী রোগের ভূমিকা! বাস্তবিক, এই কাহিল শরীর তোমার, তুমি একটু যত্ন নাও না। ফিরে যাবো?

মণিপ্রভা একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন। প্রথম পরিচয় হইতে ঘনিষ্ঠতা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সংসারে মানুষ চেনা বড় কঠিন। মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, আপনাকে অত ব্যস্ত হ'তে বলি নি।

ব্যস্ত হই সাধে? তুমি ত জানো না আমি কি রকম ভয় পাই! জীবনের স্থায়িত্ব কতটুকু? এই আছে এই নেই। জলজ্যান্ত মানুষ রেখে গেলুম, বিলেতে নেমেই শুনি আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে! বিশ্বাস হারিয়েছি, নির্ভর আর করিনে, সান্ত্বনাতে আর ভুলি নে।—লাহিড়ী কহিলেন, এখন তোমার উচিত চুপ ক'রে শুয়ে থাকা; একটু ঠাণ্ডা জল আর অল্প

অল্প বাতাস। রাঙা বৌদিদি বুঝি তোমার শরীরের কোনো খবরই রাখেন না ?

মণিপ্রভা কহিলেন, আইবুড়ো তরুণী নই যে তিনি চোখে চোখে রাখবেন। তা ছাড়া নিজের ছেলেপুলে নিয়েই ব্যস্ত। সেবাযত্ন পাবারো আবার একটা বিশেষ অবস্থা আছে, রোহিণীবাবু।

পথের মাঝখানে গাড়ী থামাইয়া রোহিণীবাবু কহিলেন, থাক্, আমার সে কথায় দরকার নেই। যার জ্বালা সেই বোঝে। নিজের যন্ত্রণা অন্যে জানবে কি ? তা' ব'লে আমি ত আর চুপ ক'রে থাকতে পারিনে। চলো, এখুনি ডাক্তার গুপ্তর ওখানে—না, না, সে আমি কিছুতেই শুনব না মণিপ্রভা। এ ক্ষেত্রে মেয়েমানুষের কথায় আমি কান দিতে পারব না।

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, মশা মারতে কামান দাগছেন কেন।

মশা!—রোহিণীবাবু কহিলেন, তুমি জানো মাথাধরা মানে কী ? তোমার মনটা বুদ্ধিপ্রধান, চিন্তাপ্রবণ, মস্তিষ্ক নিয়েই তোমার কারবার—কিন্তু এমনি অবহেলায় যদি স্থায়ী মাথার অসুখ তোমার দাঁড়ায়—বলো ত, ক্ষতি কা'র ? বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় মোটরের স্পীড্ বাড়াইয়া দিলেন।—যারা তোমার মাসোহারার টাকাগুলো খায় ক্ষতি তাদের নয়, চিঠি দিয়ে কালে-কস্মিনে যারা তোমার হেল্থ্ ড্রিঙ্ক্ করে তাদেরো ক্ষতি নয়। ক্ষতি তার যে তোমার কল্যাণ কামনায় নিশিদিন —

মণিপ্রভা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। ডান হাতখানা পিছনদিকে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, লোককে খুশি করতে আপনি অদ্বিতীয় !

রোহিণীবাবু উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, করো বিদ্রূপ—সহ্য ক'রে যাবো। কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব ক'রে যারা চলে তারাই হাত বাড়িয়ে দাম চায়—আমি ? কিছুমাত্র না। দিয়েই আনন্দ, দিয়েই আমার গৌরব। ঠাট্টা করবে ? ভেঙে পড়বো আমি সামান্য ঠাট্টায় ? না। আমার কাজ আমি ক'রে যাবো, কর্তব্য করাতেই আমার সত্য পরিচয়। ও আমি পারব না মণিপ্রভা। সুস্থ শরীরে তুমি যা খুশি তাই করো, কিন্তু তোমার অসুস্থ শরীর আমার হাতে তুলে দিয়ো। ভালো কাজ জীবনে হয়ত করি নি, শেষ বয়সে মানুষের কিছু সেবা ক'রে যেতে চাই।

এই যে, here you are, poor fellow!—বলিতে বলিতে রোহিণীবাবু গাড়ী থামাইলেন।

দুইজনে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। খবর পাঠাইতেই গুপ্তসাহেব নামিয়া আসিলেন। দুইজনের সহিত করমর্দন করিয়া কহিলেন, A friend in need—

রোহিণীবাবু কহিলেন, Yes doctor, you are indeed a friend! দেখো চেয়ে এঁর দিকে, ভীষণ মাথাধরা!

গুপ্তসাহেব বলিলেন, তাই নাকি? কখন্ থেকে, মিসেস্ বাসু?

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, কই, না!

দুই বন্ধুই একটু অপ্রতিভ হইলেন। মণিপ্রভা পুনরায় কহিলেন, ধরেছিল বটে, কিন্তু এখন নেই।

কী বলছ মণিপ্রভা?—রোহিণীবাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া উষ্মা প্রকাশ করিলেন।

মণিপ্রভা কহিলেন, ডাক্তারবাবু, ওঁর আতিশয্যটা আমাকে টেনে এনেছে। ওষুধের দরকার ওঁরই, আমার নয়।

গুপ্তসাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, এই জন্মেই লাহিড়ী আমার চিরদিন প্রিয়, মিসেস্ বাসু। সকলের জন্মেই ও সহজে উতলা হয়ে পড়ে বরাবর। বিলেতে থাকতেও—

মণিপ্রভা কহিলেন, যাক্ বাঁচালেন বন্ধুকে, ওঁর হয়ে ধন্যবাদটা আমিই দিচ্ছি।

লাহিড়ী বলিলেন, আমার আর কিছু বলার নেই।

দরকারও নেই।—আসুন, মোটরের হাওয়াটা বেশ উপকার করেছে আমার, আর একটু ঘুরে আসা যাক্। আচ্ছা, নমস্কার ডক্টর গুপ্ত।

নমস্কার।

মণিপ্রভা বাহির হইয়া আসিলেন। ডাক্তারের দিকে একবার করুণ লজ্জিত মুখে চাহিয়া রোহিণীবাবুও পিছনে পিছনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। চাবি ঘুরাইয়া মণিপ্রভা তাঁহার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া দিলেন। রোহিণীবাবু ষ্টিয়ারিং ঘুরাইয়া স্পীড্ লাগাইলেন।

আবার গাড়ী চলিয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই। কথা বলিবারই বা কি আছে? নিঃস্বার্থ উপকার করিতে গিয়া আজ তিনি যেটুকু অপদস্থ হইয়া গেলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অবশ্য নূতন নয়। নিজের দুর্বলতা তাঁহার জানা আছে, তাঁহার বিবেচনা আছে, চেতনা আছে, কিন্তু সেই ছিদ্র ধরিয়া যদি কেহ বেপরোয়া বিদ্রূপ করিয়া যায় তবে উপরে ভগবানকে জানানো ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। সকলের শিক্ষা সমান নয়, অনেকের অসঙ্গতি থাকিয়া যায়—কিন্তু সত্যকার দোষটা কোথায়? বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা মানুষকে বড় করে নাই, বরং তাহার চিত্তের মালিন্য ও নীচতাকে খোঁচাইয়া উপরে তুলিয়া ধরিয়াছে। মনস্তত্ত্ব ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মানুষ নামিয়াছে চরিত্র-রহস্যের তলায়, কমলফুল তুলিতে গিয়া কেবল পাঁকই ঘাঁটিয়াছে।

লাহিড়ী মনে মনে দুঃখিত হইলেন। তাঁহার যাহা কিছু ভালো তাহাকে লোকে অবজ্ঞা করিয়া যদি মন্দ প্রকৃতিকে বড় করিয়া ধরে, তবে কি তিনি সেই মানুষের প্রশংসা করিবেন?

কথা বলছেন না যে রোহিণীবাবু?

লাহিড়ী এইবার নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, কথা মানে যুদ্ধ, তোমার কাছে আমি যুদ্ধের স্পৃহা নিয়ে আসিনে মণিপ্রভা?

দুইজনে কাছাকাছি বসিয়া, কিন্তু ব্যবধানটা দুস্তর। দুইজনেই উচ্চ শিক্ষিত, হয়ত উচ্চ শিক্ষিত হইয়াই বিপদ ঘটিয়াছে। কথার ভিতরে ছুরির ফলা ঝক্‌ঝক্ করে, বিশ্বাস ও সততা কেবল যুক্তি আর আড়ম্বরের মুখ তাকাইয়া চলে, সরলতা চাপা পড়ে গভীর চাতুরীতে; সত্যটা আচ্ছন্ন হয়।

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, অভিমান? অবাক করলেন আপনি, কোন্ স্তরে ফেলবো আপনাকে? নেশা এখনো কাটলো না আপনার?

কিসের নেশা মণিপ্রভা?

পঁচিশ বছর বয়সের নেশা! আমার সন্তান হ'লে তার বয়স হোতো আপনার রাণুর মতন। সুতরাং পুরানো স্বভাবটা এখন উইল ক'রে দিতে চাই তাদের নামে। ওতে আর মন ভরে না, এখন এসেছে বিবেচনা। রোহিণীবাবু, বয়সটাকে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়াটাই বোধ হয় পৃথিবীতে সকলের চেয়ে কঠিন। তার চেয়ে আসুন, একটা চুক্তি করা যাক্।

রোহিণীবাবু তাঁহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া লইলেন, তারপর পথের দিকে চাহিয়া মোটরের হর্ণ দিয়া কহিলেন, কি চুক্তি বলো ?

মণিপ্রভা কহিলেন, ব'লে আর কাজ নেই, ওটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

তুমি ভুল করছ মণিপ্রভা, এটা মান-অভিমানের পালা নয়, এর মধ্যে আমাদের প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন আছে।

প্রশ্নটা কি ?

আমরা পরস্পরকে ভুল বুঝবো না। মণিপ্রভা, জীবনে আপোষটাই বোধ হয় সকলের বড়। Pact চাইনে, আমি চাই compromise.

মণিপ্রভা কহিলেন, দুটোই অকেজো মনে রাখবেন।

তবে হারমণি আসবে কেমন ক'রে ?

হারমণি ! তার আগে যে আসে আন্তরিকতার কথা ! ডাক্তার গুপ্তর ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়াটাকে কী বলবেন ? আগ্রহ ? কল্যাণবুদ্ধি ? আমি মানিনে কিছু। আসুন, আভিজাত্যের খোলসটা ছাড়িয়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াই। আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ, আমার ছত্রিশ—অতএব রোমান্সের ধোঁয়ায় চোখ ধাঁধিয়ে আর কাজ নেই ; এখন সোজা হয়ে হাঁটতে চাই, সহজ হয়ে বাঁচতে চাই।

আমিও ত তাই চাই মণিপ্রভা।

তাই বলুন। বলুন যে বিকল যন্ত্র নিয়ে কাজ চলবে না। সুস্থ হয়ে থাকতে হবে আপন আপন স্বার্থে। রোহিণীবাবু, এটা শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না নয়, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রাভা—অমাবস্যা এখন কাছাকাছি, অন্ধকার হ'তে আর দেরি নাই।

লাহিড়ী কহিলেন, জানি মণিপ্রভা, আমার বার্ধক্য এসেছে !

মণিপ্রভা কহিলেন, জানেন অথচ স্বীকার করবেন না। সত্তর বছর বয়সে পুরুষরাই যায় বিয়ে করতে, মেয়েরা নয়। তার কারণ কি জানেন ? আত্মাভিমানটা পুরুষের রক্তগত। সূর্যের যে আলো একদিন শরৎচন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে উজ্জ্বল করেছিল, আজ সেই আলোই যে তার ধার-করা চাকচিক্যকে মলিন করতে উদ্যত ! তাইত বলি, সব কাজেরই একটা সময় আছে, অবস্থা আছে ! যৌবনে যেটা মানায়, যৌবনান্তে সেটা হাস্যকর !

দাদার মুখে গল্প শুনেছি, বিলেতের বুড়ীরা যে মাসে মস্‌লিন গাউন প'রে বল্‌-এ যায়! কেন? সেখানে তারা ক্লাউন্‌ সাজে, নিজেদের নিয়ে নিজেরা কৌতুক করে। তরুণ-তরুণীরা হাততালি দিয়ে বলে, হোলো না, অনুকরণটা তোমাদের ব্যর্থ। বুড়ীরা বলে, ওরে, ব্যর্থ ব'লেই ত আনন্দ! হাস্যকর ব'লেই ত অনুকরণটা সার্থক।—এই যে, নামবেন নাকি এখানে?

রোহিণীবাবু ব্রেক কসিলেন। বলিলেন, এই কার্জন পার্কে? ভালো লাগবে তোমার?

মন্দ কি, হাওয়া আছে তবু। আজ বড় গুমোট।

বড় বেশি আলো কিন্ত—

আলোতে ভয় কেন? আসুন, এই পশ্চিম দিকটায় বেড়াই।

গাড়ী থামাইয়া দুইজনে নামিলেন। সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। পার্কের ওদিকে চৌরঙ্গীর মোড়ে জনপ্রবাহ চলিতেছে, এদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। দুইজনে বাগানে ঢুকিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মণিপ্রভার পরিচ্ছদটা কিছু আপত্তিকর, এমন নির্জ্জনে লইয়া বিচরণ করিলে পথিকজনের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। রোহিণীবাবু একটু আড়ষ্ট হইতেছিলেন। কিন্ত তাঁহার বলিবার সাহস নাই, তিরস্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা। জনবাহুল্যকে তিনি এড়াইয়া চলিতে চান যে কারণে, তাহা মণিপ্রভাকে কিছুতেই বুঝানো যাইবে না। মণিপ্রভা বড় বেশি স্পষ্টবাদিনী।

মণিপ্রভা কহিলেন, সুশান্তর মেজাজ কেমন এখন?

রোহিণীবাবু বলিলেন, ছেলেটি বড় ভালো, তবে কথা হচ্ছে এই যে—

ভালো-মন্দর বিচার থাক্‌, ও আপনার মুখ থেকে আমি শুনব না। আগে বলুন তার আগ্রহটা কতখানি। আমি বুঝি এই কথাটা যে, তার সংশিক্ষা, ভদ্র রুচি, সদ্ব্যবহার—তারপরে দেখব রাণুর প্রতি তার আগ্রহ, তার সুবিচার।

আমিও সেই কথাই বলতে চাই মণিপ্রভা।

মণিপ্রভা হাসিয়া কহিলেন, আপনি তা বলতে চান্‌ না। আপনি বলতে চান, ছেলেটি সুন্দর, ছেলেটি আপনার প্রতি অনুরক্ত, ছেলেটির বাপের প্রচুর টাকা!

রোহিণীবাবু বলিলেন, মেয়ের বাপ হয়ে তার আর্থিক অবস্থাটা আমি দেখব না ?

দেখবেন বৈকি। তবে মনে রাখবেন, ভালো ছেলে মন্দ হ'লে সে আর ভালো হয় না। আর্থিক অবস্থা ? টাকা থাকে না রোহিণীবাবু, ঘোড়দৌড়ের মাঠে অনেক ভালো ছেলে সর্বস্ব হারায়, সম্পত্তি বিক্রি ক'রে বিলেতী মদের দোকানে দেনা শোধ হয়, আরো যে সব নালা দিয়ে টাকার প্রবাহ ব'য়ে যায়, পুরুষ মানুষ হ'য়ে আপনি অবশ্যই তার সংবাদ রাখেন!—মণিপ্রভা হাসিলেন।

তুমি কি আমাকে সবজান্তা মনে করো ?

অবশ্যই, আপনি যে বিলেত-ফেরৎ অভিজাত! যাক্‌গে, আপাতত রাণু-সুশান্ত-সংবাদটা নেওয়া যাক্। মেয়েটি আমাকে খুব ইম্‌প্রেস্ করেছে।

রোহিণীবাবু কহিলেন, ইম্‌প্রেস্ করতে পারলো না কেবল মেয়ের বাপ। তার দুর্ভাগ্য!

মণিপ্রভা বলিলেন, আমিও তাই ভাবি। বলিয়া হঠাৎ তিনি হাসিয়া উঠিলেন, পুনরায় কহিলেন, আপনার মেয়ে এমন আপ্‌রাইট্ হোলো, আশ্চর্য্য!

তোমার গলার আওয়াজে আমার প্রতি একটা বিশেষ বিদ্রূপ প্রকাশ পাচ্ছে মণিপ্রভা।

যদি প্রকাশ পায় তবে ভালো। আপনার বাল্য ইতিহাস আমি জানিনে, তবে সম্ভবতঃ আপনার বিলেত যাবার আগে ওর জন্ম।

মানে ?

মানে, বিজ্ঞানে বলে নানা কথা। আগে যাঁরা বিলেত যেতেন তাঁরা সেখানকার ঠাকুরদের কাছ থেকে আনতেন প্রসাদ, এখন যারা যায় তারা আনে আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল। রোহিণীবাবু, স্রষ্টার চরিত্রের সততা আর নির্মলতার উপর নির্ভর করে সুন্দর সৃষ্টি।

রোহিণীবাবু কহিলেন, তুমি কি বলতে চাও যারাই বিলেত যায় তারাই অসৎ হ'য়ে ফেরে ?

মণিপ্রভা বলিলেন, এমন অন্যায় কথা বলব না। আমি বলতে চাই যারা আজকাল ফেরে, তারা বড় জটিল প্রকৃতির হয়ে ওঠে। নানা আইডিয়ায় তারা

প্রভাবান্বিত, তারা নানাবিদ্যার অদ্ভুত সংস্করণ, নানারূপ জীবন সমস্যা আর চিন্তার আলোড়নে তারা স্বকীয়তাহীন। যেমন আপনার ঘরের আসবাবপত্র। ওর মধ্যে নানা দেশের শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ আছে কিন্তু ওদের মধ্যে আপনি হারিয়েছেন আপনার নিজের জাত। আভিজাত্যের চালটা বনেদী, বিশেষ জাতের স্বাতন্ত্র্যটা তার মধ্যে পরিস্ফুট। আপনার নিজের পরিচয়টা কী বলুন ত? জাতে আপনি হিন্দু, নাস্তিকতায় আধুনিক রাশিয়ান্, আচরণে ইংরেজ, স্ফূর্তিতে ফরাসী, সুবিধাবাদে জাপানী, বিষয়বুদ্ধিতে আমেরিকান্—বলিতে বলিতে হাসিলেন, পুনরায় কহিলেন, এদের মধ্যে আপনি কোথায়? আপনার প্রকৃত চেহারাটা চাপা পড়েছে নানাদেশের নানাজাতের শিক্ষায়।

রোহিণীবাবুর মনটা জ্বালা করিতেছিল, মণিপ্রভার একখানা হাত ধরিয়া রাগ চাপিয়া হাসিয়া বলিলেন, poor girl, তুমি কী?

মণিপ্রভা হাত ছাড়াইলেন না, কিন্তু বলিলেন, girl আমি নই, ওকথা শুনিয়ে অবশ্য আমার মন ভোলানো যায় বটে, কিন্তু আমি woman! হ্যাঁ, আমি কী? আমি হচ্ছি আভিজাত্যবাদী নব্যতন্ত্রীর প্রডাক্ট। বিলেত আমি যাইনি, যাবো না কখনো, কিন্তু বিলেতী মতবাদীদের হাতের পুতুল আমি। রোহিণী-বাবু আমার জীবন গ'ড়ে উঠেছে আপনাদের খেয়াল-খুশিতে। চাকচিক্যে আপনাদের রুচি, মাধুর্যে আপনাদের মন নেই। আপনারা চান প্রমোদরঞ্জিনী বারবধূকে, তাই আপনাদের মেজাজের দাসীপনা করে ক'রেই আমাদের প্রাণান্ত!

তাঁহার কণ্ঠটা কিছু উচ্চে উঠিয়াছিল, রোহিণীবাবুর ভয় করিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, চলো মণিপ্রভা, ডালহাউসী স্কোয়ারের মাঠে যাই, এখানে বড় লোকজন—আজ উত্তেজনাটা যেন তোমাকে পেয়ে বসেছে।

মণিপ্রভা হাসিলেন। বলিলেন, চলুন। সেখানে আলোও নেই, মানুষও নেই, সেখানেই বোধ হয় আপনার আসল চেহারাটা দেখতে পাবো।

রোহিণীবাবু মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, আসল চেহারা আমার এই, এছাড়া আর কিছু না। আমি ভালোবাসিনে কালোকে শাদা বলতে। নিজেকে প্রচার করতে চাইনে, প্রকাশ করতে চাই। এসো।

মণিপ্রভা কহিলেন, নিজেকে প্রচার করার মধ্যে আছে স্বাতন্ত্র্য !—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

কয়েকখানা ট্যাক্সির সারির মধ্যে লাহিড়ীর মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। পাশেই একটা সরকারী আলো জ্বলিতেছে। দুইজনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, এমন সময় এক অঘটন ঘটিল। হঠাৎ উত্তর দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখা গেল, দুইটি তরুণ-তরুণী দ্রুতপদে আসিয়া পার হইয়া যাইতেছে! পথের দিকে, পৃথিবীর দিকে—কোনোদিকেই তাহাদের দৃক্‌পাত নাই। আপন আপন কথালাপে তাহারা মশগুল।

মণিপ্রভা তৎক্ষণাৎ পথ আগলাইয়া হাসিয়া কহিলেন, রাণু!

রাণুর সহিত বীরুও হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। রোহিণীবাবুর সম্মুখে বজ্রাঘাত হইল! মুখের একটা অস্ফুট আওয়াজ করিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন!

চারিটি প্রাণী, কিন্তু আটটি চক্ষু পরস্পরের প্রতি নিঃশব্দ বিস্ময়ে হতচকিত হইয়া দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। কিন্তু সে কিয়ৎকালের জন্য, তাহার পরেই মণিপ্রভা রাণুর হাত ধরিয়া কহিলেন, মাথায় রাঙা গোলাপ, কী সুন্দর তুমি! কতদূর গিয়েছিলে মা?

রাণু কহিল, ওঃ অনেক ঘুরেছি। এখন আসছি ওই ডাল্‌হাউসী স্কোয়ার থেকে, ওখানে আলো কম; চাঁদের আলো খুব।

মণিপ্রভা অলক্ষ্যে একবার রোহিণীবাবুর দিকে তাকাইলেন, তারপর পুনরায় রাণুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, এই ছেলেটিকে ত চিনলাম না?

বীরু তৎক্ষণাৎ কহিল, আমি? আমার নাম বীরু; পোশাকী নাম বীরেন চৌধুরী? বাড়িতে বি-এ পড়ি।

তাই নাকি? এত বড় কথা?—বলিতে বলিতে মণিপ্রভা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। আলোয় তাঁহার গলার মুক্তার মালা ঝলমল করিতে লাগিল।

বীরু কহিল, নমস্কার মিষ্টার লাহিড়ী। আপনি বুঝি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না?

মিষ্টার লাহিড়ী তাহার নমস্কার লইলেন কিংবা লইলেন না তাহা বুঝা গেল

না, কিন্তু একদিকে গভীর লজ্জা ও আর একদিকে প্রচণ্ড রাগে তাঁহার মুখের চেহারা কেমন যেন বিকৃত হইয়া উঠিল। এমন একটা অবস্থায় তিনি পড়িবেন তাহা আশা করেন নাই। সমস্ত আক্রোশটা দুইটি ছেলেমেয়ের উপর গিয়া পড়িল।

মণিপ্রভা কহিলেন, বীরু, বীরেন চৌধুরী ?

আজ্ঞে।—বীরু উত্তর দিল।

তুমি আমাকে চেনো ?

এইবার চিনলুম। আপনি মিসেস বাসু। আপনার ওখানে মিষ্টার লাহিড়ী কোর্ট-ফেরৎ গিয়ে চা খান।

কেমন ক'রে জানলে ?

রাণু বলেছে।

রাণুর সঙ্গে তোমার কতদিন আলাপ বীরু ?

বীরু হাসিয়া কহিল, পূর্বজন্ম থেকে !

মণিপ্রভা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু তাহার আগেই অকস্মাৎ লাহিড়ী ফাটিয়া উঠিলেন—এটা চালাকি করবার জায়গা নয় ! সেদিন আমি তোমাকে মানা করেছি যে—যাক্ তোমার সঙ্গে কথা বলাও অপমান ! চলুন, মিসেস্ বাসু—

লোকসমক্ষে তিনি মণিপ্রভাকে 'আপনি' এবং মিসেস বাসু বলিয়া আহ্বান করেন। কেন করেন তাহা নব্য প্রণয়নীতির নায়ক-নায়িকারা জানেন ভালো। মণিপ্রভা তাঁহার দিকে তাকাইয়া সামান্য অধর কুঞ্চন করিয়া হাসিলেন, কিন্তু সেখান হইতে নড়িলেন না। তাঁহার মনটা যেন হঠাৎ সাংঘাতিক খেলায় মাতিয়াছে।

রাণু তাহার পিতার দিকে সরিয়া আসিয়া কহিল, কথা বলা অপমান কেন বাবা ?

কেন ! সেই কথাটা ঘাঁটিয়ে বলাটা কি সকলের সামনে ভদ্রতা হবে না ?—লাহিড়ী কহিলেন, তোমাকে যদি কেউ নিচে নামায়, তবে বাপ হ'য়ে কি আমার গৌরব বাড়বে ?—তিনি দম্ভ করিয়া পুনরায় বলিলেন, শিক্ষায়, সভ্যতায়, বংশ মর্যাদায় আজ পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছি, ঝড়ে-ঝাপটায়

এতটুকু টলিনি, আজ কি আমার সেই গৌরব চাপা পড়বে পথের জঞ্জালে? আমি ত এখনো মরিনি, রাজার সঙ্গে রাখালের বন্ধুত্ব কতটুকু স্থায়ী হয় মা! সেখানে কেবলমাত্র করুণার ঘনিষ্ঠতা, ক্ষণস্থায়ী দয়া-দাক্ষিণ্যের সাহচর্য—সে কথা রাজাও জানে, রাখালও জানে!

বীরু কহিল, তারপর, মিষ্টার—?

থামো তুমি! একই পথে দাঁড়িয়েছি, তাই ব'লে একই আসনে বসবো না তোমার সঙ্গে। সূর্যের আলোকে ঢাকতে চাও কুয়াসার মায়া দিয়ে? কে তুমি হে? আজ আশ্রয় পেয়েছ ব'লে অধিকার নিতে চাও? অন্যায় এসে বসবে বিচারের আসনে? আমি প্রাণ থাকতে—

মণিপ্রভা হাসিয়া বলিলেন, আপনি চেঁচাচ্ছেন—কিন্তু এটা রাস্তা। সামনেই থাকেন গভর্ণর—এটা আমাদের unlawful assembly, এখুনি উনি একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করতে পারেন!

লাহিড়ী বলিলেন, আপনি কি বলতে চান মিসেস বাসু, এটা ভালো?

কোন্‌টা?—এইবার মণিপ্রভা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, আমাদেরটা, না, এদেরটা? ও, এদেরটা! বুঝলাম সব। কিন্তু আপনার ভালো-মন্দ বিচার নিয়ে চলবে কেন তাদের, যারা আপনার রুচির দাসত্ব করে না? বলবার অধিকার আমার নেই, তবু একথা কি মিথ্যে যে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার মানুষ ত দূরের কথা, স্বয়ং মহাকালের হাতেও নেই! আর আভিজাত্যের কথা? আপনার বাগান-বাড়ি, আর সাজ-আসবাব, আর মোটর-ব্রুহাম্‌ সরিয়ে নিয়ে দেখুন ত কী থাকে? শিক্ষা, সভ্যতা আর সফিস্‌টিকেশন বাদ দিয়ে দেখুন, আপনার মনের চেহারা কি! বংশ-মর্যাদা? তার মাপ-কাঠি কোথায়? আপনার পিতামহ আর প্রপিতামহীর অতীত ইতিহাস কতটুকু জানেন আপনি? মানুষের স্বভাবধর্মকে অস্বীকার ক'রে আপনি যাবেন কত দূরে?

লাহিড়ী উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন, আপনি কি বলতে চান পিতা হয়ে সন্তানের কল্যাণ দেখবো না? রোগীর প্রতিবাদ শুনতে গিয়ে দুষ্ট-ব্রণে অস্ত্রোপচার বন্ধ রাখব?

এটা আপনার ব্যারিষ্টারি কথার মার-প্যাঁচ।—মণিপ্রভা বলিলেন—কল্যাণ মানে? 'শুভবর' বানিয়ে তুলতে চান্‌ নিজের রুচিতে? অধিকার

আপনার কতটুকু ভেবে দেখেছেন? সৎশিক্ষা দেওয়া, আদর্শের দিকে অনুপ্রাণিত করা, লালন করা—তারপর? সন্তানের ওপর পিতামাতার আর অধিকার নেই! পথ নির্দেশ করবে কে? আপন প্রাণ! আপন আদর্শ! আপনার বিলেতের জীবনটা ভাবুন, কি করেছিলেন সেখানে। শুনেছি আপনাদের বিলেতী জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ কাহিনী! কতটুকু মেনে চলেছিলেন পিতামাতার উপদেশ? নীতি আর ধর্ম কতখানি আপনাদের বজায় ছিল? মণিপ্রভা তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, লাহিড়ী মশাই, এবার আপনার ধর্ম-কর্ম করবার সময় হয়েছে।

লাহিড়ী চটিয়া বলিলেন, আপনার আস্কারায় ওরা—

থাক্, ওরা শিক্ষিত। আস্কারা কি পায়নি? এম-এ পড়া মেয়ে আপনার, আমাদের চাল-চলনটা দেখে ওর কি মনে হচ্ছে মিষ্টার লাহিড়ী?

বীরু সরিয়া দাঁড়াইল; রাণু গিয়া রেলিং ধরিয়া মাথা হেঁট করিল। এদিকটা নির্জন, মাঝে মাঝে হু হু করিয়া এক-একখানা মোটর কেবল পার হইয়া যাইতেছিল।

মণিপ্রভা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, thank God যে, ডালহাউসী স্কোয়ারের মাঠে আমাদের সঙ্গে দেখা হয় নি! এই ত শুনলুম, সেখানে আলোর চেয়ে চাঁদের আলো বেশি!

লাহিড়ী মুখ বুজিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এই স্ত্রীলোকটি দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহাকে অপমান করিতেছে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার সাধ্য নাই, কোথায় যেন তিনি জটিল জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এইবার হঠাৎ ভীষণ উষ্মা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আমাদের সঙ্গে ওদের কথা?

মণিপ্রভা বলিলেন, না, তুলনাই হয় না! রোমান্সটা চিরদিন মাত্রা ডিঙিয়ে চলে। ওটা ঝড়ের সমুদ্র, তপোবনের তীরের প্রাচীন সরোবর নয়। তাই বলছি, বাধা দেবেন না, আপনার নিজের নৌকো ডুববে। তার চেয়ে আসুন, আপনার ভাষায় একটা আপোষ করা যাক্, লাহিড়ী মশাই।

আপোষ? কা'র সঙ্গে?—আসুন, সময়ের দাম আছে! রাণু, এসো মা, বাড়ি যাবে।

বীরু তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু আমার যে দরকার রাণুর সঙ্গে!

দরকার, খু-ব দরকার ?—মণিপ্রভা হাসিলেন, বলিলেন, আচ্ছা ওঁর হ'য়ে আমিই তোমাদের দু' মিনিট সময় দিচ্ছি, সেরে নাও। বীরু—জল্‌দি—বলিয়া তিনি লাহিড়ীকে লইয়া মোটরের অপর পাশে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলেন। এপাশে দুইটি ছেলেমেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। দুইজনের ভিতরে ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা কহিল না।

ওপাশে দাঁড়াইয়া মণিপ্রভা কহিলেন, বীরুর ওপর আপনার ভয়ানক রাগ দেখছি।

লাহিড়ীর দুই চক্ষু ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তবু কিছু পরিমাণে নিজেকে সংযত করিয়া চাপা গলায় কহিলেন, তোমার মুখের ওপর আমি কোনো কথা বলতে পারিনে মণিপ্রভা।—বলিয়া তিনি মণিপ্রভার একখানা হাত চাপিয়া ধরিলেন।

তাঁহার গদগদ কণ্ঠ শুনিয়া মণিপ্রভা কহিলেন, ওর ওপর এত রাগ কেন ?

রাগ হবে না ? বলো কি তুমি ?

মণিপ্রভা বড় বড় চোখে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। তারপর বলিলেন, ও যদি মন্দ হয় তবে ওর চেয়েও আমরা খারাপ।

কেন মণিপ্রভা ?

এমন সময় রাণু আসিয়া কহিল, চলুন বাবা।

হঠাৎ খুশি হইয়া একবার ঘৃণিত দৃষ্টিতে বীরুর দিকে চাহিয়া লাহিড়ী কহিলেন, এসো মা, এসো। উঠুন মিসেস বাসু, আপনাকে আগে পৌঁছে দেবো।

ধন্যবাদ, আমি যাবো ট্যাক্‌সিতে।—মণিপ্রভা কহিলেন।

সে কি, কেন ?

যাবো বীরুকে নিয়ে। রাণু, একদিন এসো মা আমার ওখানে, চা খেয়ো।

অবাক হইয়া লাহিড়ী এই রহস্যময়ী নারীটির দিকে একবার তাকাইলেন, তারপর আর কোনো কথা না বলিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া চালাইয়া গেলেন।

তাঁহাদের মোটর দূরে চলিয়া যাইবার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া মণিপ্রভা বলিলেন, বীরু, তোমার সঙ্গে আমি যাবো !

বীরু কহিল, কোথায়?

তোমাকে পৌঁছে দেবো—এই ট্যাক্‌সি—

আমি ত যাবো না আপনার সঙ্গে!

মণিপ্রভা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন বীরু?

অনভিজ্ঞ অর্বাচীন বালক তাঁহার আপাদ-মস্তকের প্রতি একবার তাকাইল। মনে হইল যেন ইহার চরিত্রে জটিল আবরণের পর আবরণ! চেহারায় রংয়ের পালিশ, চক্ষে কেমন যেন চটুলতা, কেমন একটা রহস্যময় বেপরোয়া চাল-চলন, সান্নিধ্যটা যেন কণ্টকাকীর্ণ। ইহার পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী মাদকতা জড়ানো—তাহার মায়ের সহিত কোথাও ইহার মিল নাই!

আমি একলাই যেতে পারব। নমস্কার।—বলিয়া বীরু পিছন ফিরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

মণিপ্রভা অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার দিকে চাহিয়া তার পর ট্যাক্‌সিতে উঠিলেন। অপমানে তাঁহার দুই চোখ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। জনবিরল পথে চলন্ত গাড়ীর ভিতরে বসিয়া গলার ভিতর দিয়া তাঁহার কী যেন ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। কে জানে, কোথায় তাঁহার আঘাত লাগিয়াছে!

তিন

ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির উপরতলার ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়া বীরু ডাকিল, মা, মা শুন্‌চ—?

মা মুগার সুতা দিয়া পাঞ্জাবির হাতায় ফুল তুলিতেছিলেন। উত্তর দিলেন না। বাগানের হাওয়ায় তাঁহার রেশমী চুলের গোছা দুলিতেছিল।

রাগ করিয়া মায়ের হাত হইতে সুতা কাড়িয়া লইয়া বীরু কহিল, উত্তর দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছ, কেমন?

উত্তর দেওয়া মানে ত বকবক করা, ও আর আমি পারিনে!

পারো না?—বীরু কহিল, ভারী রাজকার্যে ব্যস্ত, কেমন? জামায় ফুল

তুলে কী হবে? আমি বুঝি পরবো ওই জামা? জানো আমি বড় হয়েছি?

পদ্মাবতী বলিলেন, তুমি বড়ও হও নি, জ্ঞানও হয় নি!

হা ভগবান! চোখ মেলে চেয়ে ছাখো, মেঘে মেঘে বেলা বয়ে যায়! আমি কবিতা লিখছি আজকাল, তুমি খোঁজ রাখো?

রাখি বৈকি, জ্ঞান হ'লে ও-রোগ সেরে যাবে বাবা।

বটে! আমার ওপর তোমার গভীর অবজ্ঞা!—অভিমান করিয়া বীরু কহিল।

পদ্মাবতী হাসিয়া কহিলেন, বকাসনে বীরু, কাজটা শেষ করতে দে। ওকি, চেয়ার উল্টে প'ড়ে যাবি যে, অমন ক'রে হেলুতে নেই বাবা।—মা মিনতি করিলেন।

তুমি আমাকে অবজ্ঞা করো কেন? আমি সুইসাইড করব।

পদ্মাবতী কহিলেন, ওমা, ছেলেমানুষের মুখে ওকি কথা রে? সুইসাইড করবার বয়স হয়েছে কি তোর?

বীরু কহিল, ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ! তুমিই বা কতটুকু জানো মা, ছেলেরা কখন্ বড় হয়? তুমি কি জানো যে—

পদ্মাবতী মুখ তুলিয়া পুত্রের দিকে তাকাইলেন। তাকাইয়া রহিলেন অনেকক্ষণ। তারপর বলিলেন, কী জানি রে? ও কি, পালাচ্ছিস কেন? এই গাধা, এই—

বীরু ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদে চলিয়া গেল। মায়ের নিকট কী যেন স্বীকার করিয়া ফেলিতেছিল, যাহা তাহার নিজের নিকটও সুস্পষ্ট নয়। ভাগ্যি, বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলে নাই! তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। মায়ের নিকট কোনো কথাই তাহার গোপন নাই, গোপন রাখা উচিত এমন কথাও সে অবাধে প্রকাশ করিয়া ফেলে; কিন্তু আজ যেন তাহার অন্তরাত্মার কথা গোপন হইতেও গোপন, ইহাকে বাহিরে আনিতে গেলে ইহার সৌরভ নষ্ট হইয়া যাইবে।

হেমন্তকালের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আকাশ শিহরিয়া উঠিতেছিল। মেঘখণ্ডগুলি শূন্যে স্থির হইয়া আছে। অল্প অল্প শীতের বাতাস। এদিকের পল্লী ঘিঞ্জি নয়, গাছপালায় লতায়পাতায় ঘেরা বড় বড় বাড়ি, দূরে দূরে শহরতলীর

বনরেখা। তাহাদের এই বাড়ির নিচের বাগানে গাঁদা ফুল ফুটিয়াছে, শিউলী গাছের এখন আর সে গৌরব নাই। বীরু ছাদের রৌদ্রে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আজ সকালে সে একটা কবিতা লিখিয়াছে। ছবি আর সে আঁকিবে না, কবিতাই লিখিবে। সকাল হইতে তাহার মন গুন গুন করিতেছে। কবিতাটা সে মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

তুমি ছিলে আপন ধ্যানে আপনি তন্ময়,
যেমন হেমগিরিশিখরে তপস্বিনী অপর্ণা,—
তোমার চারিদিকে বেষ্টন ক'রে ছিল
তুষারের কঠিন রূঢ় শীতলতা।
এমন সময় এলেম আমি
সপ্তঅশ্ববল্গা হাতে ময়ূরপঙ্খী রথে,
তোমার আকাশে চল্‌ল আমার রঙের কৌতুক।
তোমার এলোচুলের অরণ্যে অরণ্যে,
তোমার মঞ্জরী কিশলয়ে, ফুলে-ফলে,
তোমার চোখের চাহনিতে আর সর্বাঙ্গের বসন্ত শোভায়
স্পর্শ করল আমার প্রাণরশ্মি লেখা।
তুমি উঠলে জেগে,
সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যেমন জাগে রাজকন্যা!
অভিনন্দন জানালে আমাকে হেসে,
তুমি অপরূপ,
তুমি নিত্য সৃজন ক'রে চলেছ আপনাকে আপন আনন্দে,
তোমার ঐশ্বর্যের মুকুরে সার্থক হোলো
আমার প্রতিচ্ছায়া!
তরুণ অরুণ ধন্য হোলো!

আবৃত্তি করিতে করিতে বীরু নিচে নামিয়া আসিল। ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে ডাকিল, মা?

মা বলিলেন, কেন রে?

আমি ভালোবেসেছি !

পদ্মাবতী চোখ তুলিয়া তাকাইলেন, পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, কা'কে ?

ওই হেমন্তের আকাশকে, তরুণ সূর্যকে, সুন্দর পৃথিবীকে ! রঙে রঙে আমার মন ছেয়ে গেছে মা !—বীরু বিহ্বলকণ্ঠে কহিল।

পদ্মাবতী কহিলেন, তোমার কবিতার খাতা আমি ছিঁড়ে ফেল্‌ব। এই সব হচ্ছে, কেমন ?

তুমি জাহান্নমে যাও। বলিয়া বীরু রাগ করিয়া নিচের তলায় নামিয়া গেল। পদ্মাবতী হাসিয়া তাহার জামায় ফুল তুলিতে লাগিলেন।

বীরুর পায়ের শব্দ পাইয়া পপি ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে ছুটিয়া আসিল। হাত-পা চাটিল, গায়ের উপর উঠিল। তাহাকে লইয়া বীরু কিয়ৎক্ষণ খেলা করিয়া বেড়াইল।

এক সময়ে পপিকে কোলে বসাইয়া সে কহিল, বল ত, ওই—ওই যে আকাশ, ওর চেহারাটা কেমন ? কী রং দেখেছিস ?

পপি চীৎকার করিয়া কহিল, এউ ! এউ !

ঠিক বলেছিস, যেন সমস্তটা জ্বলে যাচ্ছে দাউ দাউ ক'রে। কেন ভালো লাগছে এত ? নতুন ক'রে দেখা হচ্ছে নিজের সঙ্গে।

এউ, এউ !—পপি বোধ করি সম্মতি জানাইল।

বীরু বলিল, পপি, প্রাণ উঠ্‌ল কেঁপে ! যেন উত্তাল, যেন ওর আদি অন্ত নেই, ঝড়ের সমুদ্রে নাম্‌ল দিগন্তজোড়া অন্ধকার !

এউ, এউ, এউ, এউ—

না রে, মালঞ্চ নয়, রণক্ষেত্র ! জ্যোৎস্না নয়, দক্ষিণ হাওয়া নয়, নয় ফুলদোল—

এউ—

হ্যাঁ, সংঘাত, ভয় ভীষণ। বন্ধু শত্রু হবে, আত্মীয় হবে পর। পপি, তোকে ছাড়তে হবে হয়ত। বলিয়া বীরু তাহাকে কোলে চাপিয়া আদর করিতে লাগিল।

এই চন্দর, তোর ধামায় কি রে, কি নিয়ে যাচ্ছিস ?

চন্দর থামিয়া বলিল, এর দিকে চেয়ো না, বুড়োকর্তার জন্ত ফলপাকড়—

বীরু কহিল, এদিকে নিয়ে আয়। আয় বল্‌ছি!

চন্দর পলাইবার চেষ্টা করিতেই বীরু গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ধামা হইতে পেঁপে আর কমলালেবু তুলিয়া কহিল, যা এবার।

অমন কাজ ক'রো না দাদাবাবু, বুড়োকর্তার শরীর ভালো না, এই খেয়ে থাকবেন—

যা, পালা। বল্‌গে চিলে ছোঁ দিয়েছে ধামায়।

চন্দর কহিল, চিলে বুঝি ফল খায়?

বীরু ততক্ষণে পেঁপে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, কমলালেবুর খোসা ছাড়াইতেছে। চন্দরের কথায় মুখ তুলিল। তাইত, এই কথাটা সে ভাবে নাই! মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে বড়ও হয় নাই, জ্ঞানও হয় নাই।

আবার আমাকে বাজারে যেতে হবে তোমার জন্তে—বলিয়া চন্দর অন্দর-মহলের দিকে চলিয়া গেল।

পপিকে কমলালেবু খাওয়াইল, পেঁপে খাওয়াইল; নিজেও খাইল। তারপর বাগানের কলে হাত ধুইয়া বাড়ির পশ্চিমদিকের ফুলতলায় আসিল।

এদিকে খানকয়েক ছোট ছোট ঘর বরাবরই পড়িয়া থাকে। আগে ওপাশে আস্তাবল ছিল; এখন ঘোড়াও নাই, গাড়ীও নাই। কোচম্যান্, সহিস ও চাকরদের ঘর তালা লাগানো। এদিকের দুইখানা ঘরে আগেকার কালে অতিথি-সজ্জন আসিলে তাহাদের জন্ত ব্যবস্থা করা হইত। তখন দাদামশায়—তাহার মায়ের বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। এ বাড়িটা তাঁহাদেরই। একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া তাঁহার সন্তানাদি আর কেহ ছিল না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর পদ্মাবতীই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। ব্যাঙ্কে জমা টাকার অঙ্কটাও নিতান্ত কৃশ নয়।

দালানের উপরে উঠিয়া বীরু ডাকিল, কর্তামশাই—?—এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে অতিথিঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

বৃদ্ধের নাম মথুরামোহন। তিনি বলিলেন, এসো দাদা—

তোমার ফলপাকড় সব চিলে ছোঁ দিয়ে খেয়েছে, শুন্‌তে পেয়েছ?

পেয়েছি বৈকি ভাই, হুস ক'রে তুলে নিয়ে গেল, এখান থেকে গলার আওয়াজ পেলুম।

বীরু হাসিয়া কহিল, এটা তোমার মিথ্যে কথা, সরকার মশাই।

মথুরাবাবু হাসিলেন। বলিলেন, আর কটা দিন বাঁচবো ভাই? দুচারটে মিথ্যে কথা এই বেলা ব'লে নিই!

তুমি চিরকাল মিথ্যে কথা বলেছ!

মথুরাবাবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। তারপর বলিলেন, উহুঁ, না—বেশ মনে করতে পারি কবে কবে সত্যি কথা বলেছি।

বীরু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, তোমার নাকি অসুখ কর্তামশাই?

অসুখ হলেই ত বাঁচি ভাই!

কেন?

তোর ঘাড়ে চড়তে পাবো, এ কি কম লাভ?

বীরু কহিল, ইঃ মরতে এখন তোমার অনেক দেরি, তা' ব'লে রাখছি। তুমি মরলে আমাদের হিসেবের টাকা চুরি করবে কে?

মথুরাবাবু কহিলেন, আমারো একবার সেই দুঃখ হয় দাদা, গরীব দুঃখী মানুষ, টাকা চুরিতে আমার বড় আনন্দ।

এও তোমার মিথ্যে কথা সরকার মশাই, তুমি মোটেই চোর নও! আচ্ছা সরকার মশাই, তুমি বিয়ে করোনি কেন?

এইবার করবো ভাই!

বীরু কহিল, কা'কে?

বুড়া কহিল, তুমি যাকে ঘরে আন্‌বে?

বীরুর বুকের ভিতরটা ধক করিয়া উঠিল। মনে হইল যেন নিঃশব্দে রাণু আসিয়া তাহার পাশে বসিয়াছে। যেন তাহারই মতো রাণুও এই বুড়াকে ক্ষ্যাপাইতেছে। বীরু বাহিরের দিকে চাহিল। গাঁদার চারাগুলি মাথা দুলাইয়া হাসিতেছিল।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, জানো কর্তামশাই, একজনের বউকে নিয়ে

আর একজন ঘুরে বেড়ায়, তুমি বোধ হয় তার কথা জানো। তোমার কথাটা নতুন নয়।

বুড়া কহিল, বেড়ালেই বা, ক্ষতি কি ভাই?

না কর্তামশাই, একটা বিশ্রী সম্পর্ক—এই ধরো মিষ্টার লাহিড়ী, আর মিসেস বাসু। I hate her! কর্তামশাই, মেয়েছেলে যদি একবার মন্দ হয় তবে সে আর জীবনে মাথা তুলতে পারে না। একটু থামিয়া বীরু পুনরায় কহিল, আজকে সেই কথাটা বলবে কর্তামশাই?

কোন্ কথাটা ভাই? আমি ছেলেবয়সে কা'কে ভালোবেসেছিলুম, সেই কথা?

না গো!

বুড়া নিজের আনন্দে হাসিয়া কহিল, সে ভাই কী লটাপটি! নাপতের মেয়ে, এই জোয়ান,—আমার চেয়ে দু'বছরের বড় ছিল! নাম মিনু। যাঃ—একদিন ম'রে গেল!

সেই থেকে বুঝি তুমি ব্রহ্মচারী?

দাঁতপড়া মুখে বুড়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার হাসি থামিলে বীরু কহিল, চুলোয় যাক্ তোমার প্রেমের গল্প। আজ আমাকে যদি সেই কথা না বলো তবে তোমার হুঁকো ভেঙে দিয়ে যাবো।

বুড়া কহিল, মরবার সময় আবার আমারই নাম করতে করতে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,—ভাইরে গেলুম সন্ন্যিসি হয়ে, তারপর অনেককাল পরে ফিরে এলুম তোমার মায়ের অন্নপ্রাশনের সময়! বিয়ে করা আর হলো না ভাই! ভাবছি এবার একটা মেয়েকে ধ'রে তুই আর আমি একই সঙ্গে মালা বদলটা—

নিজের মনে বিদ্রূপ করিয়া বীরু কহিল, যেমন সুশান্ত রায় আর বীরেন চৌধুরী!—এই কিন্তু ভাঙলুম তোমার হুঁকো—!

এই বলছি, বলছি,—আচ্ছা, কী কথা বল্ ত? ভুলেই গেছি।

মিথ্যে কথা বলছ, ভুলে তুমি যাও নি।

যাইনি? তা হবে। বিয়ে না করলে মাথার ঠিক হয় না।

বীরু শাসাইয়া কহিল, এইবার কিন্তু ভাঙলুম—

বুড়া কহিল, আচ্ছা বলি। তোর বাবার নাম দেবেন চৌধুরী, খুব বড়লোক, জমিদার—

কোথাকার? বলো শিগগির বলছি।

বুড়া চাপা গলায় কহিল, লাঙ্গলবাড়ী তাঁর তালুক। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুদর্শন—কিন্তু—

বীরু উদ্‌গ্রীব হইয়া কহিল, কিন্তু কী, কর্তামশাই?

বুড়া হাসিয়া কহিল, বনেদী জমিদার কিনা,—শাসনের দম্ভটা তাঁর স্বভাবে জড়ানো—

বীরুর মুখ গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বুড়া কহিল, এই ধরো, তোমার মায়ের ব্যক্তিত্বকে তিনি ক্ষুণ্ণ করতে চাইলেন। তাইতেই বাধলো বিরোধ।

বীরুর মুখখানা দেখিতে দেখিতে বিবর্ণ হইয়া আসিল। আয়ত ও ভারাক্রান্ত দুই চোখ বাহিরে হেমন্তের দূর আকাশের দিকে ফিরাইল। ধীরে ধীরে যেন তাহার চোখ খুলিয়া যাইতেছে। সে আর ছেলেমানুষ নয়, তাহার দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গেল। কহিল, মা বুঝি চ'লে এলেন বাপের বাড়ি?

আরো কথা ছিল ভাই। তুমি কোথাও প্রকাশ করবে না ত?

ব্যস্ত হইয়া বীরু সরিয়া আসিল। কহিল, না বলব না, তুমি বলো। তোমার পায়ে পড়ি কর্তামশাই, বলো।—তাহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছিল।

মথুরাবাবু বলিলেন, শুনলে তুমি যদি দুঃখিত হও দাদা?

বীরু বুড়ার দুইটা হাত জড়াইয়া ধরিল। কহিল, বলো, তোমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না, তুমি বলো সব। সত্য কথায় দুঃখ কেন পাবো?

বুড়া কহিল, তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন।

তারপর?

তারপর—দু'জন মা তোমার হলো!—বলিয়া বুড়া তাহার ভাঙা দাঁত লইয়া এই অর্বাচীনের মুখের উপর স্নেহের হাসি হাসিল।

বীরু কহিল, সেই থেকে আমার মা এখানে?

বুড়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিতে দেখিতে শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। যে সত্য লইয়া তাহার এই দীর্ঘ পরমায়ু, যে সত্য লইয়া

আজীবন এই পরিবারের মধ্যে সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আজিও সেই নিষ্ঠুর সত্য তাহার কণ্ঠে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, না ভাই, তোমার তখন জন্ম হয় নি। তুমি যাঁর গর্ভের সন্তান, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

বীরু কহিল, মানে? কী বলছ?

বুড়া কহিল, তখন তুমি প্রায় তিন বছরের ছেলে, অন্তিম সময়ে তোমার মা তোমাকে সঁপে দিয়ে গেলেন পদ্মাবতীর হাতে। তোমার বাবা তখন প্যারিসে।

একটি মুহূর্ত, দুইটি, তিনটি,—অকস্মাৎ দমকা বাতাসের মতো বীরু হাসিয়া উঠিল। কহিল, বুড়ো সব তোমার মিথ্যে কথা। আচ্ছা, আমি কিছু বলব না, তোমার দিব্যি—বলো ত তিনি এখন কোথায়?

বুড়া বলিল, কে, তোমার বাবা? জানিনে কোথায়। তবে এই সেদিন কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল, তার সঙ্গে দেবেনের এখনকার ফটো। কাটিং রেখে দিয়েছি।

কী খবর?—বীরু যেন চেঁচাইয়া উঠিল।

বুড়া কহিল, তিন লক্ষ টাকা তিনি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দিতে চান্, গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছেন।

কই, দেখি তাঁর ফটো? মিথ্যে কথা তোমার!

আগে বলো কোথাও এসব নিয়ে—?

না, না, বুড়ো না—এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি।

বুড়া তাহার গোপন ঝুলি খুলিয়া ছবিশুদ্ধ কাটিং বাহির করিল। বীরুর হাত কাঁপিতেছে, বুক কাঁপিতেছে! তাহার ভবিষ্যৎ, অতীত, তাহার জীবন আর মরণ কাঁপিতে কাঁপিতে যেন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বুড়ার সকল কথা মিলিয়াছে, আর কিছু জানিবার নাই। বীরু উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

কাঁদিবে? রাজপথে গিয়া লোকজন জড়ো করিয়া সে কি কাঁদিবে? চীৎকার করিয়া নিজের নখে নিজের টুঁটি ছিঁড়িয়া ফেলিলে কি তাহার মনের চেহারা দেখানো যাইবে?

মিথ্যা, সমস্তটাই যেন অদ্ভুত ফাঁকি! মিথ্যার মধ্যে তাহার জন্ম, মিথ্যায় সে মানুষ, মিথ্যায় ভরা তাহার সমস্ত ইতিহাস!

কাঁদিবে সে? পদ্মাবতী তাহার মা নয়—কে বলিল? এতদিনের এই বিপুল কাহিনী, এর ভিতরে সত্য নাই? বীরু যেন নিজেকেই প্রশ্ন করিল। প্রশ্ন করিল জীবন-বিধাতাকে।

জননী মিথ্যা? পিতার পরিচয়ে অপমান? সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় এতদিনের এই জীবন—এর সমস্তটাই ফাঁকি, কৃত্রিম? মা তাহার মা নয়?

সে কি কাঁদিবে?

কে যেন পিছন হইতে তাহাকে দুর্দান্ত তাড়না করিতেছে। এখানে তোর অধিকার নাই! কাহাকে মা বলিয়াছিস? কোথায় কাহার আশ্রয়ে আছিস, কে তোর অন্ন যোগায়?—ওরে হতভাগ্য, কাহার প্রাসাদে বসিয়া এতকাল পিতৃ-পরিচয় লইয়া গর্ব করিতেছিলি? এই শৌখিন সম্পর্ক চূর্ণ করিয়া যেদিকে চোখ যায় দূর হইয়া যা—ওরে দীন, ওরে পথের কাঙাল।

বীরু পথে বাহির হইয়া গেল।

কত পথ কতদিকে গিয়াছে! সত্য কোন্ পথে? কে তাহার মা? কেমন সে নারী? বুড়া তাহাকে কী কথা শুনাইল?

ইহারই কি নাম স্ক্যাণ্ডাল? লাহিড়ী কি তাহাকে এই কথাই শুনায়?

আজ হইতে সমস্ত জীবন এই প্রশ্নের বোঝা লইয়া বেড়াইতে হইবে। বীরু পথে পথে ঘুরিতে লাগিল।

হেমন্তের অপরাহ্ণে আকাশে আর আলো নাই, যেন মৃত্যুর মতো পাণ্ডুর। পথ দিয়া কাহারা যায়, কাহারা চলে দলে দলে, কোথা হইতে কাহারা কোথায় মিলায়? পথের অশ্রান্ত লোকযাত্রায় নিজেকে মিলাইয়া চলিতে চলিতে সে ভাবিল, এই ত সহজ, এই ত স্বাভাবিক। তাহার পরিচয় নাই, বংশমর্যাদা নাই, সে ইহাদেরই একজন, অসংখ্যের একটি সংখ্যা। আভিজাত্যের স্থূল অহংকার,—অগণ্য শ্রমিকের রক্তক্ষরণে যাহার জন্ম, যাহার তলায় সর্বনিকৃষ্ট দুর্নীতির ভিত্তি,—দাও তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া! কোথায় ইহাদের সহিত তাহার প্রভেদ?—বীরু পথের মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইল।

মা তাহার মা নয়! ওই দুই আয়ত চক্ষুতে যাঁহার অমৃতের ধারা ঝরিয়া

পড়ে, ললাটে যাঁহার মাতৃমহিমার অনির্বচনীয় দীপ্তি, সন্তানের স্বাচ্ছন্দ্য-সাধনায় দুই করতলে যাঁহার অক্লান্ত সেবা, যাঁহার প্রাণপ্লাবিনী বাৎসল্য—সেই মা তাহার মা নয়? মিথ্যার ভিতরে, ফাঁকির ভিতরে বাসা বাঁধিয়া নির্বোধ বন্য-পশুর মতো সে বড় হইয়া উঠিয়াছে? অসত্যের হলাহলে জর্জরিত তাহার এই অভিশপ্ত জীবন, পতিত জন্ম।

মুখ দিয়া একটা আর্তস্বর বাহির হইতেছিল, দুই হাতে বীরু মুখ ঢাকিল। কী লজ্জা, কী গভীর অসম্মান!

সন্ধ্যার বাতাস যেন বিষে ভরিয়া উঠিয়াছে, আকাশটা যেন কারাগারের মতো তাহাকে বন্দী করিয়া খোঁচাইতেছে। যেন মিথ্যার ভয়ঙ্কর নরক, পথের আলোগুলি যেন কোনো প্রেতিনীর জলন্ত চক্ষু! বীরুর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল!

ময়দানের সবুজ ঘাসগুলির উপরে শিশিরবিন্দু ঝলমল করিতেছিল। সকালের রৌদ্রে স্নিগ্ধ শীতের হাওয়া জড়ানো। আকাশ প্রসন্ন নীল, মাঝে মাঝে পাখীর দল ভাসিয়া চলিয়াছে। দূরে চৌরঙ্গীর পথ জনবিরল, দু' একখানা দ্রুতগামী মোটর ছাড়া আর কোথাও কোনো ব্যস্ততা নাই। আজ ছুটির দিন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠ পার হইয়া একখানা মোটর আসিয়া পূর্বদিকের গির্জার ধারে দাঁড়াইল। সুশান্ত ড্রাইভ্ করিতেছিল, পাশে বসিয়াছিল রাণু। দুইজনে গাড়ী হইতে নামিয়া যখন মাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল, গির্জার ঘড়িতে মৃদু গভীর শব্দে আটটা বাজিতে লাগিল। দূর হইতে দূরান্তরে সেই ঘণ্টার আওয়াজ কেমন যেন করুণ উদাস কালপ্রবাহের বার্তা জানাইয়া দেয়।

রাণুর পরনে একখানা শাদামাঠা শাড়ী, জরির পাড় বসানো। পায়ে মোজা-জুতা, গলায় একটা ফ্লানেল্ মাফ্লার। মাথার খোঁপা যেমন তেমন করিয়া বাঁধা, কপালে আর কানের নিচে চুলের ঝালর নামিয়াছে। ভোরের তন্দ্রার আলস্য এখনও তাহার মুখে মিলায় নাই।

সুশান্ত ধুতি পরিয়াছে, আজ তাহার ছুটি। গায়ে ভায়েলার ঘন বেগুনী রংয়ের পাঞ্জাবি, ধুতিখানা শান্তিপুরের,—কালো মখমলের ধারি দেওয়া। পায়ে একজোড়া য়্যালবার্ট্।

ঘাসের ডগায় ডগায় শিশিরবিন্দুর রঙিন মুকুট। তাহারই উপর দিয়া চলিতে চলিতে শাড়ীর কিনারা ভিজিয়া উঠিতেছিল। জুতা-মোজায় দুই চারিটা ছেঁড়া ঘাস লাগিয়াছে। কিন্তু তেমনিভাবেই চলিতে চলিতে রাণু এক-সময় কহিল, মনে থাকবে ত এবার থেকে ?

সুশান্ত কহিল, যদি না থাকে তবে পুরুষ ব'লে আর পরিচয় দেবো না।

রাণু বলিল, আমাকে ক্ষমা করো, প্রথম দিকে তোমার ওপর অবিচার করেছিলুম। আমি বুঝতে পারিনি যে, তুমি সাধারণের একজন নও। মানুষ কত ভুল করে! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তুমি অনুভব করেছিলে আমার মন।

সুশান্ত কহিল, লোভটাই মানুষকে ঘোরায়, বিচার-বুদ্ধি নষ্ট করে। তুমি বিশ্বাস করো রাণু, তোমার বাবার শত অনুরোধ সত্ত্বেও স্বার্থের স্বপ্ন আমি দেখি নি, নিজেকে আমি বিচার ক'রে চলেছিলুম। এমন দেখেছি, মুখে সৌজন্য, ভদ্র আলাপ, নিখুঁৎ চালচলন,—কিন্তু তাদেরই ফাঁক দিয়ে প্রকাশ পায় চাপা লোভের ইঙ্গিত, বড় করুণা হয় তাদের ওপর।

রাণু কহিল, একটা ভয় হচ্ছে—তোমাকে বল্‌ব ?

বল্লো নিঃসঙ্কোচে।

তুমি কি এবার থেকে আসবে না ?

সুশান্ত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, রাণু, নিতান্ত নির্বোধ আমি নই। তোমার সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবো সামান্য কারণে ?

হঠাৎ রাণু তাহার হাত ধরিল। কহিল, তুমি সত্যিই বড়। তুমি যে নিরভিমান, এ আমার পক্ষে অসীম আনন্দ! মনে করেছিলুম আমার কথায় তুমি আঘাত পাবে, আমার স্বীকারোক্তি দেবে তোমাকে দুঃখ—কিন্তু—হায় রে, কে জানত আমার সেই অহংকার চূর্ণ হবে! তুমি এত সহজ, এত স্বচ্ছ আমি জানতে পারি নি, আমার আত্মাভিমান তোমার মহিমার নাগাল পায় নি।

এমন কথা বলতে নেই রাণু!

রাণুর চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল। বলিল, বলব না? তুমি যে এনে দিলে আমার জীবনে গৌরব, তোমাকে আঘাত করবার চরম লজ্জা থেকে আমাকে যে দিলে মুক্তি! লোভ আর অসম্মানের অন্ধকূপ থেকে দুজনের সম্পর্ক নির্মল হয়ে উঠ্‌ল, এর চেয়ে বড় সঞ্চয় জীবনে আর কী হ'তে পারে?

সুশান্ত কহিল, বলো, আমি তোমার কোন্ কাজে লাগতে পারি?

রাণু কহিল, যে শক্তিতে তুমি আজ আমার চোখে বড় হয়ে উঠেছ, সেই শক্তিতেই তুমি আমার কাজ খুঁজে নেবে! তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই, আমি তোমার ছোটবোন হয়ে জন্মাতে পারি নি।

সুশান্ত স্নিগ্ধ হাসিমুখে কহিল, এই আমার পরম পুরস্কার, রাণু। চলো এবার যাই, সেই কোন্ ভোর থেকে—

রাণু কহিল, আর একটু থাকি, ভালো লাগছে তোমার কাছে। কাল রাতে ঘুমোইনি, অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, ভোরে গিয়ে তোমার পা জড়িয়ে ধরবো।

সুশান্ত তাহার হাত ধরিয়া কহিল, পাগল!

সত্যি, আমি মনে করেছিলুম এই মালিন্য থেকে বুঝি আর মুক্তি নেই। তাই আর দেরি সইলো না, ভোরে উঠে তোমাকে টেলিফোনে ডাকলুম! সুশান্তদা, মেয়েমানুষের এটা জীবন-মরণ সমস্যা, প্রাণ নিয়ে টানাটানি। লজ্জা ক'রে থাকলে চলে না।

সুশান্ত হাসিমুখে বলিল, আমি ঘুমচোখে গাড়ী নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেই একেবারে আমাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন! আমি স্তম্ভিত।

রাণু কহিল, ওটা আমার কূটবুদ্ধি, উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া। 'আপনি'র বেড়া ডিঙিয়ে কাছে না এলে তুমি আমার মনের কথা শুনতে পেতে না। তাই প্রথমে তোমাকে দিয়েও 'তুমি' বলিয়ে দিলুম।—বলিতে বলিতে সে হাসিল।

সুশান্ত কহিল, তোমার বাবার কাছে প্রকাশ করবো এই কথা?

রাণু কহিল, না, তোমাকে তিনি ভুল বুঝবেন। স্নেহ করেন তিনি তোমাকে, তোমার কথায় আঘাত পাবেন।

কিন্তু তাঁর মন যে নানা কল্পনায় আচ্ছন্ন!

ব্যর্থ হবে তাঁর কল্পনা যথাসময়ে। ওখানে আমার জোর আছে, আমি জানি যুদ্ধ করতে।

তোমার জয় হোক।—সুশান্ত হাসিয়া কহিল।

মাঠে মাঠে মুক্তির আনন্দ যেন ছড়াইয়া গিয়াছে। আকাশ সূর্যের কিরণে হাসিতেছিল। আজ যেন দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া রাণুর খুশির প্রাণ উছলিয়া উঠিতেছে; যেন নিজেকে ধরিয়া রাখিবার আর জায়গা নাই। বুক ভরিয়া সে একবার নিশ্বাস লইল।

গির্জার দক্ষিণে জলাশয়ের ধার ঘুরিয়া তাহারা হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়া গাড়ীতে চড়িল। মুখের উপর হইতে চুলের গোছা সরাইয়া মনে মনে সে ভাগ্যদেবতাকে প্রণাম জানাইয়া কহিল, আজকের আনন্দ অক্ষয় হোক।

লোয়ার সারকুলার রোড দিয়া আসিতে অল্প সময়ই লাগিল। বেলা সাড়ে নয়টা বাজে। পার্ক সার্কাসের বাড়ির দরজায় আসিয়া পৌছিতেই রামশরণ দ্রুত আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল।

আনন্দে রাণু লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, তারপর কহিল, মনে থাকবে ত?

সুশান্ত কহিল, মন ভ'রে গেছে, তবু যদি জায়গা পাই রাখব বৈকি।

রাণু হাসিতে হাসিতে কহিল, ফোনে তোমাকে ডাকব। আচ্ছা, গুড ডে।

গুড্ ডে বলিয়া সুশান্ত গাড়ী চালাইয়া দিল।

ড্রয়িংরুমে একখানা ডেক চেয়ারে লাহিড়ী বসিয়া বন্ধুদের সহিত গল্প করিতেছিলেন। আজ একজন নূতন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। রাণু আসিয়া ঢুকিল। হাসির উচ্ছ্বাসে তাহার মুখখানা তখনও রক্তাভ। তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ আনন্দে আর উল্লাসে লাহিড়ী সোজা হইয়া বসিলেন, একি, একা এলে যে মা? সুশান্তকে আন্‌লে না ধ'রে?

একখানা চেয়ারে রাণু বসিল। বলিল, এলেন না তিনি, এত ক'রে বললুম, কিন্তু পৌছে দিয়ে চ'লে গেলেন।

খেতে বলেছিলে?

আমার কথা কেউ শুনতে চায় না বাবা।

লাহিড়ী একবার বন্ধুগণের দিকে তাকাইলেন, একবার তাকাইলেন কন্যার

দিকে, তারপর অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া যেন সকল কথারই উত্তর দিয়া দিলেন।

হাসির ভিতরে ইঙ্গিত আছে, অর্থ আছে, প্রত্যাশা আছে। কিন্তু সুশান্তর শেষের কথাগুলি স্মরণ করিয়া অপমানে রাণুর মাথা হেঁট হইয়া গেল। বলিবার কিছু নাই, কন্যা হইয়া অনেক লজ্জা তাহাকে সহ্য করিতে হয়।

ব্যানার্জি কহিলেন, রাণু, তোমার পায়ে জলকাদার দাগ, ছেঁড়া ঘাসের ডগা —কতদূর গিয়েছিলে?

রাণু একবার নিজের পায়ের দিকে তাকাইল, তারপর কহিল, মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম দু'জনে, তাইতেই বোধ হয় লেগে থাকবে।

দু'জনে?—কে কে?

ভ্রূকুঞ্চন করিয়া রাণু একবার ব্যানার্জির দিকে তাকাইল। তারপর কিছু রূঢ়কণ্ঠে কহিল, অনিলকাকা, আপনি সমস্তই জানেন তবুও প্রশ্ন করেন কেন? দু'জনে মানে এতক্ষণ কি আপনি বোঝেন নি?

কথাটা সুস্পষ্ট, সতেজ। আর একটি ভদ্রলোক পাশেই বসিয়াছিলেন। রাণুর গলার আওয়াজে সহসা তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন। তিনি নবাগত, রাণুর সহিত পরিচয় নাই। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু রূপবান, চেহারাটা উন্নত, দীর্ঘ, পুরুষের মধ্যে পুরুষ। মুখে একটা পাইপ দিয়া তিনি একখানা চিত্র-প্রধান বিলেতী মাসিকপত্র পাঠ করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া তিনি স্নেহের হাসি হাসিলেন; অর্থাৎ যাহার সহিত সন্তান-সম্পর্ক তাহার রূঢ়ভাষণ সর্বদাই মার্জনার সহিত হাসিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু কন্যার ব্যবহারে পিতা লজ্জিত হইলেন। মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন, রাণু, রাগের কোনো অর্থ নেই। তোমার আর একটু সামাজিক হওয়া দরকার।

রাণু মাথা হেঁট করিয়া রহিল, কথা বলিল না।

ব্যানার্জি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, আমি যাই রোহিণী, মামলাটা নিয়ে ভারী ব্যস্ত।—হঠাৎ হাসিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, রাণু, তুমি বোধ হয় মাঝে মাঝে ভুলে যাও আমি তোমার বাবার বন্ধু! হেঁ হেঁ—

ওপাশের ভদ্রলোকটি প্রবীণ এবং শান্ত। মুখের পাইপটা সরাইয়া তিনি

মিষ্টকণ্ঠে কহিলেন, যাকগে মিষ্টার ব্যানার্জি, সামান্য কথা! আপনার প্রশ্নে উনি একটু অফেন্স্ নিয়েছিলেন, মেয়েদের মন ত! যাকগে—

কিন্তু রাণুর মাথার রক্ত আজ গরম হইয়া উঠিল। অনেক সহ্য করিয়াছে, আর সে বাধা মানিল না, ফস্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অনিলকাকা, আপনিও ভুলে যান্ যে আমি আপনার মেয়ের মতন! কিন্তু আপনার গোপন গোয়েন্দাগিরি দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে,—আমার বিরুদ্ধে যে-চিঠি আপনি লিখেছিলেন মিসেস্ বাসুর কাছে,—মনে পড়ে আপনার সে-চিঠির ভাষা? কী লিখেছিলেন বাবার সম্বন্ধে? বিলাতের পি-এচ্-ডি আপনি, আপনি কাউন্সিলের মেম্বার!

ছি ছি, কী বলছ মা?—লাহিড়ী দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

রাণু কহিল, বাবার বন্ধু হয়ে আমার সম্মান রেখেছেন খুব! বোধ হয় আপনার জানা ছিল না যে, মিসেস্ বাসু বাবার বিশেষ পরিচিত!—বলিয়া নিজেই সে বাহির হইয়া গেল।

তিন জন বন্ধুই স্তম্ভিত; কাহারও মুখে কথা নাই। যেন বিনামেঘে হঠাৎ বজ্রাঘাত হইয়াছে। ব্যানার্জি কি করিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, একবার লাহিড়ীর দিকে তাকাইলেন, তারপর বিবর্ণ মুখে বলিলেন, এটা বাহাদুরি, নিছক বাহাদুরি, এর নাম সৎশিক্ষা নয়, ভদ্রলোককে সকলের মাঝখানে অপমান করাটা সহজ, কিন্তু একে কাল্চার বলে না!—বলিতে বলিতে ওপাশের ভদ্রলোকটিকে নমস্কার জানাইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। গেটের বাহিরে তাঁহার মোটর অপেক্ষা করিতেছিল।

লাহিড়ী অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। বোধ হয় ভাবিতেছিলেন, মণিপ্রভার নিকট ব্যানার্জি কী লিখিয়াছে? কী লিখিতে পারে তাঁহার কন্যার সম্পর্কে? গোয়েন্দাগিরি! কাহাকে লইয়া? কাহার বিরুদ্ধে? তবে কি মণিপ্রভার সহিত ব্যানার্জির গোপনে পত্র-ব্যবহার আছে? কী চাহে ব্যানার্জি? নানা সন্দেহে ও প্রশ্নে লাহিড়ী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

ওরে রামশরণ!

হুজুর!—বলিয়া রামশরণ আসিয়া দাঁড়াইল।

লাহিড়ী কহিলেন, দিদিমণিকে সেলাম দেও।

খবর পাইয়া রাণু আসিয়া দাঁড়াইল। সে মানুষ আর নাই, চোখ দু'টি ভারাক্রান্ত; জলে ভিজা। লাহিড়ী কহিলেন, আজ তোমার মন বোধ হয় ভালো নেই মা, সে ত হবেই, খুবই স্বাভাবিক। উত্তেজনাটাকে সহজ মনের চেহারা বলব না। তোমাকে ডেকেছিলাম এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো বলে। ইনি আমার বিশেষ বন্ধু—

রাণু তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, ভারী অন্যায় ক'রে ফেলেছি তখন, গুরুজন আপনি, আমাকে ক্ষমা করুন—বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল।

তিনি রাণুর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, আমি ত এসবের কিছু জানিনে, সুতরাং কিছু বুঝতেও পারি নি। তুমি শান্ত হও।

লাহিড়ী ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া মৌখিক সৌজন্য টানিয়া বলিলেন, ওঁকে তুমি আগে দেখোনি মা। উনি লাঙ্গলবাড়ির জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী। প্যারিসে হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনে আমার সঙ্গে আলাপ, উনি খুব আমুদে মানুষ। ওঃ সে আজ কতকাল আগের কথা!—বলিয়া তিনি যেন গভীর ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

রাণু হাসিমুখে কহিল, এখন বুঝি কল্‌কাতাতেই থাকেন?

দেবেনবাবু বলিলেন, ঠিক নেই মা। অল্প বয়েস থেকেই মনটা বড় চঞ্চল, সেটা এখনো নানাদিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কখনো থাকি লাঙ্গলবাড়িতে, কখনো দম্‌দমার বাড়িতে, আবার কখনো বা দেশদেশান্তরে। তোমার বাবার চেয়ে আমি বয়সে বড়! এই ধরো, ছ'বছর পরে লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা। কাল একটা মামলা ছিল হাইকোর্টে, গিয়ে দেখি মূর্তিমান উনি দাঁড়িয়ে। ওর এই নতুন বাড়ি আমি আগে দেখি নি।

রাণু কহিল, আপনাকে জ্যাঠামশাই বলব। কিন্তু মেয়েদের একটা রোগ, তারা আগেই ঘরের কথা পাড়ে। আপনার ছেলেমেয়ে, আমার জেঠীমা—তাঁরা সব কোথায়? তাঁদের আমি দেখব।

দেবেনবাবু কহিলেন, সন্তানাদি আমার নেই মা। তোমার জেঠীমা—হ্যাঁ, আছেন তিনি, আমার কাছে ঠিক নেই—

লাহিড়ী ও দেবেনবাবু পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

লাহিড়ী কহিলেন, বুঝলে মা, চিরটা কাল দেবেনদার পাগলামি ক'রে কাটুল, এমন ভবঘুরে আর দেখি নি। বারোটা ভাষায় ও সুপণ্ডিত, সকল শাস্ত্র ওর করতলগত।

অদ্ভুত আপনি ত জ্যাঠামশাই?—রাণু বড় বড় চোখে তাকাইল।

আরো আছে, ঠাকুর-দেবতায় ওর অগাধ ভক্তি!

থামো হে লাহিড়ী।—দেবেনবাবু হাসিয়া বাধা দিলেন।

লাহিড়ী কহিলেন, থাম্‌বো কেন? রাণু, আজ তুমি শুনবে ওর নানা গল্প। আজ আমাদের এখানে ও লাঞ্চ্ খাবে। তোমাকে আজ দুপুরবেলাটা ধ'রে রাখবো দেবেনদা।

রাণু উৎসাহিত হইয়া কহিল, আমাদের রান্নাও প্রায় হয়ে গেছে।—বলিয়া সে হাসিমুখে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

গলা নামাইয়া দেবেনবাবু কহিলেন, সাবধান হে, আমার পূর্ব ইতিহাসটা—

লাহিড়ী বলিলেন, Damn it, it is dead!

চার

হ্যালো!—পার্ক ফাইভ্ টু নাইন! ফাইভ্—টু—নাইন্!! ইয়েস্!—মণিপ্রভা বামকর্ণে রিসিভার ধরিয়া রহিলেন।

হ্যালো! Yes, Mrs. Basu speaking. কে, রাণু নাকি? হ্যাঁ, তোমাকেই ডাক্‌ছি।—তোমার বাবা? তিনি ওপরে, আমার ঘরে। হ্যাঁ, আমার ষ্টাডি থেকে কথা বল্‌ছি। শোনো শোনো, বীরু এইমাত্র আমাকে ফোন্ করেছিল।

যন্ত্রের ভিতরে রাণু কথা কহিল, কেন?

ফোনে হঠাৎ বললে, মিসেস বাসু, আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাই; সেদিন কার্জন পার্কের ধারে আমি মনে মনে আপনাকে অসম্মান করেছিলুম।

হাঃ হাঃ হাঃ, বীরুটা পাগল!

শোনো, তুমি কিন্তু এক্ষুণি বীরুকে ধরো। সে যাচ্ছে বম্বের দিকে। বলছে, আর ফিরবে না। হ্যাঁ, না বলেই যাচ্ছে! আমার কাছে তোমাকে শেষ সম্ভাষণ জানিয়ে গেল।

সে কি, কেন? কেন যাচ্ছে?

সে আর কারো কাছে মুখ দেখাবে না! হ্যালো! তুমি ধরো তাকে। বম্বে মেল! না, জানাবো না তোমার বাবাকে। জানিনে কী ঘটেছে! কথায় মনে হোলো desperate! তুমি কি ঝগড়া করেছ তার সঙ্গে?—হ্যালো, হ্যালো? যাঃ ছেড়ে দিয়েছে! মণিপ্রভা হাসিয়া বলিলেন, সেই পুরনো গল্প, নতুন ষ্টাইল্। But the green is always refreshing!

রিসিভারটা রাখিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। পায়ে তাঁহার বর্মা শ্লিপার। পোশাক-পরিচ্ছদটা বৈধব্যের আচার মানিয়া চলে নাই। তাঁহার পরিমণ্ডলে কেমন একটা বাসিফুলের গন্ধ। সৌরভ সামান্য, কিন্তু আবহাওয়াটা মৃদু মধুর।

উপরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, লাহিড়ী বিছানার উপর বসিয়াই চা পান করিতেছেন। চাকরে কখন্ যেন চা দিয়া গেছে।

লাহিড়ী মাথা হেঁট করিয়া হাসিতেছিলেন। এইবার মুখ তুলিয়া কহিলেন, ব্যানার্জিটা লাইসেন্স্ চায়—কেমন?

থামুন। বলিয়া মণিপ্রভা আয়নার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কে চায় না শুনি? আপনার চাপা রসিকতাটা আপত্তিজনক। ওকি, এখনো জামায় বোতাম দেন্নি? আপনি বড় কেয়ারলেস্!

বার বার 'আপনি' বলছ কেন?

আমার খুশি।

লাহিড়ী আবার হাসিতে লাগিলেন। মণিপ্রভা বলিলেন, ব্যানার্জির চিঠি নতুন নয়। অমন অনেকেই লিখেছে। শিক্ষিত লোকের দুরভিসন্ধি বড় গভীর, তারা খুব ভদ্র উপায়ে বিষাক্ত করে মনকে। বারো বছর বয়সে পা দিতে না দিতেই প্রেমপত্রের তাড়া আসতে লাগল আমার নামে। আত্মীয়-সম্পর্কের বাধাগণ্ডী ডিঙিয়ে যারা আসতে লাগল—তাদের প্রস্তাব শুনে আমি

অবাক। লাহিড়ী সায়েব, আগে ভূত দেখে ভয় পেতুম, এখন আর পাই নে। ভূত আমি নিজে।

কিন্তু ব্যানার্জির চিঠিগুলো—

হ্যাঁ, বলি নি আপনাকে এতদিন। কেন জানেন? বাঁচিয়েছি আপনাদের, নইলে নিজেদের মধ্যে আপনাদের হানাহানি হোতো। পার্কের আলো দেখলে আপনি ভয় পান, কিন্তু স্ক্যাণ্ডালের আলোয় নিজেদের বীভৎস চেহারা দেখলে নিজেরাই ভয় পেয়ে যেতেন, পালাতেন দেশ ছেড়ে। শুধু ব্যানার্জি? অনেক, অনেক। লজ্জা করে আলোচনা করতে। বাবার বৈঠকখানায় যাঁরা আসতেন আজ তাঁরা বড় বড় লোক : খবরের কাগজ ওল্‌টালে দেখি মোটা মোটা টাইপে তাঁদের নাম ছাপা হয়। প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কেউ বা নেতা, কেউ কর্পোরেশনের হোম্‌রা-চোম্‌রা—জানেন কতটুকু? মেয়েমানুষকে অনেক সইতে হয়। ফ্যাশনেবল পাড়ায় গিয়ে হ্যাংলামি কা'রা করে জানেন? ওই যাঁদের হাতে সমাজপতিত্ব!

লাহিড়ী বলিলেন, তুমি কি বলতে চাও ব্যানার্জির এই ব্যবহার আমি সহ্য ক'রে যাবো?

মণিপ্রভা বলিলেন, কেন সহ্য করবেন? তেড়ে যান্ লাঠি নিয়ে। বেচারী ব্যানার্জি! কাউন্সিলের বক্তৃতার সঙ্গে ওর চরিত্রের মিল নেই! নির্বোধ হতভাগ্য! কিন্তু ধরা পড়েছে কি কেবল নন্দ ঘোষ? অনেক দলিল আছে, প্রকাশ করব একে একে। ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে থাকি। মেয়েমানুষের গলা বেশিদূর পৌঁছয় না। আপনাদের হাতে শিক্ষা আর সভ্যতা ছড়ানোর ভার! আপনারা দেশে আনেন রুচি আর ফ্যাশনের ডালা! দেশে আইন তৈরী করেন আপনাদের মতন ক'জন ব্যারিষ্টার!

লাহিড়ী চায়ের পেয়ালা রাখিয়া কহিলেন, তবু কাজ ত এরাই করে মণিপ্রভা?

মণিপ্রভা কহিলেন, তাই এমন দুর্দিন! কাজ হোতো আপনার আর আমার বাবার আমলে। এখন কাজের বদলে কণ্ডুয়ন। কল্যাণের ছদ্মবেশে ঘোরে স্বার্থ, সাধুতার মুখোস নিয়ে চলে আদিকালের বর্বরতা। প্রমাণ যদি চান্ তবে একবার টহল দিয়ে আসুন বার-লাইব্রেরী আর উকীল-এটর্ণীর

পাড়ায়, ঘুরে আসুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-মহলে। কবি-সাহিত্যিকদের বলেন কাল্‌চার্ড্? তাদেরও দেখেছি আমাদের আঁস্তাকুড়ে। একেবারে প্রিমিটিভ্! গায়ে লোম, বড় বড় নখ, মুলোর মতন দাঁত! তারা বনমানুষও নয়, বাঘও নয়, তারা বনবিড়াল। নখ দিয়ে আঁচড়ায় পরস্পরকে। এক ফোঁটা রুধিরের গন্ধে দলে দলে এসে হানা দেয়! পরিচয় দেয়—সাহিত্যিক।

লাহিড়ী কহিলেন, আধুনিকের ওপর তোমার রাগ কেন এত?

রাগ নয় গো, রাগ নয়।—মণিপ্রভা বলিলেন, যা কিছু করছে তারাই, তারা আমার প্রিয়।

প্রিয় ব'লে মনে ত হয় না!

হয় না? চেয়ে দেখুন ত আমার দিকে? তাদেরই ত মন ভোলাবার খেলায় মেতে আছি, ছত্রিশ বছরকে ছাব্বিশের ফাঁদে আটুকে রেখেছি। গালে রুজ মাখি, ঠোঁটে ষ্টিক্ বুলোই। হাবে-ভাবে মুনি বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাই। কেন এই দৈন্য?—তার কারণ দলছাড়া হ'তে চাইনে; একটু এদিক-ওদিক হলেই যে খরচের খাতায় নাম উঠবে। আঁটসাঁট হয়ে থাকি, মেয়েমানুষের বড় জ্বালা! তাই ব'লে সইবো কেন ভণ্ডামি?—সমস্ত জীবন ধ'রে খুঁজে বেড়ালুম হৃদয়, খুঁজে বেড়ালুম সত্যের পথ। কিন্তু কে জান্‌ত জাতটাই এই, ইউরোপের সিরাম্ এনে ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়েছেন আপনারা জাতের রক্তে! শিক্ষা-সভ্যতা? কাল্‌চার? কী ওদের মানে? কোথায় রইল আত্ম-পরিচয়? কোথায় গেল প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানগরিমা আর উপনিষদের প্রশান্ত তপোবন? কী এনেছেন আপনারা? কাল্‌চারের নামে ঘাঁটুছেন সাইকো-এনালিসিসের নরককুণ্ড, এডুকেশন্ মানে লোভ আর ঈর্ষ্যা, পলিটিক্‌সের অর্থ কুটিলতা আর চাতুরী। আর কী রইল? সাহিত্য? রামায়ণ-মহাভারতের দেশে কোন্ সাহিত্য আনলেন? কোন্ সাহিত্য পড়বো রবিঠাকুরের পর? কোন্ শাস্ত্র শুন্‌বো অরবিন্দের পর? কোন্ জীবনী জান্‌বো গান্ধীর পর?

মণিপ্রভা চুপ করিলেন।

লাহিড়ী কহিলেন, মেয়েমানুষেই কানামাছি খেল্‌তে ভালোবাসে; চোখ

বন্ধ ক'রে চোর খুঁজে বেড়ায়। তুমি জন্মেছ আধুনিক কালে, চোখ দুটো ভূতের দিকে। নিউরটিক্! তোমাকেও ত দেখলুম মণিপ্রভা? সাইকো-এনালিসিস্ শুনেছ, প্যাথলজি শোনোনি। তুমি কোন্‌টা? মরবিড, না য়্যাব্‌নরম্যাল্? বোধ করি অতিভোজনের অরুচি! কিম্বা বদহজম!

মণিপ্রভা হাসিয়া বলিলেন, আবার চ্যালেঞ্জ করছেন?

করবো বৈকি, তোমার কথার উত্তর তোমার জীবনে। কে দায়ী তোমার জন্যে? তুমিই বোধ হয় একদিন জেনেছিলে সফিস্‌টিকেশন্ মানে কাল্‌চার! বই পড়া মানেই সৎশিক্ষা। ম্যানারিজম্ মানে ফ্যাশন, ফর্মালিটি মানে সৌজন্য। তার প্রতিক্রিয়া নেই? আর দুর্নীতি? ছিন্নমস্তা নিজের রক্তই পান করে নিজে। কে বলেছে পুরুষ এনেছে দুর্নীতি? নীতি-দুর্নীতির চৈতন্য ত তোমাদেরই সর্বাঙ্গে। জগতে সকলের চেয়ে পুরনো ব্যবসা কোন্‌টা? সেটা কাদের হাতে শুনি? লজ্জা! লজ্জা তোমাদের নয়?

মণিপ্রভা কহিলেন, ওগো মশাই, বেশ ত তোমরা! নাচালে নাচো, কাঁদালে কাঁদো—খেলার পুতুল! লোভ দিয়ে যদি লোভকেই টেনে থাকি তবে আবার কাল্‌চারের কথা কেন? কৃষ্টিকে ব'লো না সংস্কৃতি। উৎকর্ষ নয়—কর্ষণ, কাল্‌টিভেশন্! আজো কি সেই ব্যবসার অতিক্রম হয়েছে? ছিল নিচে, উঠে এলো ভদ্র আর অভিজাতের পল্লীতে। আন্‌লে ত তোমরাই। ছিলুম নগণ্য, হলুম অগণ্য। এর কারণ যে তোমাদেরই প্রবৃত্তির অধঃপতন! তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ ঘোচালে তোমরাই। আমরা সবাই এক; একই লক্ষ্য, একই রুচি, একই পোশাক—কেবল ভাষাটা একটু মাজাঘষা! ড্রয়িংরুমের সঙ্গে প্রভেদ কোথায় পতিতার ঘরের? এরা খায় চা, ওরা খায় মদ। ওরা মাতলামি করে, এরা করে পাগলামি। ওখানে আছে মহামায়া মাসী, এখানে থাকেন যোগমায়া পিসী! তবে ওখানে আমরা সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকি। ওখানে হাত পেতে দেহের মূল্য ধ'রে নিই, ফাঁকির কারবার নেই; আর এ-পাড়ায় তোমরা যখন আসো তখন ফ্লার্ট্ করি, কায়দা ক'রে আদায় করি প্রীতি-উপহার। চুপি চুপি বোকাদের কানে বলি—প্রেম!

লাহিড়ী বলিলেন, তোমাদের স্বভাবধর্ম!

মণিপ্রভা কহিলেন, মারো চাবুক, ঘা লাগবে তোমাদেরই। আমাদের গর্ভেই তাদের জন্ম, যাদের মেয়েরা ছড়িয়ে বেড়ায় দুর্নীতির ব্যবসা। ওকি, মুখ লুকোও কেন? লাগছে কোথায়? কোথায় গেল পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, কোথায় গেল জননী জন্মভূমিশ্চ?—মারো চাবুক, মরবে তোমরাই। তোমাদের ঘরে আর লক্ষ্মী নেই, আর নেই অন্নপূর্ণা, আছে কেবল ভালো আর মন্দের একটা কিম্ভূতকিমাকার সংমিশ্রণ! তোমরা বোকা, তোমরা হতভাগ্য! লজ্জা! লজ্জা তোমাদেরই কি কম? যেদিন ফুলের ওপর ভ্রমর হ'য়ে ব'সে মধু খুঁজতে সেদিন ভালো লাগত; আজ কীট হ'য়ে ঢুকেছ পাপ্‌ড়ির গোড়ায়—হাড়মাস খেয়ে জীর্ণ করলে! নিচে নেমেছে কারা গো? —চলো চলো, ঢের হয়েছে, মিথ্যের পেছনে আর ছুটিও না। দিন ফুরালো, এবার পারের কড়ি সঞ্চয় ক'রে নিই। চলো, ওঠো।

লাহিড়ী খুশি হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, নোটিশ ত দিয়েছ আগে যে রাস্তায় নামবে না। তবে যাবে কোথায়?

মণিপ্রভা হাসিমুখে বলিলেন, নিচের বাগানে গিয়া বসা যাক। রাঙাবৌদির দল আজ ফিস্‌ট করতে গিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে লাহিড়ী বলিলেন, দল মানে?

মানে, তাঁর এক পাতানো pet ভাই, ছেলেটি বড় ভালো—দিদি বলতে অজ্ঞান! এমন ভাই আর দেওরের দল আমাদের পাড়ায় বহুৎ—আমরা ওদের দিয়ে বেশ দারোয়ানি করিয়ে নিই। তাছাড়া আর কী করা যায় বলো? বন্ধু বুঝতে পারি, শত্রু বুঝতে পারি, কিন্তু ভক্তকে নিয়ে হয় বড় জ্বালা! ফেলতেও পারিনে, গিল্‌তেও বাধে!

তার বদলে ওরা কী চায়?

মণিপ্রভা হাসিলেন। হাসিটা কিছু দুর্নীতি মিশানো। কহিলেন, একটু যৌন-রঙ মাখানো স্নেহ। ওতেই ওরা খুশি। তবে ওরাই আবার গোল বাধায়। স্নেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি, রেষারেষি—বেচারী! চোখ টিপে দিই আমরা সবাইকে, তখন সবাই গর্বে বুক ঠুকে বেড়ায়।

লাহিড়ী কহিলেন, এমন ভাই তোমার নেই?

তিরিশ বছর বয়েস পর্যন্ত ছিল!

লাহিড়ী হাসিতে হাসিতে নামিয়া বাগানের দিকে গেলেন।

মিনিট পনেরো পরে মণিপ্রভা যখন আসিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা। হেমন্তের সূর্য অস্তে নামিয়াছে, অদূরে পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার রাঙা আভাস ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছিল। বাতাস নাই কিন্তু যেটুকু আছে তাহাতে গাঁদা আর গোলাপের মৃদু গন্ধ জড়ানো। মণিপ্রভা একখানা চেয়ারে বসিলেন।

লাহিড়ী তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, চার্মিং!

মণিপ্রভা উত্তর দিলেন না। রাণুর কথাটা তাঁহার মনে ছিল। মেয়েটি সত্যই দিনে দিনে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। বীরু এবং তাহার সমস্যাটা আজ সত্যই তাঁহাকে দোলা দিতেছে। কোনো কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই,—কিন্তু তাঁহার এই নাস্তিক্যবাদের পরিধির বাহিরে যেন উহারা দাঁড়াইয়া। মনটা কেবলই যেন বলিয়া উঠিতেছিল, উহাদের পথের বাধা দূর হোক্, উহাদের মিলন হোক্, কল্যাণ হোক!

কি ভাবছো?

চট্ করিয়া মণিপ্রভা হাসিলেন। বলিলেন, ভাবছি আপনাকে যেদিন প্রবঞ্চনা করব সেদিন আপনার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে!

আবার 'আপনি'? বেশ। প্রবঞ্চনা করবে তুমি?- লাহিড়ী হাসিয়া বলিলেন, তোমার প্রবঞ্চনা মাথায় নিয়ে চলবো চিরদিন!

মণিপ্রভা কহিলেন, মিষ্টার লাহিড়ী, আমার মনে হয় সুশান্তর প্রতি রাণুর কোনো আকর্ষণ নেই।

লাহিড়ী মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কোথায় আছো তুমি? ভাবের রাজ্য উল্টে গেছে। সেদিন সকাল বেলাতেও ওরা দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছিল এবং সেদিন রাণুর মুখের চেহারা দেখে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। দুপুর-বেলা দুজনে টেলিফোনে গল্প করে।

কেমন ক'রে জানলেন? আপনি ত থাকেন কোর্টে!

লাহিড়ী কহিলেন, মণিপ্রভা, আমার বয়স হয়েছে। বাড়ির চাকরবাকর-গুলো কেবল কি ব'সে-ব'সে মাইনেই খায়। নজর রাখে না কোনোদিকে?

মণিপ্রভা সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। বলিলেন, চাকরকে দিয়ে মেয়ের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করান্?

তুমি কালোর দিক্‌টা দেখো, আলোর দিক্‌টা দেখতে পাও না। রামশরণটা বাংলা বোঝে, ভালো রিপোর্ট যদি পায় তবে আমাকে জানাতে দোষ কি মণিপ্রভা ?

তা বটে। মণিপ্রভা চুপ করিয়া রহিলেন। কেমন একটা অদ্ভুত কৌতুক ও ঘৃণায় তাঁহার প্রাণের মূল পর্যন্ত দোল খাইতে লাগিল। সন্তানের সহিত পিতার চরিত্রের কী গভীর প্রভেদ !

আমি তোমাকে ব'লে রেখে দিলুম মণিপ্রভা—লাহিড়ী বলিতে লাগিলেন, রাণু কখনো তার বাবার এত বড় আশাকে চূর্ণ করবে না; বিচার আর বিবেচনায় তার জুড়ি কে ? আর সুশান্তকে ত তুমি জানো। ভদ্র, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র; অগাধ সম্পত্তি বাপের; নিজের প্র্যাক্‌টিস্ প্রচুর—ও আমার আইডিয়াল্ পাত্র ! কিছুই না হোতো, কেবল সম্পত্তি দেখে দিতুম। তুমি দেখে নিয়ো, সুশান্ত আমার মেয়েকে কেবল টাকা দিয়েই কিনে নিয়ে যাবে। আমি যে বাপ, আমি দেখবো মেয়ের সুখশান্তি !

মণিপ্রভা কহিলেন, আর আপনার মেয়ে যদি ভিখারী ভোলানাথকে পছন্দ করে ?

লাহিড়ী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, মণিপ্রভা, মেয়ে আমার অর্থশাস্ত্রে এম্‌-এ পড়ে ! সে জানে জগতের প্রাণশক্তির মূলাধার হচ্ছে সোনার খনি, ভোলানাথের কাঁথার ঝুলি নয়। মার্গট্ টেনান্টের প্লে-মেট্ ছিল এক মেষ-পালক, দুজনের মধ্যে ভাব ছিল কি কম ? তবে কেন মার্গট্ বিয়ে করলে য়্যাস্‌কুইথকে ? কারণ কি জানো ? প্রেম নয়, মেয়েরা আসলে ভক্ত পোজিশনের। প্রেমটা পড়ে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে !

মণিপ্রভা কহিলেন, আপনার কল্পনাকে ওরা যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ?

এমন সৃষ্টিছাড়া মিথ্যে হবে কেন ? একটা পার্টি দেবো, তারিখ ঠিক করেছি, সুশান্ত সেদিন এনাউন্স্‌ করবে।—লাহিড়ী বিদ্রূপ করিয়া পুনরায় কহিলেন, তোমার বীরুর কান ধরেও সেদিন নিয়ে যেতে পারো। আর কিছু না হোক, একপেট খেয়েও আসতে পারবে।

মণিপ্রভা চুপ করিয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। কোনো কথার উত্তর দিলেন না। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু দেখা যাইলে মনে হইত,

তাঁহার দুইটা চোখ কোনো গভীরতর কারণে দপ দপ করিয়া জলিতেছে। তিনি কি রাণুর চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছেন, তিনি কি ভাবিতেছেন তাঁহার নিজ অতীতের কোনো ইতিহাস? পুরুষের বৈষয়িক আদর্শবাদের কোনো জটিল তত্ত্ব কি তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইতেছে? তিনি কি কোনো ফন্দি আঁটিতেছিলেন? কে জানে!

লাহিড়ী কহিলেন, কিন্তু তার আগে তোমার কাছেও যে একটা কথা নিতে চাই, মণিপ্রভা?

মণিপ্রভা নিজের নিশ্বাস চাপিয়া কহিলেন, কি কথা নিতে চান্? সে কথা এ সময়ে নয় মিষ্টার লাহিড়ী।

আর ত কোনো বাধা নেই—একে একে সবই ত ভেঙে গেছে মণিপ্রভা?

আমার দেহ আর মন এক বস্তু নয়, রোহিণীবাবু।

তবে কি আরো দেরি করবে? ধরো, আগে যদি আমাদেরটা সাব্যস্ত হোতো—মানে, সুবিধের দিক থেকে বল্‌ছি—

মণিপ্রভা বলিলেন, সুবিধের দিক থেকে বলাই ত আপনার অভ্যেস! দাঁড়ান্, আমি নিজে কী চাই আগে ভালো ক'রে ভেবে দেখি।

তাঁহার বক্র পরিহাসের কোনো উত্তর নাই; দুঃখে ও বিরক্তিতে মুখখানা অন্ধকার করিয়া রোহিণী লাহিড়ী নীরবে বসিয়া রহিলেন।

*

* *

হাওড়া ষ্টেশন্। ট্রেনের এঞ্জিনের আওয়াজ, যাত্রীর কোলাহল, ঠেলা গাড়ীর গড়গড়ানি, কুলীর চীৎকার, টিকেট ঘরের জটলা, রেলওয়ে পুলিশের আনাগোনা, ট্যাক্সির হর্ণ, মালগাড়ীর ঠোকা-ঠুকি—সমস্তটা তালগোল পাকাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। আলো জলিতেছে, মানুষ ছুটিতেছে, ডেলি-প্যাসেঞ্জার, পশ্চিমযাত্রী স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, সাধু-ভিখারী, সাহেব-মেম—রাশি রাশি আওয়াজ!

বম্বে মেল্ ছাড়িতে আর দেরি নাই, দ্বিতীয় ঘন্টা পড়িয়া গেছে। প্ল্যাট্‌ফরম

টিকেট দেখাইয়া রাণু ছুটিল। ছুটিতে তাহার বাধা ঘটিল না, আপত্তি হইল না। প্ল্যাটফরমে অনেকেই দ্রুতপদে যায়, সে দৌড়াইল। প্রাণ লইয়া যাহার টানাটানি, তাহার ভয় কোথায়, কোথায় লজ্জা? সে যেন একটা দুরন্ত তরঙ্গ। কোন্ বাধা তাহাকে রোধ করিবে?

কিন্তু ঝড় উঠিয়াছে, করুণ কালো মেঘে দিগ্‌দিগন্ত ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, সূর্যের শেষ রশ্মি অন্ধকারে হারাইয়া গেল, ঈশানের কোণে বিদ্যুৎ-বহ্নিলেখা, আকাশের অরণ্যে অরণ্যে বাঘিনী গর্জন করিয়া ফিরিতেছে!

বীরু—বীরু?

হঠাৎ একখানা কামরার ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাণু বীরুর চুলের মুঠি ধরিল। জানালায় মাথা কাৎ করিয়া অত কোলাহলের মাঝখানেও বীরুর ঘুম আসিয়াছিল।

বীরু মুখ তুলিল। শান্তকণ্ঠে কহিল, কেমন ক'রে এলে?

খুঁজে পেয়েছি!—রাণু হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, বীরু—নামো গাড়ী থেকে। কোথায় যাবে তুমি? নামো।

বীরু নামিয়া আসিল। কহিল, আমাকে যেতে দাও রাণু।

কোথায়?—বলিয়া রাণু তাহার পাঞ্জাবির ঝুলটা মুঠার মধ্যে টিপিয়া ধরিল।

বম্বের দিকে যাবো, কাজ আছে। ছাড়ো রাণু, আমার কোথাও আর জায়গা নেই।—বীরুর গলা কাঁপিয়া উঠিল।

রাণু কহিল, কাঁদবো মনে করেছ তোমার জামা ধ'রে? যেতে তোমাকে দেবো না; যদি যাও নিয়ে চলো আমাকে।

তোমাকে!

হ্যাঁ, আমাকে। সোনার খাঁচার দরজা ভেঙে আমাকে নিয়ে চলো তুমি—তুমি যাবে যেখানে!—রাণু চেঁচাইয়া কহিল, তোমার বাঁশী বাজাও, আমি যাই কূল ছেড়ে অকূলের দিকে। বীরু, তোমাকে যেতে দেবো না। কই, বা'র করো তোমার টিকিট। দাও আমার হাতে।

বীরু তাহার হাতে টিকেটখানা দিল।

রাণু কহিল, কেন যেতে চাও তুমি? ভালো লাগছে না আমাকে? আজ

সব বলো, ফিরবো না আজ ঘরে, পথে পথে ঘুরবো তোমার সঙ্গে, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়বো। বলো বীরু, কেন যাবে?

বীরু কহিল, থাকবো কোথায়? কোথায় আমার আশ্রয়? জানো তুমি রাণু, কলঙ্কময় আমার জন্ম? সব শুনেছি, সব জেনেছি এতদিনে।

কী জেনেছ তুমি?

শুনলে তুমি ঘৃণা করবে! তবু বলবো। যাঁকে মা ব'লে বাল্যকাল থেকে জানি তিনি আমার মা নন্। তবে আমার মা কে? কেমন ছিলেন তিনি? এবার আমি জানতে পেরেছি, তিনি ছিলেন আমার ধনী পিতার রক্ষিতা! চরিত্রহীন বাবা, কলঙ্কবতী মা!

তাহারা ষ্টেশনের বাহিরে আসিল। ওদিকে বম্বে মেল্ ছাড়িয়া গিয়াছে। বীরুর যাওয়া হইল না।

রাণু কহিল, তুমি কি তোমার জন্মের জন্য দায়ী?

ঘৃণা যে আসে রাণু, জীবন যে পঙ্কিল মনে হয়! তোমার কাছে আমার কী পরিচয়? কী ব'লে তুমি জানলে আমাকে?

প্রথম যেদিন তোমাকে পেলুম—রাণু বলিল, কী পরিচয় তুমি দিয়েছিলে? বংশমর্যাদার? উত্তর দাও বীরু! সম্পত্তির মালিক তুমি? তুমি রাজার ছেলে? উত্তর দাও বীরু! আমাদের আকর্ষণের বস্তু কোন্‌টা ছিল? কী দেখে মন ভুলেছিল? কোন্ খেলায় বন্দী করেছিলে? তুমি নির্বোধ, তুমি বিশ্বাসঘাতক!—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বীরু কহিল, তোমাকে অপমান করব আমি আমার কাছে টেনে?

দূরে গেলে যে আরো অপমান! কী নিয়ে দাঁড়াবো সংসারে? তুমি গেলে রইল কী? সূর্যকে বাদ দিলে পৃথিবী যে অকর্মণ্য! তোমাকে যেতে দেবো? যদি যাও তবে মাড়িয়ে যাও আমাকে, তোমার রথের তলায় আমি বুক পেতে দিই!—রাণু কাঁদিল।

বীরু কহিল, যাদের অবহেলা ক'রে এসেছি, তারা করবে ঘৃণা! জানিনে পিতৃপরিচয়, নেই রক্তের শুচিতা। রাণু, সব চেয়ে বড় মার খেলুম বাড়িতে। মা আমার মা নয়!

রাণু তাহার মুখের দিকে তাকাইল

বীরু বলিতে লাগিল, আমার সকল গৌরব ঘুচে গেছে, মিথ্যার প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। মা আমার মা নয়! ওই চোখ, ওই লাবণ্যভরা মুখ, ওই আমার সকল সুখ-দুঃখের আশ্রয়—যার কাছে পেলুম পরমায়ু, যে দিল অমৃত—ওই মা আমার মা নয়! মা নয়, তাই বোধ হয় আমার ওপর এত ক্ষমা, এত দয়া, এত স্নেহ?—বলিতে বলিতে সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। পুনরায় কহিল, অমৃতরূপিণী মা, ললাটে হিমালয়ের মহিমা, জ্যোতির্ময় রূপ! স্বর্গের মতো আনন্দময়, জন্মভূমির মতো পবিত্র! কত অত্যাচার করেছি, কত পীড়ন করেছি—আজ সেই মাকে ছাড়তে হবে! কোনো অধিকার আমার নেই! স্নেহ মিথ্যে! ভালোবাসা মিথ্যে! মিথ্যে আমার জন্ম!

ওরে অকৃতজ্ঞ!—রাণু চীৎকার করিয়া উঠিল, তোমার চোখ নেই, তোমার হৃদয় নেই! যার কাছে এত ঋণ তার বুক ভেঙে দিতে চাও? ওরে বিশ্বাসঘাতক, কে করেছে তোমার প্রাণসঞ্চার, কা'র সেবা নিয়ে মানুষ হয়েছ? বীরু, তুমি অজ্ঞান, তুমি অর্বাচীন! তোমার শিরায় শিরায় স্বার্থপরতা! কা'র বাৎসল্যে তুমি সঞ্জীবিত? কা'র বুকের রক্ত খেয়ে পেলে জীবন? বড় ক'রে দেখতে শিখলে না কিছু? কেবল অধিকার আর স্বার্থের কথা? ছি ছি, কী লজ্জা তোমার! ওপরে নেই ভগবান? বিচার নেই তাঁর দরবারে? যে-লক্ষ্মী জোগালো অন্ন, যার সরোবরে পেলে তৃষ্ণার জল, যার হৃদয়ের মধ্যে শিকড় নামিয়ে টান্‌লে প্রাণের রস, যার বাতাসে নিলে নিশ্বাস, তাকে করবে অস্বীকার? তাকে বলবে না—মা? কী নির্বোধ তুমি? তোমার ভালো হবে না বীরু, আমাকে ছেড়ে চ'লে যাও বরং একদিন সহ্য হয়ে যাবে, কেঁদে কেঁদে একদিন হয়ত শান্ত হবো, কিন্তু মায়ের অভিমানের আগুনে তোমার ইহকাল পরকাল জ্ব'লে পুড়ে যাবে, তুমি দেখে নিয়ো!—সে আবার কাঁদিল।

জন-জটলার ভিতর দিয়া তাহারা পার হইতেছিল। বীরুর একটা হাত রাণু নিজের হাতের ভিতর জড়াইয়া লইয়াছে। কিছুদূরে আসিয়া রাণু একখানা ট্যাক্‌সি ডাকিল, দুইজনে তাহার ভিতরে উঠিয়া বসিল। মোটর ছুটিল।

বীরু কহিল, আমাকে ক্ষমা করো রাণু।

রাণু হাসিয়া বীরুর ঘন চুলের গোছার ভিতরে হাত বুলাইল, কহিল, তখন বড্ড জোরে চুল টেনে ধরেছিলুম, খুব লেগেছিল? ওমা, তোমার জামাটাও ছিঁড়ে দিয়েছি, এই ছাখো।

বীরু কহিল, টিকিটখানা নষ্ট হোলো কিন্তু!

এখনো হয় নি। বলিয়া টিকিটখানা আঁচলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া রাণু পথে ফেলিয়া দিল। কহিল, যাক্, ওর সঙ্গে তোমার পাগলামি দূর হোক। উঃ, আর পাঁচ মিনিট আসতে দেরি হলেই··· আমি কিন্তু ঠিক মরতুম রেলের লোহায় মাথা ঠুকে।

বীরু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পাঞ্জাবি জামার উপর হাত বুলাইয়া রাণু পুনরায় কহিল, এই তুমি, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার; যেন কতদূর গিয়েছিলে, নিরুদ্দেশ থেকে তুলে আনলুম। আঃ, আমি যে মেয়েমানুষ, আমরাই যে ছুটি তোমাদের পায়ের চিহ্ন ধ'রে। কী সুন্দর তুমি! বীরু, তোমাকে জয় ক'রে এনেছি, এনেছি ডাকাতি ক'রে। খুব গাল্ দিয়েছি তখন তোমাকে, না? তুমি অনেক বড় ব'লেই ত তোমাকে মন্দ কথা বলতে বাধে না বীরু!

ষ্ট্র্যাণ্ড্ রোড দিয়া ডালহাউসী, তারপর কার্জন পার্ক হইয়া চৌরঙ্গী। মোটরের ভিতরে বসিয়া বীরু কহিল, আজ অনেকক্ষণ থাকবো তোমার কাছে।

না।—রাণু বলিল, আগে তোমাকে পৌছে দেবো মায়ের কাছে। ছি ছি, খালি হাতে পালাচ্ছিলে দেশ ছেড়ে! দুর্দান্ত তুমি। চলো, তোমার মাকে সব বলিগে।

তুমি যাবে মা'র কাছে? না না, ধরো যদি—

চুপ, কথা ব'লো না। শুধু কি তোমার দুটি পায়েই আশ্রয় নিয়েছি, আর কিছু না? মনে করেছ আমি সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়ে, কেবল কাঁদবো, আর পায়ে এলিয়ে পড়বো তোমার? দুই হাত দিয়ে বেঁধেছি তোমার দুই পা, আমার ব্যবস্থা মানতে হবে, আমার শিক্ষায় চলতে হবে। বিয়ে করবো তোমাকে সব অবরোধ ভেঙে, সেই আমার পণ! তোমাকে ভিক্ষে ক'রে যদি না পাই তবে লুঠ ক'রে নিয়ে পালাবো!

বীরু কথা বলিল না, কেবল তাহার কাঁধের উপর মাথা হেলাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

ল্যান্সডাউন রোডের ধারে আসিয়া মোটর দাঁড়াইল। দুইজনে দুই দরজা দিয়া নামিয়া পড়িল। রাণু তাহার জামার ভিতর হইতে মণিব্যাগ বাহির করিল, দশটাকার নোট লইয়া ড্রাইভারের হাতে ভাড়া দিয়া গেটের ভিতরে ঢুকিল। পিছন দিকে আর তাকাইল না।

বীরু ইতস্ততঃ করিতেছিল, রাণু তাহাকে চোখের দৃষ্টিতে শাসন করিয়া তাহার হাত ধরিল, তারপর দুইজনে মিলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় নয়টা বাজে।

মাথার কাছে আলো জ্বালিয়া পদ্মাবতী একখানা বই লইয়া পড়িতেছিলেন। দুইজনকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি চোখের চশমা নামাইয়া উঠিয়া বসিলেন। বীরু মাথার উপর আলোটা জ্বালিয়া দিল। মায়ের সহিত তাহার সেই সহজ আলাপ-আলোচনা বন্ধ হইয়া গেছে।

রাণু সোজা আসিয়া তাঁহার পায়ের নিকট বসিয়া পায়ের উপর হাত রাখিল। পদ্মাবতী কহিলেন, কে মা তুমি?—বলিয়া তিনি বীরুর মুখের দিকে তাকাইলেন। বীরু মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

রাণু কহিল, আমার নাম রাণু, মা।

তুমিই রাণু?—বলিয়া পদ্মাবতী হাসিলেন। পুনরায় বলিলেন, আমি তোমাকে চিনি যে মা!

রাণু তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। বলিল, আমার কোনো পরিচয় নেই মা, আমি কেবল আপনার মেয়ে।

পদ্মাবতী কহিলেন, পরিচয় আছে বৈকি। সেদিন দেখি, বীরুর টেবিলে একখানা বইয়ের পাতা হাওয়ায় উড়ছে, বইখানা বোধ হয় ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস—বইখানা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলুম, তার মধ্যে তোমারই একখানা ছবি—ওকি বীরু, স'রে যাস কেন?

বীরু গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। রাণু সলজ্জ নতমস্তকে কহিল, মা, আপনার ছেলের কোনো জ্ঞান হয় নি। কোথায় যেন চ'লে যাচ্ছিল, আমি খবর পেয়ে ধ'রে আনলুম হাওড়া ষ্টেশন থেকে!

ওমা, সে কি? কোথায় যাচ্ছিলে বীরু?

বীরু কহিল, বম্বে।

বা রে ছেলে, এত দেশ বেড়িয়েও আশা মেটে না? যাবি ত আমাকেও নিয়ে চল্?—তারপর রাণুর দিকে ফিরিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন,—কদিন থেকেই ওর মনটা ছোঁক ছোঁক করছিল; পড়ায় মন নেই, কথা বলে না আমার সঙ্গে—সকলের চেয়ে আশ্চর্য যে, আমার সঙ্গে আর ঝগড়া করে না। একদিন বললে কি জানো মা?

রাণু ও পদ্মাবতী দুইজনেই হাসিতে লাগিলেন।

বীরু এইবার কাছে আসিল। মায়ের মাথার কাছে পিছন দিকে দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি বুঝি আমার টেব্‌ল্ হাতড়ে সব ছাখো?

পদ্মাবতী কহিলেন, শোনো কথা মা!

তুমি নিশ্চয় রাণুর চিঠিগুলোও দেখেছ?

পদ্মাবতী হাসিলেন। বলিলেন, এমন অজ্ঞান আমি দেখি নি।

রাণু লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। বীরু কেবল অজ্ঞান নয়, প্রকাণ্ড বোকা! আড়ালে পাইলে বীরুকে সে কীল মারিয়া ঢিট্ করিবে। নিজের কথায় নিজেকে নির্বোধের মত ধরাইয়া দিতেছে। রাণুর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। কিন্তু পদ্মাবতীকে দেখিয়া আজ যেন অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে। সংসারে আসিয়া মা কেমন বস্তু তাহা সে জানে নাই; আজ পদ্মাবতীকে দেখিয়া তাহার সেই নিদ্রিত মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় যেন হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

বীরু কহিল, আমাকে এই প্রেজেণ্ট্‌গুলো কে দিয়েছে তুমি মনে করো? তুমি বোধ হয় ভাবছ—

না বাবা, আমি কিছুই ভাবি নি।—বলিয়া পদ্মাবতী আবার হাসিতে লাগিলেন।

বীরু একবার দুইজনের দিকে তাকাইল, তারপর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইবার সময় কহিল, কেবল আমাকে সন্দেহ করবে!

রাণু কহিল, আপনাকে গত বছরে নৈনীতালে দেখেছিলুম মা, কিন্তু কথা বলতে সাহস করি নি। আমাকে ক্ষমা করুন।

পদ্মাবতী কহিলেন, কিন্তু আমি যে জানি মা, তখন থেকে বীরুর সঙ্গে তোমার আলাপ!

জানতেন আপনি ?

পদ্মাবতী তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, আমি যে মা, তোমরা যে ছেলেমেয়ে! আমি সব দেখতে পাই।

রাণু তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, প্রেজেন্ট্‌গুলো আমি বীরুকে দিয়েছি মা।

পদ্মাবতী হাসিয়া কহিলেন, আমি জানি!

জানেন আপনি ?

হ্যাঁ মা। বীরুর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে কিছু ? তোমার চিঠি, তোমার প্রেজেন্ট্‌, তোমার ছবি—সবগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে নিজেই সে বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে। সেগুলো যে আবার লুকিয়ে রাখা দরকার এ দায়িত্ব ওর নেই, ওর ঘুমটাই বড়। আমার চোখে পড়ে কি সাধে ? আমিই আবার সেগুলোকে গুছিয়ে রাখি। ছেলে নিয়ে আমার বড় জ্বালা মা!—বলিয়া পদ্মাবতী হাসিলেন।

রাণু স্তম্ভিত লজ্জায় পাথরের মতো বসিয়া রহিল।

তোমাদের বাড়ি কোথায় রাণু ?

রাণু কহিল, পার্ক সার্কাসে। বাবা আছেন, মা মারা গেছেন। তখন আমার বয়স মাত্র এগারো দিন।

তুমি কি পড়ো ?

এম-এ পড়ি ইকনমিক্‌সে।

পদ্মাবতী কহিলেন, বীরুরও এম-এ পাশ করবার কথা, কিন্তু দুরন্ত ছেলে কিনা, পড়ায় মন বসাতে পারেনি। তবে ও বাইরের বই পড়ে খুব। রাণু, তোমার চেহারাটি ফটোর সঙ্গে মেলে না, তার চেয়ে তুমি অনেক সুন্দর।

আমি ত আপনারই মেয়ে। বলিয়া হাসিয়া পদ্মাবতীর আঁচল লইয়া সে নিজের মুখ ঢাকিল।

পদ্মাবতী হাসিমুখে কেবল বলিলেন, পোড়া চেহারা বুড়ো হয়েও লজ্জা দিচ্ছে!

খানিকক্ষণ পরে রাণু কহিল, আপনার কাছে কেন এসেছি বলুন ত মা ? কেন এসেছি এত রাতে ?

পদ্মাবতী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, কই, তা ত জানিনে মা!

রাণু কহিল, প্রাণের দায়ে এসেছি, আপনি মা হয়ে বুঝতে পারবেন। আপনর পায়ে আশ্রয় চাই। আমাকে পায়ে ঠেলবেন না।

পদ্মাবতীর মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল। বলিলেন, আমি যা ভাবছি সে কি তবে সত্যি রাণু?

রাণু তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, সেই সত্যি মা সেই সত্যি। আমার আর কেউ নেই।

বাহিরে হেমন্তরাত্রির দিকে মুখ ফিরাইয়া পদ্মাবতী নীরবে অনেকক্ষণ বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। চুলের রাশি চারিদিকে ছড়াইয়া রাণু তাঁহার কোলের ভিতরে পড়িয়া রহিল—কথা না লইয়া সে আর মুখ তুলিবে না। এক সময় পদ্মাবতী তাহার মাথার উপর হাত বুলাইয়া কহিলেন, বীরুর সব ভার তুমি নিতে পারবে রাণু?

রাণু কহিল, আপনি আশীর্বাদ করুন। তার ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সকল ভার আমি মাথায় বয়ে বেড়াবো. নইলে আমার জন্ম মিথ্যে, ভালোবাসা মিথ্যে।

পদ্মাবতী কহিলেন, কিন্তু এর মধ্যে যে বীরুর জন্ম-পরিচয়ের একটা কথা থেকে যায় রাণু!

রাণু কহিল, সে কথা আমি জানি মা।

জানো তুমি!—পদ্মাবতী বিস্মিত হইলেন।

সব জানি, বীরুও সব জেনেছে। কিন্তু সেকথা আপনাকে কোনোদিন প্রকাশ করতে দেবো না মা।

ওঃ তাইজন্যেই বোধ হয় এ-কদিন—বলিয়া পদ্মাবতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

রাণু উঠিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। কহিল, যে অসীম স্বার্থ-ত্যাগ আপনি জীবনে করেছেন, সেই আমাদের দু-জনের সকলের বড় গৌরব। তার চেয়েও বড় গৌরব বীরুর, সে আপনাকে মা ব'লে জেনেছে!

পদ্মাবতী নিজের গলার হার খুলিয়া রাণুর গলায় পরাইয়া দিলেন। দুই হাতে রাণুর মুখ ধরিয়া চুম্বন করিলেন। তারপর বলিলেন, যাও, বীরুকে ডেকে নিয়ে এসো ও-ঘর থেকে, আজ দুজনে তোমরা এক সঙ্গে ব'সে খাবে।

রাণু হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল।

পদ্মাবতীর চোখের কোলে দেখিতে দেখিতে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা জমিয়া উঠিল। এ অশ্রু ছিল যেন কোন্ বিস্মৃতিলোকে। হয়ত এ অশ্রু বর্তমান উচ্ছ্বসিত আনন্দের, কিংবা দূর অতীতকালের কোনো নিগূঢ় বেদনার—কিন্তু তাহা কে বলিতে পারে?

এ ঘরে আসিয়া রাণু দেখিল, বীরু পিছন ফিরিয়া চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। রাণু আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, ওহে শ্রীমান্, আজ থেকে আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী!

বীরু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, ওই কথা বলেই ত মেয়েরা ঘরে সিঁধ কাটে! মা কী বল্লে?

রাণু তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, চুপি চুপি বলিল, বললেন, মুখ পুড়লো তোমার মুখপোড়াকে স্বামী ক'রে।

বীরু তাহাকে দুই হাত দিয়া হুস করিয়া তুলিয়া ধরিল, বলিল, 'প্রিয়ারে আমার পেয়েছি এবার ভরেছে কোল, দে দোল দোল্, দে দোল দোল্!'

পাঁচ

পার্ক্ সার্কাসের বাড়িতে আজ সকাল হইতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। উৎসব-সজ্জার আয়োজন। গেট্-এ বড় একটা আলো টাঙানো। মালী টেনিস্-লন্ পরিষ্কার করিয়াছে, আয়াপানির বেড়া ছাঁটিয়াছে। ফুল গাছ হইতে কেহ একটিও ফুল তোলে নাই—গোলাপ, কুন্দকলি, জবা, এ-ছাড়াও নানা বিলেতী ফুল থরে থরে ফুটিয়া রহিয়াছে। মালী বাগানে জল দিতেছিল।

পশ্চিম দিকের দরজায় আমপাতা ও শোলার অলঙ্কার টাঙানো। হঠাৎ হিন্দুয়ানীটাও পথ ভুলিয়া এ বাড়িতে দেখা দিয়াছে- দরজার দুইধারে সিন্দুর মাখানো দুইটা মঙ্গলঘট। তাহাতে 'মাঙ্গলিকী'র আগ্রহ প্রকাশ না পাক—বিলাসটাই বড়।

সাজসজ্জার ঢঙ্টা পুরাপুরি দেশী নয়। ভিতরে উঠিবার পথ হইতে পার্শিয়ান কার্পেট সোজা সিঁড়ি দিয়া উপরতলায় বড় হল্ পর্যন্ত গিয়াছে,

অতিথি অভ্যাগতগণ তাহার উপর দিয়া আসিবেন। স্মিথ ও ল্যাজারসের ওখান হইতে ভাড়া করিয়া গৃহসজ্জা আসিয়াছে; দীর্ঘ অথচ কৃশকায় টেব্‌ল্‌, ডিনার-চেয়ার, কাঁচের বাসন, ফুলদানি, তোয়ালে, টেব্‌ল্‌-ক্লথ, দালানের দুই দিকে ঝুলাইবার জন্য কতকগুলি বিদেশী নারী ও কুকুরের চিত্র, আর্টপেন্টিং, ছোট ছোট ব্রোন্‌জ্‌ ও পাথরের মূর্তি, পিতলের ফ্লাওয়ার টাব্‌,—কি নয়? আজিকার উৎসবের আড়ম্বরটা কিছু বেশি। বাড়ির চাকর, দারোয়ান, কুক্‌ সবাই পরিশ্রম করিতেছে, তাহার উপর আবার ইম্পিরীয়ল্‌ রেস্তঁরার 'বয়'-গুলিকেও পাওয়া যাইবে।

সকালবেলা লাহিড়ী সুশান্তকেও টেলিফোন করিয়া আনাইয়াছেন। সুশান্ত সকলের কাজের তদ্বির করিতেছিল। সে এখন আর বাহিরের লোক নয়, লাহিড়ী তাহার পরামর্শ লইয়া এখন সমস্ত কাজ করেন। সুশান্তর মুখে হাসি মাখানো।

আচ্ছা সুশান্ত?

আজ্ঞে?

তোমার কি মনে হয় বিবাহের মধ্যে খুব একটা মাদকতা আছে?

আছে বৈকি,—সুশান্ত বলিল, বেশ কিছু শিক্ষাও আছে।

লাহিড়ী কহিলেন, শিক্ষাটা কি রকম?

সুশান্ত কহিল, শিক্ষাটা এই যে এটা নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। এর মধ্যে সত্যিকার নীতি আছে, শ্রী আছে।

লাহিড়ী একটা ড্রেসিং গাউন পরিয়া দোতালার দালানে পায়চারি করিতেছিলেন, একবার থামিয়া সুশান্তর দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। বলিলেন, তোমার কথাটা বুঝতে পারলুম না সুশান্ত।

সুশান্ত কহিল, আমি বলতে চাই, এই আয়োজনের পিছনে যে বস্তু রয়েছে সেটা অন্তরের। হৃদয়ের চেহারাই বড়। পরস্পরকে গ্রহণ করার মধ্যে থাকবে গভীর আন্তরিকতা। উৎসবটা সামান্য।

নীতি বলছ কোন্‌টাকে?

সত্যের ওপরে যার ভিত্তি। যেখানে ফাঁকি নেই।

লাহিড়ী খুশি হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমিও সেই কথা বলতে চাই।

রাণুর মধ্যে আছে সেই তেজ, সেই শক্তি, সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমার মেয়ে ছুটে আসছে, তাকে সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, শক্তি আহরণ করেছে সে। যাকে সে গ্রহণ করবে তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় নি, দৈবক্রমে হাতে এসেও পড়ে নি,—তার জন্য রাণুকে সাধনা করতে হয়েছে, পরিশ্রম করতে হয়েছে। তুমিও তাই সুশান্ত, তোমাকেও এসে দাঁড়াতে হয়েছে বাধা-বিপত্তি ঠেলে। তোমাদের এই মিলন সার্থক হোক।

সুশান্ত লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল।

লাহিড়ী বলিতে লাগিলেন, আমার জীবনে অনেক স্খলন-পতন জমা আছে, নিজেকে নিয়ে অনেক খেলাই খেলেছি, কিন্তু আজ আমি নিজের শিক্ষা-দীক্ষার অর্থ খুঁজে পেলুম। তোমাদের দুজনের হাত মিলিয়ে দেবো, কারণ তোমরা পরস্পরের যোগ্য। শিক্ষায় আর সংস্কৃতিতে তোমরা দুজনেই সমান, পরিচয়ে বংশমর্যাদায় আভিজাত্যে তোমরা কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়, রূপে-গুণে স্বাস্থ্যে-শ্রীতে তোমরা যুব-সমাজের আদর্শ,—সেইজন্য আমার সকলের বড় আনন্দ, যে আমার সকল চেষ্টা সার্থক হয়েছে। নিজের পিতৃত্ব নিয়ে আমি আনন্দ করব, কন্যার প্রতি পিতার যে কল্যাণ-বোধ—তার মধ্যে আমার কোথাও ত্রুটি নেই। কিন্তু একটা কথা তোমাকে এই শুভদিনে জিজ্ঞাসা করব সুশান্ত!

সুশান্ত কহিল, বলুন!

তুমি কি রাণুকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পেরেছ?

কেন পারব না মিষ্টার লাহিড়ী?

লাহিড়ী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, বলবার দোষে আমাকে যেন ভুল বুঝো না, তোমাদের দুজনের গভীর সম্পর্ক আমি বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছি, সেখানে আমার ভুল হয় নি! আমি কেবল জানতে চাই, আমি ত তোমাদের ওপর কোনো জোর-জবরদস্তি করছিনে? সুশান্ত, আমার কাজ তোমাদের দুজনকে সাহায্য করা, কর্তৃত্ব করা নয়।

সুশান্ত মুখ তুলিয়া কহিল, আপনার পয়েণ্ট্ ধরতে পারছিনে।

লাহিড়ী হাসিয়া কহিলেন, এইজন্যেই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে সুশান্ত। তুমি সরল, তুমি ভদ্র। হ্যাঁ জানি, তুমি বলতে চাও না! কেমন

ক'রে বলবে—এ যে সমস্ত কথার অতীত, সমস্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের বাইরে। কেমন ক'রে তুমি তার পরিচয় দেবে? এর নামই ত ভালোবাসা! এই নিয়েই কাব্য, এই নিয়েই সাহিত্য। শাস্ত্র বলো, ধর্ম বলো, শিক্ষা বলো,—সকলের বড়ো তোমাদের মিলন-প্রয়াসী হৃদয়ের এই ঐশ্বর্য। আমি সামান্য মানুষ, তাই মনে জাগে নানা প্রশ্ন: আমি পিতা, তাই মনে জাগে ঔৎসুক্য আর উদ্বেগ। আমি আশীর্বাদ করি তোমাদের ভালো হোক, তোমাদের জয় হোক।

সুশান্ত মহা উৎসাহে হল সাজাইতে লাগিল।

লাহিড়ী পায়চারি করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন, তবু আজ এই এন্‌গেজমেন্টের দিনেও তোমাকে একবার তিরস্কার করব সুশান্ত। যে অধিকার তুমি পেয়েছ সেই অধিকার শক্তির সঙ্গে বুঝে নিতে পারছ না। তোমার সৌজন্যের ভিতর দিয়ে দুর্বলতা প্রকাশ করবে কেন? তুমি জানো, অনেকেই তোমার নিঃশব্দ প্রশ্রয়ের পথ দিয়ে এসে যথেচ্ছাচার ক'রে চলেছে—তুমি তোমার পৌরুষকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাও, সেইটেই হবে তোমার পরম গৌরব।

সুশান্ত বলিল, কা'র কথা বলছেন?

কা'র কথা? ধরো বলছি সেই ছোক্‌রার কথা, সেই কি যেন তার নাম, ভুলে যাচ্ছি—

বীরুর কথা বলছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ছোক্‌রা—আমিও তাকে স্নেহ করি, আমার বিবেচনার পথ তার জন্যও খোলা, কিন্তু তাই ব'লে তার অন্যায়কে মেনে নেবো কেন? কেন অন্ধ হবে আমার স্নেহ? পথের মানুষ ঘরে এসে যদি বসে তাকে সহ্য করতে পারি কিন্তু তাই ব'লে অজ্ঞাতকুলশীল যে, তাকে অন্দরমহলে স্থান দেবো কেন? এর নাম অজ্ঞান, এরই নাম দূরদর্শিতার অভাব। আজ তোমাকেই শক্ত হ'তে হবে, তোমাকেই দেখিয়ে দিতে হবে সেই ছোক্‌রার গতিবিধির সীমা, তুমিই শাসন ক'রে দেবে তোমার ভাবী পত্নীকে। সুশান্ত, জীবনে নীতি মেনে চলতেই হয়, কোনো একটা নীতি,—নইলে শান্তি নেই, আদর্শ নেই, পথ নেই।

আমি কী বীরুকে ডেকে ধমক দেবো, আপনি বলেন?—সুশান্ত সোজা লাহিড়ীর দিকে চোখ মেলিয়া প্রশ্ন করিল।

অবশ্য! তাই ত বলি। শুধু ধমক নয়, শাসন ক'রে দেবে। আজ হয়ত সে ছোক্‌রা আসবে,—আসতে অবশ্য তাকে অনুরোধ আমি করি নি, তবু সে আসবে, কারণ সে অর্বাচীন, নির্বোধ।—হঠাৎ হাসিয়া রোহিণীবাবু বলিলেন, গরীবের ছেলে, হয়ত এক প্লেট্ আহারের লোভও সে সামলাতে পারবে না, কারণ সকলের আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞান সমান নয়! যদি আসে তুমিই তাকে ডেকে ধমকে দেবে, আমার সম্পূর্ণ সম্মতি রইলো। ওই যে, রাণু এলো এতক্ষণে—

কন্যার আসিবার অপেক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় দালানের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিন্তু দশ মিনিট হইয়া গেলেও রাণু আসিল না। আজ সকাল হইতেই কি যেন কারণে লাহিড়ীর মনটা জ্বালা করিতেছে; যেন তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি এক অজানা গভীর আশঙ্কায় টলমল করিতেছিল।

রামশরণ আসিয়া খবর দিল, টেলিফোনে ডাকৃছে।

লাহিড়ী গিয়া ফোন্ ধরিলেন। বলিলেন, হ্যালো? ওঃ তুমি? গ্লোরিয়াস্!—তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, কাল যে আনন্দ তুমি দিয়েছ, সমস্ত রাত আমি সুখস্বপ্নের মধ্যে ছিলুম। না না, কবিত্ব নয়, সত্যি কথা।

তারের ভিতর দিয়া মণিপ্রভার সুন্দর কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল, আজকের আয়োজন কতদূর?

চলছে বৈকি, এসে একবার দেখে যেতে পারতে। কি বলেছিলুম তোমাকে? হ্যাঁ, অসাধ্য সাধন করতে পারি! সকাল থেকেই উৎসব। সুশান্ত এসেছে; সাজসজ্জা চলছে; কী বলছ? হ্যাঁ, বিরাট আয়োজন। বিয়ের দিনে আরো ঘটা করব, আমার একটি মাত্র মেয়ে! এই যে, রাণু এলো এইমাত্র। জানিনে সকাল বেলা উঠে কোথায় গিয়েছিল! সে কি, কী বলছ?—বলিতে বলিতে রোহিণীবাবুর মুখ কঠিন ও কর্কশ হইয়া উঠিল।

হ্যালো!

হ্যাঁ, কী বলছ? না, এমন যদি হয়, আমাকে উপযুক্ত ব্যবহার করতে

হবে। না না, ক্ষমা করতে আমি পারব না। অটোক্র্যাট্? তা হ'তে পারি; তবু চিরকাল যে-সত্যের অনুসরণ ক'রে এসেছি, আজো তাকেই মেনে চলবো। কী বল্‌ছ?—একে তুমি স্বেচ্ছাচার বলো? কোন্ পাত্র ভালো এর চেয়ে? ধনে, বিদ্যায়, পরিচয়ে—তুমি এখনো বুঝতে পারো নি।—লাহিড়ী চুপি চুপি বলিলেন, কাল দুপুরে সুশান্ত কোর্ট্ থেকে ফিরে এখানে এসেছিল—হ্যাঁ গো, চার-পাঁচ ঘণ্টা একা ছিল দুজনে! হ্যাঁ, দেখেছি দুজনকে! কি জানি, তবু ভূত ছাড়ে নি। কে গিয়েছিল? ভাই নাকি! তুমি কিন্তু ছোঁড়াটাকে একটু প্রশ্রয় দিচ্ছ মণিপ্রভা। বলেছে আজ আসবে? না না, কোনোরূপ দুর্ব্যবহার আমি করব না, তুমি যখন বল্‌ছ। বাই দি বাই,—যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আসে, নইলে ঢুকতে দেবো না বলছি।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

বলিতে বলিতে লাহিড়ী হাসিয়া উঠিলেন।

হ্যালো! তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে এই সকালেই! কী প'রে আছ? চা খাওয়া হয়েছে? হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যাঁ!—লাহিড়ী হাসিমুখে বলিলেন, সত্যি দেখতে সাধ যাচ্ছে। কালকের কাজল আজো আছে চোখে? বিশ্বাস করো, সত্যি, কবে আসবে আমাদের দেশে টেলিভিশন্! যখন খুশি দেখ্‌ব। না না, আর একটু থাকো। কে আছে এখন তোমার ওখানে? কে, ব্যানার্জি?—লাহিড়ী আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, মণিপ্রভা, শেষ বয়সে আর ঈর্ষার উদ্রেক করো না। না গো না, প্রতিদ্বন্দ্বী আমার কেউ নেই। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি পাগল! কখন আসছ? ঠিক সাতটা, কেমন? হ্যাঁ, খুব সিলেক্‌টেড্ গ্যাদারিং! ওই ধরো আমার ব্যারিষ্টার বন্ধুরা, গুপ্ত সাহেব, মণিপুরের কুমার, অনারেব্‌ল চাটার্জি, তোমার দাদা সুরঞ্জন, আমাদের দেবেন চৌধুরী, তারপর ধরো এদিকে ও-বাড়ীর রায় সাহেব, জষ্টিস সিন্‌হা, তারপর মেয়েরা,—জন পঁচিশ! কে? হাঁ, সবাই সস্ত্রীক আসবে! তুমি একটু আগে এসো লক্ষীটি—হ্যাঁ, ঠিক সাতটা! আচ্ছা, চিয়ারো!

লাহিড়ী টেলিফোন ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখখানা আবার কঠিন হইয়া উঠিল। যে সংবাদ তিনি মণিপ্রভার মারফৎ পাইলেন, তাহাতে আর তাঁহার ধৈর্য বাধা মানিতেছে না। পিতা হওয়া কি

তাঁহার অপরাধ? সন্তান কি এমনি করিয়াই যথেচ্ছাচার করিয়া চলিবে? একথা কে না জানে যে, স্ত্রীলোকের প্রশ্রয় না পাইলে পুরুষ কখনো অসংযত হয় না? কেবল কি বীরুরই দোষ? কেবল কি পুরুষেরই অপরাধ? সুশান্ত বলিবে কি? তিনি পিতা, কন্যা কি তাঁহার কপালে নিয়তই এমনি করিয়া কলঙ্ক মাখাইয়া চলিবে? সুশান্তর সৌজন্যের সুযোগ লইয়া কি এমনি করিয়াই গোপন দুরভিসন্ধি চলিতে থাকিবে?

কিন্তু তিনি আইনজ্ঞ। ধৈর্য রক্ষা তাঁহাকে করিতেই হইবে। বিবাহের প্রতিশ্রুতিটা প্রচার করিবার আগে পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধরিয়া থাকিবেন। তাঁহার সম্মান আছে, সুনাম আছে। সাতদিনের বেশি সময় তিনি দিবেন না; তাঁহার টাকা যোগাড় আছে, জুয়েলারির দোকানে তিনি অর্ডার পাঠাইয়াছেন। দান-সামগ্রী প্রস্তুত। কাপড়-চোপড় কিনিতে একদিনের বেশি সময় লাগিবে না। সুশান্ত তাহার বাড়িতে ব্যবস্থা করিবে বলিয়াছে, তাহার আত্মীয়-পরিজনগণ শীঘ্রই বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবেন! সুশান্তর বাবা খবর পাইয়াছেন। এদিকে রাণুর মামারবাড়ি খবর গিয়াছে, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও যথাসময়ে উপস্থিত হইবে। যদিচ, একটা কথা, নিজের পরিবারে রোহিণীবাবু বিশেষ জনপ্রিয় নন্। অবশ্য এটা তাঁহার দুর্ভাগ্য—কিন্তু তিনি কাহারও পরোয়া করেন না।

সুশান্ত আসিয়া কহিল, এবার আমি যাই, এদিকের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

সে কি! লাহিড়ী কহিলেন, রাণুর সঙ্গে দেখা না করেই—

সুশান্ত কহিল, থাক্ এখন, ওবেলা দেখা ত হবেই।

লাহিড়ীর মুখখানা দেখিতে দেখিতে অপমানে কালো হইয়া উঠিল, এবং সুশান্ত সেই মুহূর্তে কটাক্ষে তাঁহার দিকে তাকাইল, দুই ঠোঁটের মধ্যে হাসি লুকাইল, তারপর মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল। লাহিড়ী আর তাহাকে ডাকিলেন না।

রাগে তিনি গস গস করিতেছিলেন; দালান পার হইয়া রাণুর ঘরের দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্ক্রীনের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, এদিকে পিছন ফিরিয়া টেব্‌লে বসিয়া সে কি যেন লিখিতেছে।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তিনি কহিলেন, এটা কি ভালো হোলো মা ?

রাণু মুখ ফিরাইল, কহিল, কোন্‌টা বাবা ?

এই যে তুমি দেখা করলে না, সুশান্ত চ'লে গেল ? এটা তোমার মনে থাকে না রাণু যে, তার অপমান সহ্য করার কথা নয় !

রাণু কলমটা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। লাহিড়ী বলিলেন, তোমার রাজকার্য, দেখা দিলে কী ক্ষতি হোতো ?

রাণু কহিল, আমার ক্ষতির কথা কি আপনি বুঝতে চান্‌ বাবা ? আপনি কি একথা বুঝতে চান্‌ যে, আমি মানুষের হাতের খেয়ালের খেল্‌না নই ? আপনি কি একথা বুঝতে চান্‌ যে, আমার নিজস্ব একটা মতামত আছে ?

লাহিড়ী একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, নিজস্ব মতামত ! তোমার নিজস্ব মতামতটা কতদূর গড়িয়ে এসেছে তুমি কি সে কথা এখনো বুঝতে পারো নি ?

বুঝতে পারছিনে আপনার কথাটা !

কেমন ক'রে বুঝবে ? বিবেচনার পথটা তুমি বন্ধ ক'রে দিয়েছ যে ?

রাণু কহিল, আপনি দেন নি ? আপনার নিজের জীবনধারার মধ্যে কতখানি সদ্বিবেচনার পরিচয় আছে ?

লাহিড়ী কহিলেন, কোন্‌ দিকে তুমি ইঙ্গিত করছ ? রাণু, মনে রেখো তোমার অধিকার কতটুকু !

রাণু কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

লাহিড়ী বলিলেন, সকালবেলা উঠেই তুমি গেলে বেরিয়ে। কোথায় গেলে তুমিই জানো। আমি ফোন্‌ ক'রে আনালুম সুশান্তকে, বেচারা এসে এতক্ষণ পরিশ্রম ক'রে গেল ! তাকে সাহায্য করা কি তোমার কাজ নয় ?

রাণু কহিল, না, আমার কাজ নয় !

তার একার কাজ তবে ?

তার একারই কাজ। আমি সাহায্য করতে যাবো কিসের জন্য বাবা ? কেন আমার এমন বিড়ম্বনা ?

মুখ বিকৃত করিয়া লাহিড়ী বলিলেন, বিড়ম্বনাটা তবে কি সুশান্তরই ?

তুমি জানো পদে পদে আমি অপদস্থ হই তোমার জন্যে? তুমি জানো কপাল আমার কলঙ্কে কালো হয়ে উঠেছে?

রাণু কহিল, সেও বোধ হয় আমার জন্যে?

হ্যাঁ, তোমারই জন্যে। লজ্জা রাখবার আর আমার ঠাঁই নেই। তোমার যথেচ্ছ আচার, যথেচ্ছ আনাগোনা, যথেচ্ছ চালচলন। উচ্ছৃঙ্খলতাকে স্বাধীনতা বলে না রাণু!

সে আমি জানি বাবা।

তুমি জানো, তোমার বর্ত্তমান রীতিপদ্ধতি সুশান্তর প্রিয় নয়?

আমার সবই তাঁর প্রিয় হবে একথা আপনি ভাবেন কেন?

লাহিড়ী বলিলেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এখন থেকে তার মত, তার রুচি, তার আদর্শই তোমাকে মেনে চলতে হবে! আজ সকালে তুমি কোথায় গিয়েছিলে সে কথা আমি জানতে পারি নি বটে কিন্তু সুশান্ত আন্দাজ করেছে ব'লে আমার বিশ্বাস। তুমি জানো, পুরুষের মন কোথায় আঘাত পায়?

রাণু বলিল, থাক, আঘাতের কথা বলবেন না। মেয়েমানুষেরও একটা মন আছে, একটা সত্তা আছে। আঘাত কি কেবল তারাই পায়, আমরা কি পাথরে গড়া? আপনি প্রতিদিন ধ'রে আমার মনে যে বিষম আঘাত ক'রে চলেছেন তার কি কোনো ইতিহাস নেই?

আমি যা করছি এ কি তোমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য নয়?

অনেক কথা আপনি জানতে চান্। আপনার মেয়ে আমি, নিজের স্বার্থ আমি ভালোই বুঝতে পারি। কল্যাণের আদর্শ কি আপনার সঙ্গে আমার মিলবে? মিলবে না। কোনোদিন মেলে নি। জানিনে আপনি কোথায় নিয়ে চলেছেন আমাকে। রাণু বলিতে লাগিল, যা বলছি এ আপনারই দেওয়া শিক্ষায়, যদি অপরাধ হয় তবে আপনারই শিক্ষা দেওয়ার দোষে! তবু এ আর আমার ভালো লাগছে না বাবা, আমাকে আপনি মুক্তি দিন্।

লাহিড়ী বলিলেন, তোমার কথার মানে কি?

রাণু বলিল, মানে এই, প্রবল বিতৃষ্ণা এসেছে আমার, আমি আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। কেমন যেন অদ্ভুত দারিদ্র্যের মধ্যে আমি চলেছি। আপনি জানেন আমি কী নিঃসহায়! জানেন কি যে, কোথাও আমার দাঁড়াবার

জায়গা নেই? আপনি জানেন, সমস্ত দিক থেকে আপনি আমাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে আনছেন? না, এ চলবে না, আমি মুক্তি চাইবো, আমি পথ খুঁজবো।

লাহিড়ী চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, এসব মন্ত্র তোমার কানে দিলে কে আমি শুনতে চাই।

আপনি দিয়েছেন, আপনার জীবন থেকে আমি পেয়েছি চরম শিক্ষা।—রাণু বলিল, আপনি ছাড়া আমাকে আর কে দেবে? এই দেহ, এই প্রাণ, এই শিক্ষা—সমস্ত পেয়েছি আপনার কাছে, আপনি জন্মদাতা। কেন এমন বিতৃষ্ণা বলতে পারব না, কিন্তু এই জীবনে আর আমার আনন্দ নেই, আমি এই সুখের খাঁচাকে ভেঙে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে চাই। এর চারিদিকে কেবল রঙ, কেবল নেশা, কেবল মত্ততা; আমি যেদিকেই চেয়ে দেখি প্রাণকে যেন কেবলই পিষে মারছে! আপনি কি দিয়ে আমাকে সুখী করবেন? ওতে আমার লোভ নেই।

লাহিড়ী কহিলেন, তুমি সকালবেলা কোথায় গিয়েছিলে?

রাণু বলিল, গিয়েছিলুম আপনার এই চোখ-ঝল্‌সানো চাকচিক্য থেকে দূরে ময়দানে! যেখানকার স্নিগ্ধ রঙে চোখের তৃপ্তি হয়। আমার মন কেবলই বিশ্রাম চাইছে; এই অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্য থেকে কেবলই দূরে স'রে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এই কি বাঁচার পথ, এই কি আনন্দের চেহারা? এর নাম কি সুখশান্তি?

লাহিড়ী কহিলেন, আমার চোখের আড়ালে কি যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে তোমাদের।

ভুল করছেন আপনি। আপনার সমস্ত আড়ম্বর দিয়ে আপনিই বরং আমাকে একটা অদ্ভুত জালে জড়িয়ে ফেলেছেন। আপনার এই ঐশ্বর্যের বোঝা বইব আমি? কী অপরাধ করেছি? আপনি ভোগের সমুদ্রে আমাকে ঠেলে ফেলে দেবেন আর আমি হাবুডুবু খাবো? এই কি হবে বিচার?

লাহিড়ী বলিলেন, তুমি যদি আমার কিছু গ্রহণ না করো, তোমার ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেবো না। বেশ, এ আলোচনা পরেও হ'তে পারবে। আজকের কাজ হয়ে যাক্, বিয়েটা নির্বিঘ্নে সমাধা হোক, বোঝাপড়া করতে

কিছুই সময় লাগবে না।—বলিয়া তখনকার মতো তিনি উঠিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, সে হাসি কুটিল। তাহার অর্থটা এই, সম্পত্তি লইবার মানুষের কি অভাব? অর্থাৎ মণিপ্রভার সিঁথিতে সিন্দুর পরাইতে পারিলে ঐশ্বর্য ভোগের যথেষ্ট মানুষ মিলিবে।

রাণু ফোন্ ধরিল।—হ্যালো, পার্ক টু-ডাব্ল্ ও ফোর্। কে আপনি? সুশান্তবাবু আছেন? একবার তাঁকে ডেকে দেবেন দয়া ক'রে?

হ্যালো। সুশান্তদা? আমি রাণু। গুড্ মর্ণিং স্যর। ধন্য তুমি, বাবারে, কী রাগ তোমার!

এমন সময় লাহিড়ী গোপনে আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইলেন। রাণু টেলিফোনে কথা বলিয়া যাইতেছিল, তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

—কী বল্‌ছ? যাও, ঠাট্টা ক'রো না। আমার জন্যে উৎসব? না হে মশাই, তোমার জন্যে। তুমি ত আসবে ময়ূরপঙ্খী রথে, আজ তোমার অনেক দাম। আমি? হ্যাঁ, খুব সাজবো আজ। স্বয়ম্বর-সভা হবে ত? দেখি, কার গলায় মালা দিয়ে বসি! ঠিক সাতটায় আসছো ত? নইলে একেবারে অন্ধকার দেখবো কিন্তু।

লাহিড়ীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

হ্যালো। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। মিসেস বাসু? ওঃ নিশ্চয়ই আসবেন, তিনি নইলে বাবার উৎসাহ নিবে যাবে যে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক। টোপর? হাঃ হাঃ হাঃ। হ্যাঁ, আমিও নেবো সিঁথিমৌর। বাবারে, তুমি এতও জানো?—কী বলছ? ঘটা, না ঘনঘটা? হাঃ হাঃ হাঃ। যাগ্‌গে, রাগ করোনি ত? আজ তোমার পাশে বসবো আমি! তা হোক, যে যা বলে বলুক। দুপুরে একটা flying visit দেবে নাকি? একেবারেই আসবে? আচ্ছা, সেই ভালো। যা বলেছি মনে আছে? কই, কী দেবে আমাকে বললে না ত? প্লাটিনাম্ ব্রেসলেট? এনেছ এর মধ্যে? ছি, ছি, অন্যায় খরচ করেছ! আচ্ছা, ঠিক সময়ে এসো কিন্তু, তোমার পথ চেয়ে থাকবো। রাণু ফোন ছাড়িয়া দিল।

লাহিড়ী দ্রুতপদে তখন হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেছিলেন, রাণু পিছন

দিক হইতে পিতার চৌর্যবৃত্তির প্রতি স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। লজ্জায় তাহার নিজেরই মাথা কাটা গেল।

সেদিনটা বোধ করি অমাবস্যার কাছাকাছি, প্রথম রাত্রির দিকটা অন্ধকার। বিকালের দিক হইতে বেশ শীত পড়িয়াছে। আকাশ পরিচ্ছন্ন। আজ বাতাস আছে, কুয়াসা জমিতে পায় নাই। দেখিতে দেখিতে তারকার দল দপ দপ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। রাজপথে আলো জ্বলিয়াছে, পার্ক-সার্কাসের পার্কে লোকজন ইহারই মধ্যে সান্ধ্য-ভ্রমণ সারিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এদিকে জনপ্রবাহ সাধারণতই কম।

লাহিড়ীর বাড়িতেও আলো জ্বলিয়াছে। কিন্তু সে-আলো অত্যুগ্র, তাহার দীপ্তির অপেক্ষা আত্মপ্রচার অনেক বড়। পথের বহুদূর পর্যন্ত রশ্মি প্রসারিত করিয়া সেই প্রদীপগুলি যেন চীৎকার করিতে করিতে আজিকার বিলোল উৎসব ঘোষণা করিতেছে। একটা নয়, দুইটা নয়,—অগণ্য অসংখ্য। উহারা যেন আজিকার অমানিশার অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিয়া প্রহরীর মতো পাহারা দিতেছে।

পথিক জন দূর হইতে দেখিতে পায়, সেই আলোর প্লাবনের ভিতরে আসিয়া একখানি করিয়া মোটর থামে, গৃহস্বামীর তরফ হইতে দুইজন চাপরাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দুই পাশে সরিয়া দাঁড়ায়, ভিতর হইতে স্ত্রীপুরুষে নামিয়া পড়ে,—আবার মোটরখানা গিয়া পথের অপর পার্শ্বে সারবন্দীর মধ্যে গিয়া থামে। এমনি একটির পর একটি।

তারপরেও দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়। অত্যুগ্র বিদ্যুজ্জ্বালায় কেবল দেখা যায়, তরুণীর রেশমের শাড়ী ধারালো তরবারির ফলকের মতো ঝলসিয়া উঠিতেছে; রূপের চেয়ে ঔজ্জ্বল্যটাই বড়, সৌন্দর্যের চেয়ে চাকচিক্য। টুকরা কথা, তুচ্ছ রসিকতা আর চাপা হাসির সহিত অলঙ্কারের কিঙ্কিণী ফুটপাথ পার হইয়া হয়ত কোনো দ্রুতগামী পথিকের কানে একটা সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া গেল।

গেটের দুইধারে পিতলের টাবগুলি ফুলের স্তবকে পরিপূর্ণ। ছোট ছোট

পাম্ দুইদিকে। যেন প্রাসাদ নয়, কুঞ্জবন,—যেন লতাবিতানের ফাঁকে ফাঁকে আজ অতনু দেবতার নব কৌতুকের আয়োজন-সজ্জা।

বিবাহ নয়, তাহার ভূমিকা মাত্র। সুতরাং বাদ্য নাই, কোলাহল নাই। কলের পুতুলের মতো অভ্যাগতরা আসিতেছেন, ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন।

উপরে সিঁড়ির ধারে রোহিণী লাহিড়ী দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পরনে একটা ঢিলা পায়জামা, গায়ে একটা মূল্যবান ফ্লানেলের ফুলকাটা রোব্। একে একে সকলের সহিত করমর্দন করিয়া তিনি সমাদরের সঙ্গে তাঁহাদের ভিতরে লইতেছিলেন। রাণু সকলকে হাত ধরিয়া যথাযোগ্য স্থানে বসাইতেছিল। তাহার পরনে একখানা বেগুনী পার্শী, কানে দুইটা ঝুমকো, মাথায় একগোছা রক্তগোলাপ আর সূর্যমুখী। মুখ হাসি-হাসি।

ব্যারিষ্টারের দল আসিলেন। আগামী ইলেক্‌শনে কে কে দাঁড়াইবেন তাহার একটা ক্ষণস্থায়ী আলোচনা হইয়া গেল। মন্ত্রীত্বের উপরে কাহারো কাহারো লোভ আছে। কংগ্রেস টিকেটের জন্য কাহার অপ্রকাশ্য চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে তাহারও একটা আভাস শুনা গেল। তাঁহাদের পিছনে আসিলেন মণিপুরের কুমার, স্বনামধন্য সুরঞ্জন মিত্র, অনারেবল চাটার্জি, তাঁহাদের পিছনে রায় বাহাদুর রতনলালের বাড়ির মেয়েরা, তাঁহাদের পিছনে পিছনে সস্ত্রীক জষ্টিস সিন্‌হা।

এবার আসিলেন লাঙ্গলবাড়ির জমিদার দেবেন চৌধুরী, সঙ্গে তাঁহার সুসজ্জিতা পত্নী। রাণু আসিয়া দুইজনের হাত ধরিল। বলিল, জ্যাঠামশাই, আপনি এত দেরিতে এলেন? একেবারে কুটুম্ব! ইনি বুঝি জেঠীমা?—বলিয়া রাণু ভদ্রমহিলার পায়ের ধুলা লইল।

দেবেন চৌধুরী বলিলেন, সকালে আমি একবার এসেছিলুম মা! তুমি তখন ছিলে না।

রাণু তাঁহাদের হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

ব্যানার্জি আসিয়া লাহিড়ীর সহিত করমর্দন করিয়া উপরে গেলেন, লাহিড়ী তাঁহার দিকে একরূপ কৃপা ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন, ambitious old rascal. তারপরে আসিলেন ডক্টর পল্, প্রফেসার ঘোষ, সস্ত্রীক ব্যারিষ্টার ডেভিড্‌সন,—তাঁহার বাঙালী স্ত্রী।

Good Gracious!—লাহিড়ী বলিয়া উঠিলেন, সুশান্ত, এত দেরি? যাও যাও যাও, সবাই প্রায় এসেছেন। You are late Latif!

সুশান্ত তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল।

এমন সময় মণিপ্রভা আসিয়া দেখা দিলেন সগৌরবে। জ্যোতিষ্কদলের সহিত যেন পঞ্চমীর চন্দ্র। পরিপাটি প্রসাধনে গরবিনী। দুই পাশের পথের অবনত পুষ্পগুচ্ছের দল যেন তাঁহার পদপ্রান্ত স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইল। লাহিড়ী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিলেন। আলোগুলি হাসিল, ফুল হাসিল, উৎসবের রাত্রিও হাসিয়া উঠিল। মণিপ্রভা বীরুর হাত ধরিয়া উপরে উঠিলেন। লাহিড়ী গলা নিচু করিয়া বলিলেন, আজ বিশ্বামিত্রেরও ধ্যান ভাঙাবে তুমি মণি!

আমি উর্বশী নই, আমি রম্ভা। তারপর? Snobগুলো এসেছে ত? High-brow aristocrats! সেই পালিশ-করা ভদ্রতা, আর ওজন করা হাসি?

লাহিড়ী বলিলেন, চুপ, চুপ – আজকার দিনে তুমি একটু চুপ ক'রে থেকো মণি। হ্যাঁ, আর এক কথা, আমাকে যেন সকলের মাঝখানে স্নাব্ ক'রো না, দোহাই, আজ আমাকে ছেড়ে দিয়ো!

মণিপ্রভা তাঁহার হাতখানি ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া হাসিয়া কহিলেন, you sweet coward!

তিনি অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ পিছনদিক হইতে লাহিড়ী বীরুকে ডাকিলেন, শোনো হে ছোক্‌রা!

বীরু দাঁড়াইল।

এই জামাটা প'রে এলে কেন? ভালো জামা ছিল না? শখ আছে ত খুব বড় লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাবার,—কিন্তু সাবধান, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, কোনোরূপ অসভ্যতা যেন ক'রো না। খেয়েদেয়েই চ'লে যেয়ো, বুঝলে?

যে আজ্ঞে।

আর এক কথা, হ্যাংলার মতন যেন রাণুর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা ক'রো না। এমন ভাব দেখাবে যেন তুমি ওকে চেনোই না। যদি আমার কথার একটু নড়চড় হয়, তবে ওই রামশরণ আর সুন্দর সিংয়ের দল রইলো,—

মাথা নিয়ে আর ফিরতে হবে না। কী আদেকুলে ছেলে তুমি, একপাত খাবার লোভ সামলাতে পারলে না!

বীরু মাথা হেঁট করিয়া অগ্রসর হইল, মণিপ্রভা পুনরায় তাহার হাত ধরিলেন। দুইজনে ডাইনিং হলে ঢুকিলেন।

লাহিড়ী স্বগত উক্তি করিলেন, কী ছেলে রে বাবা! জানে না এটিকেট্, শেখেনি ডিসেন্‌সি।

আর কেহ আসিবার নাই, পুরাপুরি তালিকার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। রামশরণের দলকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া লাহিড়ী এইবার উপরে উঠিয়া গেলেন।

ইম্পিরীয়ল্ রেস্তরাঁ হইতে আহার্য আসিল। 'বয়'রা প্রস্তুত। হুকুম পাইলেই পরিবেষণ করিবে।

সুশান্তর পাশে বসিয়াছে বীরু। মণিপ্রভার পাশে ব্যানার্জি। জষ্টিস সিন্‌হার পাশে দেবেন চৌধুরী। রাণুর পাশে তাঁহার স্ত্রী। একজনের স্ত্রী অপরজনের পাশে—এইটিই ফ্যাশন্। জুনিয়র ব্যারিষ্টারদের স্ত্রীগণ সিনিয়রদের পাশে বসিয়া হাসাহাসি করিতেছেন।

মখমল বিছানো প্রকাণ্ড টেবল, তাহার উপর অসংখ্য প্লেটে নানাজাতীয় ফলমূল সাজানো। মাঝে মাঝে হুইস্কি ও সোডার বোতল, কালো রঙের ষ্টাউট্ বীয়র। কাঁচের গ্লাসগুলি উপুড় করা, ডিসগুলিও তাই। ছুরি, কাঁটা, ডিনার-চামচগুলি সাজানো। 'বয়'রা আসিয়া প্রথমেই ড্রাই-ডিস সার্ভ করিতে লাগিল। আহারটা প্রায় বিলাতী-নকল।

এমন সময় রামশরণ আসিয়া রাণুকে জানাইল, একজন মায়িজী ও একজন বড়বাবু নিচে ডাকিতেছেন। রাণু দৌড়াইয়া নিচে চলিয়া গেল, এবং মিনিট পাঁচেক পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল। মণিপ্রভা তাহা লক্ষ্য করিলেন, বীরু চাহিয়া দেখিল, সুশান্ত মুখ ফিরাইল। চক্ষের নিমেষে রাণুর চোখের সহিত তাঁহাদের চোখের ভাষা বিনিময় হইল।

দেশের অবস্থা, কোয়েটার ভূমিকম্প, আগামী বৎসরের সরকারী বাজেট,

হাইকোর্টের চীফ জষ্টিসের অবসর গ্রহণ, বাংলা কংগ্রেসের দলাদলি, গান্ধীর হিমালয়ান্ ব্লান্ডার, ট্রেড ডিপ্রেশুন, মহারাণী মঞ্জরীদেবীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, —নানা আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

জষ্টিস সিন্‌হা প্রস্তাব করিলেন, আজ আমাদের এই মিলনবাসরে আমি প্রস্তাব করি আমাদের সকলের বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে সভাপতি করা হোক। ওঁর পরিচয় অনাবশ্যক। লাঙ্গলবাড়ির জমিদার সে-পরিচয় নয়, দেশের মঙ্গলকামনায় উনি যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দান করেছেন সেটা আমাদের সকলের পক্ষেই গৌরব। I propose him to the chair!

ব্যারিষ্টার ডেভিডসন্ সিন্‌হার কোর্টে একটা জটিল মামলা চালাইতেছিলেন, সিন্‌হা কিছু খুশি থাকিলে মন্দ হয় না। তিনি বাংলা বুঝিতেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, Gentlemen and ladies, with your permission, I second it.

গুপ্ত সাহেবের কানে কানে লাহিড়ী বলিলেন, দেবেনদা প্রেসিডেন্ট হোলো! Ah, the well-selected debauch! সঙ্গে উটি কে জানো ত? The person who is called extra marital—! চুপ চুপ। বলিয়া তিনি হাসিলেন।

পিতার হাসি রাণু লক্ষ্য করিল। সুশান্ত তাকাইল রাণুর দিকে। ব্যানার্জি মণিপ্রভাকে কি যেন ফিস ফিস করিয়া বলিলেন! দুইজনের ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিয়া লাহিড়ীর হাড় জ্বলিয়া গেল। বীরু একবার মাথা তুলিয়া কাহাকে যেন লক্ষ্য করিয়া আবার মাথা নিচু করিল। সে যাহা ভাবিতেছিল তাহার সহিত এই উৎসবের রাত্রি মিলে না। মুখখানি তাহার বিবর্ণ, রক্তের লেশ কোথাও নাই। রাণু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল।

সভাপতি দেবেন চৌধুরী এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বন্ধু ও বান্ধবীগণ—

সকলে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন।

তিনি বলিলেন, আপনারা আমাকে যে গৌরব দিলেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আজ আমার উপর ভার পড়েছে এই শুভকর্মের পৌরহিত্য

করবার। আমার পুরাতন বন্ধু ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার লাহিড়ীর বাড়িতে আমরা আজ সকলে সমবেত হয়েছি ; আজকের এই আনন্দ-মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি তরুণ-তরুণীর বিবাহ-সংবাদ প্রচার করা। আপনারা সকলে তাহাদের স্বাস্থ্য পান করুন। পাত্র এবং পাত্রী উভয়েই আপনাদের সকলের পরিচিত। বিশেষ করিয়া যিনি পাত্রী তিনি আমাদের সোদরোপম রোহিণীকুমারের একমাত্র কন্যা রাণু। আর যিনি পাত্র, তিনিও আমার পুত্রের সমান। বিদ্যায়, জ্ঞানে, সম্পদে, পরিচয়ে,—বাংলার তরুণগণের তিনি আদর্শ। পাত্র নিজেই তাঁহার বিবাহ-সংবাদ প্রচার করিবেন। আসুন, আমরা সকলে পুনরায় তাহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করি। তারা সুখী হোক, সুন্দর হোক।

রাণু ভিতরে ভিতরে ঘামিয়া উঠিতেছিল। মণিপ্রভা কৌতুক কটাক্ষে একবার লাহিড়ীর দিকে তাকাইলেন। বীরু একবার মাথা তুলিয়া আবার ঘাড় হেঁট করিল। লাহিড়ী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পৈশাচিক আনন্দে হাসিলেন।

'বয়'রা বোতল খুলিয়া গেলাসে মদ্য ও সোডা ও বীয়র ঢালিয়া দিয়া গেল। মেয়েদের বাদ দিল। যাঁহারা পান করিবেন না তাঁহারা 'বয়'দের নিষেধ জানাইলেন। যাঁহাদের পান করা অভ্যাস আছে তাঁহারা প্রচুর পান করিলেন।

সকলে একে একে উপহার বাহির করিয়া রাণুকে দিলেন। রাণু দিল রামশরণের হাতে। রামশরণ সেগুলি লইয়া রাণুর বাক্সে জমা করিতে লইয়া গেল।

সুরঞ্জন মিত্র দাঁড়াইয়া বলিলেন, এইবার পাত্র আপনাদের সকলকে নমস্কার জানাইবেন!

সুশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে হাততালি দিলেন। লাহিড়ী মুখ তুলিলেন। উপস্থিত নরনারীবৃন্দ উৎসুক হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সুশান্ত সত্যই রূপবান।

সে দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, আমার দু'একটি কথায় আপনারা কিছু বিস্মিত হইবেন। কিন্তু আজিকার এই উৎসবের পক্ষ হইতে আমার উপর

একটি অকরুণ কর্তব্যের ভার পড়িয়াছে, তাহা সমাধা করিতে যদি ত্রুটি হয় তবে আমাকে মার্জনা করিবেন। উৎসবের যিনি স্রষ্টা তিনি শ্রদ্ধেয়। তাঁহাকে পিতার ন্যায় আমি সম্মান করি। কিন্তু যে কর্মপদ্ধতিতে চলিয়া তিনি আজ নিরপরাধকে আপন স্বেচ্ছাচারের তলায় পিষিয়া মারিতে চাহিতেছেন—

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। মণিপ্রভা কাঠের মতো কঠিন হইয়া বসিয়াছিলেন। বীরু নতমস্তক। রাণুর পা কাঁপিতেছিল। লাহিড়ী মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি বলছ হে সুশান্ত? সাধু বাংলা কোত্থেকে শিখ্‌লে?

সুশান্ত কহিল, বাধা পাইলাম সুতরাং আর বলিব না। এই উৎসবের যিনি মূল কেন্দ্রস্বরূপ তিনি আমার অতি প্রিয়, আপন হইতেও আপন, এমন কি তাঁহাকে আমার প্রাণের পুত্তলী বলিলেও ভুল হয় না, তিনি রোহিণীবাবুর কন্যা রাণু! আপনারা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইবেন যে, আজ রাণুর সহিত যাঁহার বিবাহ ঘোষণা করিব তিনিও রূপে, গুণে, চরিত্রে, বিদ্যায় যে-কোনো সৎপাত্রের সমকক্ষ—তিনি এই আসরেই উপস্থিত—তিনি রাণুর সুখ-দুঃখের দীর্ঘকালের সঙ্গী—পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের অনুরাগে রঙিন—

মণিপ্রভা বলিয়া উঠিলেন, তার নাম কি সুশান্ত?

তার নাম বীরেন চৌধুরী।

লাহিড়ী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, এমন গাড়োয়ানি রসিকতা ভদ্র সমাজে চলে না সুশান্ত। এ ভয়ানক বাড়াবাড়ি—

সুশান্ত থামিল না। বলিতে লাগিল, আমার প্রিয় ভগ্নী রাণু ও তার ভাবী স্বামী বীরেনকে আপনারা সকলে আশীর্বাদ করুন।

আসরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। জষ্টিস সিন্‌হা, ব্যানার্জি, গুপ্ত, ডেভিড্‌সন্‌, রতনলালের বাড়ির মেয়েরা, এমন কি দেবেন পর্যন্ত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। সকলে কলরব করিয়া বলিলেন, আমাদের কি বোকা বানাবার জন্য এখানে আনা হয়েছে?

লাহিড়ী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সুশান্ত, তুমি বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক—আমি প্রাণ থাকতে এত বড় অনাচার, এত বড় অপমানকে প্রশ্রয় দেবো না!

মণিপ্রভা এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, মিছে কথা, আপনি কি অপমান করেন নি এক নিষ্পাপ

বালিকাকে? আপনি অনাচার করেন নি এক চরিত্রবান সরল ভদ্র যুবকের প্রতি? প্রতিদিন ধ'রে আপনি বিষাক্ত করতে চেয়েছেন ওদের প্রেমকে, ওদের হৃদয়কে,—শান্তির জীবনে আগুন জ্বালাতে চান্ আপনি অকারণে, অপমান করতে চান্ মনুষ্যত্বকে, পদদলিত করতে চান্ নীতির সকল আদর্শকে—

লাহিড়ী উন্মত্তের মতো চীৎকার করিলেন, ষড়যন্ত্র করেছ তোমরা আমার বিরুদ্ধে, আমি দেখে নেবো, আমি নেবো প্রতিশোধ—

তিনি লাফাইয়া উঠিতে যাইবেন—এমন সময় টেবিলে আঘাত লাগিয়া কাঁচের বাসন ঝনঝন করিয়া উল্‌টাইয়া পড়িল। সকলেই বিভ্রান্ত ও বিপন্ন, কিন্তু কোনোদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। চীৎকার করিয়া বীরুর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এই রামশরণ, ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দে—এই সুন্দর সিং—

বীরু এইবার উঠিয়া আস্তিন গুটাইল। রক্তের ভিতরে তাহার কোথায় জমা ছিল অগ্নি, সিংহের মতো সে কেশর ফুলাইল। দুইটা বোতল ও গ্লাস লইয়া সে চুরমার করিয়া ভাঙিল, কাঁচের ডিস কয়েকখানা হাতে তুলিয়া কহিল, অপমান করবে আমাকে নকল আভিজাত্যের অহঙ্কার? যত মিথ্যা, যত কৃত্রিম, যত অন্তঃসারশূন্য অভিমানের উপরে যার ভিত্তি– যত ভণ্ডামি আর দুর্নীতি—

ঝনাৎ করিয়া সে কাঁচের ডিস ভাঙিল।

মণিপ্রভার উন্মত্ত আনন্দ আর হাসি আর করতালি-ধ্বনি ছুটিয়া ছুটিয়া চারিদিকে যেন প্রেতিনীর পৈশাচিক উল্লাসের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনিও চেঁচাইলেন, ভাঙো বীরু, সব ভেঙে দাও, চুরমার ক'রে দাও দম্ভ, পদদলিত করো পাপ আর অন্যায়, টুঁটি টিপে ধরো অত্যাচারীর—বলদর্পীর—

পুলিশ, পুলিশ—

রাণু ছুটিয়া গিয়া হলের দরজা বন্ধ করিল। বলিল, এই রামশরণ, এই সুন্দর সিং, খবরদার বীরুবাবুর গায়ে হাত দিবিনে, ও আমার স্বামী—

লাহিড়ী চীৎকার করিতে লাগিলেন, ধরিয়ে দাও—এই পুলিশ, এই রামশরণ—কই, কেউ কথা শোনে না, কেউ বাধা দেয় না ওকে—

বীরু ছবি ভাঙিল, ফুলের টাব লাথি মারিয়া ফেলিল, টেব্‌ল উল্‌টাইল; ছুরি, কাঁটা, চামচ, গ্লাস,—যা কিছু সমস্ত চারিদিকে ছড়াইয়া ছত্রখান করিল। ভোলানাথ হইয়াছে প্রলয়ঙ্কর শিবশঙ্কর—আজ তাহার ধ্বংসলীলা!

লাহিড়ী পাগলের মতো বলিলেন, জষ্টিস সিন্‌হা, আপনি ওই অজ্ঞাতের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে বলেন? বলুন আপনি?

দেবেন চৌধুরী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অজ্ঞাত!—বলিয়া বীরু থামিল, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বীরু চীৎকার করিয়া বলিল, অজ্ঞাত! কে আমার বাবা, কে আমার মা? —বলিয়া পকেট হইতে সে একখানা কাগজের কাটিং ছবি বাহির করিল, সকলকে দেখাইয়া বলিল, অজ্ঞাত! চেনেন না আপনারা দেবেন চৌধুরীকে? এই ইনি—ইনি আমার বাবা! বলিয়া সে দেবেনবাবুকে দেখাইল।

সভা স্তব্ধ, স্তম্ভিত, বিস্মিত! দেবেনবাবু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে তাঁহার দিকে তাকাইল। এমন সময় রাণু ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া দেবেনবাবুকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, জ্যাঠামশাই, এ কি সত্যি?

দেবেনবাবুর সহিত যে মহিলা আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, সম্পূর্ণ মিথ্যা—পুলিশ ডাকো—ওকে ধরিয়ে দাও—

সেই ভীষণ কোলাহলের ভিতরে এক সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ও-পাশের পর্দা সরাইয়া একজন অপরিচিতা মহিলা আবির্ভূতা হইলেন। সকলে সেইদিকে তাকাইল। বীরু ও রাণু এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, মা, এ কি মিথ্যে?

পদ্মাবতী ঘোমটা তুলিয়া দাঁড়াইলেন—যেন মহীয়সী মাতৃমূর্তি! বলিলেন, মিথ্যা নয় লাহিড়ী মশাই, মিথ্যা নয় জষ্টিস সিন্‌হা,—বলিয়া দেবেনবাবুর দিকে তিনি চাহিলেন। পুনরায় কহিলেন, আমি ওঁর প্রথম স্ত্রী, বীরুর মা ওঁর দ্বিতীয় স্ত্রী, হ্যাঁ, গোপনে বীরুর মাকে উনি বিবাহ করেছিলেন, আজ বীরুর মা বেঁচে নেই, আমি আছি! আজ রাণুর আগ্রহে এখানে আমাকে আসতে হয়েছে, ওঁকে আমি মার্জনা করতে আসি নি, এসেছি বীরুর সত্য পরিচয় জানাতে।

বৃদ্ধ মথুরাবাবু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, দেবেন, আমি আজো বেঁচে আছি ভাই!

মণিপ্রভা অগ্রসর হইয়া কহিলেন, সমস্ত মিথ্যে ধূলিসাৎ হোলো! মিষ্টার লাহিড়ী, আপনি এবার ওদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিন্, অর্থাৎ আত্মহত্যা করুন!

বক্রকটাক্ষে তাঁহার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মণিপ্রভা বাহির হইয়া গেলেন, ব্যানার্জি তাঁহার পিছনে পিছনে।

বীরুর হাত ধরিয়া পদ্মাবতী ও মথুরাবাবু সকলের বিমূঢ় স্তম্ভিত দৃষ্টির উপর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। রাণু দ্রুতপদে তাহার নিজের ঘরে গেল, চক্ষের নিমেষে গোটা চারেক ট্রাঙ্ক ও সুটকেশ গুছাইয়া লইল, তারপর রামশরণ ও সুন্দর সিংহের সাহায্যে সেগুলি পথে বাহির করিয়া পদ্মাবতীর মোটরে তুলিল।

অন্ধকারে সুশান্ত নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। রাণু গাড়ী হইতে হাত বাড়াইয়া ডাকিল, দাদা?

সুশান্ত মুখ তুলিল। রাণু কহিল, ও কি, তোমার চোখে জল কেন ভাই?

করুণ হাসি হাসিয়া সুশান্ত কহিল, নিখুঁৎ অভিনয় করেছি, বোধ হয় তাই জন্তে। গুড বাই, গুড লাক্।

দুইজনেই দুইজনের প্রতি চাহিয়া রহিল। সে চাহনি নিরর্থক, রাত্রির রহস্যের মতো জটিল।

পদ্মাবতীর গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বিদ্যুদ্বেগে মোটর ছুটিতে লাগিল। ওপাশে মা, মাঝখানে বীরু, এপাশে রাণু। আকাশে অগণ্য উজ্জ্বল তারকার দলের ভিতর দিয়া রাণুর ক্লান্ত চক্ষুর সম্মুখে বারম্বার সুশান্তর অশ্রুসজল মুখখানা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ও-মুখে কি ত্যাগের মহিমা! ও-মুখে কি বঞ্চিতের বেদনা!—রাণু কিছু বুঝিল না। কেবল এক সময় আড়ষ্ট হইয়া বীরুর একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

পদ্মাবতী কি-যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। কী চিন্তা? সেই তাঁহার সুদূর অতীত? আঠারো বৎসর পরে স্বামীর সহিত আজ মুহূর্তের দেখা, সেই চিন্তা? স্বামীর সহিত কে ওই স্ত্রীলোক? মরণ-লোভী পুরুষ শেষ বয়সে কি আবার পায়ে শৃঙ্খল পরিয়াছে?

রাণু একবার তাঁহাকে ডাকিল, কিন্তু তিনি সাড়া দিতে পারিলেন না, পাথরের মতো স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন।

দিন দুই পরে হঠাৎ কোথায় কি একটা খবর পাইয়া রোহিণী লাহিড়ী নিজে বেবি অষ্টিন্ হাঁকাইয়া বালীগঞ্জের দিকে ছুটিলেন। চেহারাটা তাঁহার কেবল উদ্‌ভ্রান্তই নয়, অপমানে কেমন যেন বিকৃত, হতাশায় পাণ্ডুর।

বালীগঞ্জের বাড়ির দরজায় গাড়ী থামাইয়া ভিতরে ঢুকিলেন। গেটের ধারে আর একখানা মোটর অপেক্ষা করিতেছিল।

উপরে তাঁহাকে যাইতে হইল না, মণিপ্রভা সাজসজ্জা করিয়া নিচে নামিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, উপন্যাসের শেষ হয়েছে, এবার কি পরিশিষ্ট? এখনো সুইসাইড করেন নি?

লাহিড়ী বলিলেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

যাচ্ছি সুখের সফরে। ওয়াল্‌টেয়ারের দিকে—

কিন্তু আমি যে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে নোটিশ দিয়েছি মণিপ্রভা, তোমার সঙ্গে আমার—

মণিপ্রভা নিচে নামিয়া আসিলেন। বাগান পার হইতে হইতে বলিলেন, বিয়ে? আপনাকে? Absurd, disgusting! যা পেয়েছেন তাতেই খুশি থাকুন গে—

এমন সময়ে ব্যানার্জি তাড়াতাড়ি পিছন হইতে আসিয়া লাহিড়ীর একটা হাত ধরিয়া নাড়া দিলেন, বলিলেন, Hello, my boy, how do you do?

লাহিড়ী ব্যানার্জিকে এমন সময় এখানে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, ওঃ, মানে দুজনে যাচ্ছ তোমরা—

মণিপ্রভা কিছুতেই ছাড়লেন না—আচ্ছা, তাহ'লে Good bye, good luck!

দুইজনে মোটরে গিয়া উঠিলেন। মণিপ্রভা ষ্টিয়ারিং ধরিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট্ দিলেন। লাহিড়ী জ্বালাময় ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কী বলবে তুমি একে মণিপ্রভা? কাল্‌চার? Aristocracy! High society fashion?

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

তাঁহাদের গাড়ী ছুটিল। বাতাসে মণিপ্রভার ঘোমটা খসিয়া তাঁহার বব্-করা চুলের রাশি উড়িতে লাগিল।

*

* *

ইম্পিরীয়ল্ রেস্তরাঁর নির্জন ক্যাবিনে বসিয়া লাহিড়ী গ্লাসভরা র-হুইস্কি তুলিয়া ওষ্ঠে স্পর্শ করিলেন—তাঁহার চোখের জল গড়াইয়া তাহাতে মিশিল। তিনি ভাবিলেন, তবে কী একটা নীতি আছে? নিয়ম আছে? তবে কি কাল্চারের পথ অন্তরূপ, তবে কি আভিজাত্যটা মনুষ্যত্ব ও উদারতার পথ ধরিয়াই চলে? মণিপ্রভার বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহাকে কী শিখাইয়া গেল?

কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আর কেহ রহিল না!

সমাপ্ত